বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

কুমিল্লা

বাংলাদেশের
লোকজ সংস্কৃতি

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

কুমিল্লা

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

প্রধান সমন্বয়কারী

মোহা. হাবিবুর রহমান

সংগ্রাহক

রতন কুমার ভৌমিক

মো. মাজেদুল হক

রিপন চন্দ্র রায়

সুচিত্রা সরকার

মো. এনামুল হক

শারমিন জাহান মুক্তা

নুরুন নাহার

জাহাঙ্গীর আলম

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

কুমিল্লা

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২৪/এপ্রিল ২০১৭

বাএ ৫৬২৮

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২০/মার্চ ২০১৪। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ৩০০.০০ টাকা।

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : COMILLA (Present State of Folklore in Comilla District). Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md. Altaf Hossain. Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge). Sales, Marketing and Reprint Division. Bangla Academy. Dhaka 1000. Bangladesh. First Reprint : Reprint Sub-Division, April 2017. Price : Taka 300.00 Only.

ISBN 984-07-5637-0

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে

কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে

স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।
২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer)

প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক

ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরশ, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন

(বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শ্লোক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি,

পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরশ, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরশ ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব

পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, সহব্যবস্থাপক খালিদ ইবনে মারুফ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান কুমিল্লা জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কুমিল্লার সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৮০

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ২৩
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৫
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৬
ঘ. জনবসতির পরিচয় ২৮
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল ৩৩
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৫
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৪২
জ. গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও স্থানের পরিচয় ৫০
ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ৬৬
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ ৭৪
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৭

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৮১-১২৩

ক. লোকগল্প/কাহিনি ৮১
খ. কিংবদন্তি ১০২
গ. লোকছড়া ১০৩

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১২৪-১৩৯

লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প ১২৪
২. খাদিশিল্প ১২৭
৩. ঘটচিত্র, উঠুনচিত্র বা আল্পনা ১২৯
৪. কাঠ খোদাই বা দারুচিত্র ১৩০
৫. নকশি কাঁথা ১৩২
৬. লক্ষ্মীর সরা ১৩২
৭. বাঁশ বেত শিল্প ১৩৩
৮. প্রতিমা শিল্প ১৩৬
৯. নৌ শিল্প ১৩৭
১০. কাইল-ছিয়া ১৩৯

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৪০-১৪১

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা/গীতিকা (ballad) ১৪২-১৭৭

১. মুর্শিদি গান ১৪২
২. জারিগান ১৪৬
৩. কীর্তন ১৪৮
৪. সারি গান ১৪৮
৫. পটুয়া সংগীত ১৫০
৬. মারফতি গান ১৫১
৭. ভাটিয়ালি ১৫৩

৮. মাইজভাণ্ডারি গান ১৫৪
৯. উল্টাসংগীত ১৫৪
১০. হাস্য-রসাত্মক গান ১৫৫
১১. বারমাসী ১৫৫
১২. টিপরা গান ১৫৬
১৩. মেয়েলি গীত ১৫৭
১৪. বিয়ের গীত ১৫৮
১৫. পূজার্চনা সংশ্লিষ্ট গীত ১৭৩
১৬. ব্রতের গীত ১৭৪
১৭. দেহতত্ত্ব ১৭৪
১৮. জলদাসের গান ১৭৫

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৭৮-১৮০
১. করতাল ১৭৮
২. মৃদঙ্গ ১৭৮
৩. কাসা ১৭৮
৪. কড়া ১৭৮
৫. ঝুর্ণঝুনি ১৭৯
৬. আড়বাঁশি ১৭৯
৭. ঢোল ১৮০
৮. নাল ১৮০
৯. ঢাক ১৮০
১০. খমক ১৮০

লোকউৎসব (folk festival) ১৮১-১৯৮
১. নবান্ন ১৮১
২. বৈশাখী উৎসব ১৮২
৩. রথযাত্রা ১৮৩
৪. আন্দিকূট সিদ্ধেশ্বরী মন্দির মহোৎসব ১৮৩
৫. শ্রীকাইল কালী বাড়ি মহোৎসব ১৮৩
৬. ছালিয়া কান্দির মহোৎসব ১৮৩
৭. অষ্টমী স্নান ১৮৪
৮. চৈত্র সংক্রান্তি ১৮৫
৯. পৌষ সংক্রান্তি ১৮৫
১০. চড়ক পূজা ১৮৫
১১. অম্বুবাচী ১৮৫
১২. স্বামীজী রামানন্দ গোস্বাইর বাৎসরিক মহোৎসব ১৮৫
১৩. ঈদ উৎসব ১৮৬
১৪. বিজয় দিবস ১৮৮
১৫. ওরশ ১৮৮
১৬. প্যাগোডা ও ধর্মীয় উৎসব ১৮৯
১৭. গীর্জা ও ধর্মীয় উৎসব ১৮৯
১৮. বিজয়পুর মেলা ১৮৯
১৯. গাজী সাহেবের মাজার মেলা ১৮৯
২০. ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার লোকমেলা ১৯০

২১. মকিমপুর দয়াময় মহোৎসব ১৯১
২২. কঠিন চীবর দানউৎসব ১৯১
২৩. গরিয়া লোকোৎসব ১৯২
২৪. বিবাহ ১৯২

আচার-অনুষ্ঠান (ritual) ১৯৯-২০৬
১. হালখাতা ১৯৯
২. সাধভক্ষণ ১৯৯
৩. করণক্রিয়া ২০০
৪. মিলাদ দেওয়া/দোয়া পড়ানো ২০১
৫. আউজ উৎসব ২০২
৬. ব্রত-পার্বন ২০২
৭. মনসা পূজা ২০৩

লোকখাদ্য (folk food) ২০৭-২১২
১. কান্দির জাউ ২০৭
২. মোরব্বা ২০৮
৩. পিঠা-পুলি ২০৮
৪. মাসকলায়ের আমিত্তি ২০৮
৫. ছানার আমিত্তি ২০৮
৬. লেডি ক্যানি ২০৯
৭. সিদল শুঁটকি ২০৯
৮. ভর্তা ২০৯
৯. নানা রকমের পিঠা পুলি ২১০
১০. রসমালাই ও স্পঞ্জ ২১০

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য (folk theatre & dances) ২১৩-২২৬
ক. লোকনাট্য
১. বদরজানের পালা ২১৩
২. কৃষ্ণলীলা ২১৮
৩. বস্ত্রহরণ ২১৯
৪. সীতার অন্বেষণ ২১৯
৫. দাতাকর্ম ২২০
৬. শিবলীলা ২২০
৭. রাধার মান ২২১
৮. সীতার বনবাস ২২১
৯. কলসি কাখে শ্রীরাধিকা ২২২
খ. লোকনৃত্য
১. সদর দক্ষিণের জারিনাচ ২২৩
২. বাউল নৃত্য ২২৪
৩. আরতি নৃত্য ২২৪
৪. ধুপতি নৃত্য ২২৪
৫. কাদা নৃত্য ২২৫
৬. ঢাক নৃত্য ২২৫

লোকক্রীড়া (folk games) ২২৭-২৪৮
১. হা-ডু-ডু ২২৭

২. লাঠি খেলা ২২৭
৩. এপেনইটি বায়োস্কোপ ২২৭
৪. বৌছি/বউছি ২২৮
৫. পাঁচ কইট্টা (পাঁচগুটি) ২২৯
৬. এক্কা দোক্কা ২৩০
৭. কানা-মাছি ২৩০
৮. গুলিখেলা ২৩০
৯. লাটিম খেলা ২৩০
১০. পুতুল খেলা ২৩১
১১. লাইখেলা ২৩১
১২. ঘুড়ি ওড়ানো ২৩১
১৩. বাঘবন্দী খেলা ২৩২
১৪. শান্তালতা খেলা ২৩২
১৫. ডাইগ্যা খেলা ২৩৩
১৬. ইচিং বিচিং ২৩৪
১৭. ছক্কা ২৩৪
১৮. চোর পুলিশ ২৩৫
১৯. পলান্তি ২৩৫
২০. পানির খেলা ২৩৬
২১. ত্রিপুরা ক্রীড়া ২৪৮

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৪৯-২৫৪
১. কামার ২৪৯
২. সওদাগর ২৫০
৩. সুইপার ২৫১
৪. রবিদাস ২৫১
৫. কাহার ২৫১
৬. মুচি ২৫১
৭. ফুলমালি ২৫২

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৫৫-২৬৯

ধাঁধা (riddle) ২৭০-২৮৯

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৯০-৩০৯

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩১০-৩১৭

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩১৮-৩২৪
১. মাছ ধরার যন্ত্র ৩১৮
২. পলো ৩১৮
৩. নৌকা প্রযুক্তি ৩১৯
৪. শীতল পাটি ৩২১

লোকভাষা (folk language) ৩২৫-৩২

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

কুমিল্লা চট্টগ্রাম বিভাগাধীন একটি জেলা। রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের মাঝামাঝি ৩০৮৫.১৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন জুড়ে এ জেলা অবস্থিত। এ জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। এর নামকরণের ইতিহাসটি বেশ চমকপ্রদ– যা ইতিহাস ও কিংবদন্তি আশ্রিত।

হযরত শাহজালাল চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে তাঁর মাতুল আহমদ কবীর কর্তৃক দেয়া এক মুঠো মাটি নিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। মামা কবীরের নির্দেশ ছিল, "যে স্থানের মৃত্তিকার সঙ্গে এই মাটির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ মিলবে, সে স্থানই শাহজালালের সাধনার স্থান হবে"। হযরত শাহজালাল অনেক পথ পেরিয়ে প্রথম দিন কুমিল্লা শহরের পূর্বদিকে গাজীপুর মহল্লার ঘিলাতলীতে এসে উপনীত হন এবং রাত যাপনের উদ্দেশ্যে একটি উচুঁ টিলাতে তাঁবু ফেলেন। হঠাৎ কী মনে করে তাঁর ভূতত্ত্ববিদ চাশমী পীর এ স্থানের মাটি পরীক্ষা করে তাঁদের বয়ে আনা মাটির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে 'কোহমিলা' বলে উল্লাসে ফেটে পড়েন। 'কোহমিলা' অর্থাৎ "অভীষ্ট পাহাড় পাওয়া গেছে শাহজালাল"। এই 'কোহমিলা' থেকেই 'কুমিল্লা' নামের উদ্ভব বলে কিংবদন্তি রয়েছে।

কেউ কেউ 'কমলাঙ্ক', 'কামলাক', 'কমলিঙ্ক' ইত্যাদি নগর আধুনিক কুমিল্লার প্রাচীন নামেরই অপভ্রংশ বলে মনে করেন। অপর এক কিংবদন্তি মতে জানা যায়, এখানে 'কমলাঙ্ক' নামে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার নামানুসারে তাঁর অধ্যুষিত এলাকার নাম হয়েছে 'কমলাঙ্কনগর' অর্থাৎ কুমিল্লা। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ 'রাজমালা'-তে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আবার, খ্রিষ্টীয় ৭ম শতকের দ্বিতীয় দশকে যূয়ান চোয়াঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কিয়ামলঙ্কিয়া' (Kiamolonkia) নামক একটি স্থানের উল্লেখ করেন। তা সমতট রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত সাগর-তীরের দেশ বলে উল্লেখ রয়েছে। যূয়ান চোয়াঙ বর্ণিত এই 'কিয়ামলঙ্কিয়া'ই 'কমলাঙ্ক' বা কুমিল্লা বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

তবে 'কমলাঙ্ক' নামের উৎপত্তির অন্য ইতিহাসও পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের পণ্ডিতদের মতে, প্রাচীনকালে কুমিল্লা জেলার সঙ্গে কলিঙ্গ দেশের একটি প্রাচীন রাজ্যও স্থাপিত হয়েছিল এবং এখানে দ্রাবিড় ভাষাভাষী কলিঙ্গদের একটি প্রাচীন রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ স্থান 'কমলিঙ্ক' নামে অভিহিত হত। 'কললিঙ্ক' নামটিই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবাধীনে এসে 'কমলাঙ্ক' নাম ধারণ করে বলে পণ্ডিতদের অভিমত। কারো কারো মতে, কুমিল্লার নিকটে পূর্বদিকে 'কুমাল্লা' নামে যে গ্রামটি আছে সেই গ্রামের নামানুসারেই 'কুমিল্লা' নামকরণ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা অভিহিত হত 'ত্রিপুরা' নামে। ১৯৬০ সাল নাগাদ জেলাটি ত্রিপুরা জেলা হিসেবেই পরিচিত ছিল। এক প্রশাসনিক আদেশের বলে ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে ত্রিপুরা জেলার নাম পরিবর্তন করে শহরের নামানুসারে জেলার নামকরণ করা হয় কুমিল্লা। 'পার্বত্য ত্রিপুরা' নাম থেকেই 'ত্রিপুরা' নাম এসেছে। অনেকের অনুমান পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী কিংবা ত্রিপুর নরপতি মহারাজা ত্রিপুরের নামে এই বিস্তৃত রাজ্যের নাম হয়েছে ত্রিপুরা। অন্যমতে, অনার্য কিরাতগণ ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করত। তারা 'তিপ্রা' বা 'টিপ্রা' নামে অভিহিত ছিল (বর্তমানেও লালমাই পাহাড়ে টিপরা আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে)। তিপ্রাদের ভাষায় জলকে বলা হতো 'তুই'। এই 'তুই' শব্দের সঙ্গে 'প্রা' শব্দ যোগে 'তুইপ্রা' বা ত্রিপুরা হয়েছে এভাবে : তুইপ্রা >তিপ্রা>তৃপুর>ত্রীপুর>ত্রিপুরা। এ অভিমত অনেকেই গ্রহণ করেছেন।

মানচিত্রে কুমিল্লা জেলা

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

কুমিল্লা জেলার অবস্থান গোমতী নদীর তীরে এবং লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে। এর উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, উত্তর-পশ্চিমে নারায়ণগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী জেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলা।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে জেলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং এর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এ জেলার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। জেলার প্রাচীনতম শিলাভূমি লালমাই পাহাড়ে পাওয়া যায়। পাহাড়ের গভীরে যে শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে তা মায়োসিন যুগের। এ যুগ তিন কোটি বা সাড়ে তিন কোটি বছরের প্রাচীনতা ঘেরা। কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন যুগের। সমগ্র বাংলাদেশের গঠনই মোটামুটি এই পর্যায়ের বা সমকালীন। তাই এ জেলার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস অপেক্ষাকৃত নবীন।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল 'কিয়াতাস' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মেঘনা নদীর গতিপথ মোটামুটিভাবে এই কিয়াতাসেরই পশ্চিম সীমা চিহ্নিত করত। ব্রহ্মপুত্র নদীটি তখন 'লোহিত' নামে প্রবাহিত হত এবং বর্তমান মেঘনার গতিপথ ধরেই বঙ্গোপসাগরে পড়ত। তবে সাগর এখানকার মত এত দূরে ছিল না। পাহাড়ের পাদদেশের যে বিস্তৃত অঞ্চল 'কিয়াতাস' নামে পরিচিত ছিল, তারই মধ্যভাগে বর্তমান কুমিল্লার অবস্থান।

কুমিল্লা জেলা ৯০.৩১° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৯১° ২৫' পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৩° ১৪' উত্তর অক্ষাংশ ও ২৪°১৬' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত। সুতরাং জেলাটির অবস্থান পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে। অক্ষাংশের দিক দিয়ে ২৩°২৭' উত্তর অক্ষাংশ উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য পরিক্রমার শেষ সীমানা। আর ২৩°২/১° উত্তর অক্ষাংশ জেলার চান্দিনা উপজেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য এ জেলা সর্বোতভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভূপ্রকৃতি গঠনের সময়ানুক্রমিকের দিক থেকে কুমিল্লা টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা এবং নবীন ভূতাত্ত্বিক যুগের প্লাবনভূমি এলাকার অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হবার সময়ে এ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ির ময়নামতি এলাকায় এর ছোট টারশিয়ারি পাহাড়টি অবস্থিত যা লালমাই পাহাড় হিসেবেই বিখ্যাত। পাহাড়টির দৈর্ঘ্য প্রায় ২১ কিলোমিটার এবং উচ্চতা ৭০ ফুট। চ্যুতি বিশিষ্ট পূর্ব ও পশ্চিমের পাহাড়গুলোকে উত্থিত ভূখণ্ড বলে মনে করা হয়।

ভৌগোলিকভাবে কুমিল্লা জেলা মোটামুটি আয়তাকৃতির কিংবা সামন্তরিক ধরনের। তবে পশ্চিম দিকে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা এবং চাঁদপুরের উত্তর মতলব উপজেলা সংলগ্ন স্থানে একটু মাথা নোয়ানো ভাবের বাড়তি অংশ আছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত লালমাই পাহাড় এবং নিম্ন জলাভূমি ব্যতীত সমগ্র সমভূমিটিকে সাধারণভাবে পশ্চিম ঢাল সম্বলিত একটি সমতল ভূমি বলা যেতে পারে। ভূতত্ত্ব ও ভূসংগঠন শাস্ত্রে

এটি 'ত্রিপুরা সমতল' (Tippera Surfaace) নামে অভিহিত হত। বর্ষায় এর কিছু অংশ পানির নিচে থাকলেও এ সমভূমিতে ততটা পলি জমে না, কিন্তু এ নিমজ্জিত মৃত্তিকা বেশ কিছুকাল সিক্ত থাকায় ভালোভাবে চাষোপযোগী হয়।

প্রাচীন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্তর্গত বঙ্গখাতের পূর্বাংশে কুমিল্লা জেলার অবস্থান। লালমাই চান্দিনা ও মেঘনা প্লাবন সমভূমির সমবায়ে এ জেলা গঠিত হয়েছে। ভূস্তরের উর্ধাংশ এখানে বৈচিত্র্যময়। কোথাও এর উঁচু প্লাবন ভূমি, পর্বতের পাদদেশীয় সমভূমি, অপরিণত পলিমাটি। আবার কোন অংশে রয়েছে জলাভূমি। কুমিল্লার অবস্থান কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চলে। ফলে এই স্থান ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু সমৃদ্ধ। শীতের সময় মৃত্তিকা এখানে শুষ্ক থাকে। কিন্তু বর্ষার সমাগমে হয়ে ওঠে সিক্ত ও সরস। এই জেলা অধিকতর ঘনবসতিপূর্ণ। এখানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। উষ্ণতা ও আদ্রর্তা নিয়ে পলিগঠিত মৃত্তিকা উর্বর থাকে। তাই প্রচুর পরিমাণে জন্ম নেয় তৃণ-লতা-গুল্ম।

কুমিল্লার অবস্থান বিষুব রেখার উপরে। সুতরাং, মাঝারি ধরনের উষ্ণমণ্ডলে এর অবস্থান। গ্রীষ্মকালে এখানে সূর্যকিরণ পড়ে লম্বাভাবে। তখন স্থানীয় আবহাওয়া থাকে খুব গরম। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এই স্থানের উপর দিয়ে গ্রীষ্মকালে বয়ে যায় জলীয় বাষ্পবাহী মৌসুমী বায়ু। বিপরীত দিক থেকে শুষ্ক-শীতল বায়ু বয়ে যায় শীতকালে। জলবায়ু তাই সামগ্রিকভাবে সমভাবাপন্ন থাকে।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন জেলার ইতিহাস হচ্ছে ওই দেশের আঞ্চলিক ইতিহাস। কোন একটি দেশকে জানতে হলে দেশের অঞ্চলবিশেষকেও ভালোভাবে জানতে হয়। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসই হচ্ছে একটি দেশের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। কুমিল্লা জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই দৃষ্টিতেই বিচার্য।

'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ প্রথম 'বঙ্গ' নামক উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে আমরা 'বঙ্গ', 'সমতট', 'বরেন্দ্র', 'গৌড়', 'রাঢ়' ইত্যাদি নামের সঙ্গে পরিচিত হই। কুমিল্লা ছিল প্রাচীন 'সমতট' জনপদের অংশ। চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে ভবাক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামদপের সঙ্গে এবং বরাহমিহিরের (৬ষ্ঠ শতক) 'বৃহৎ সংহিতায়' পুণ্ড্রা-তাম্র-লিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে 'সমতট' নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭ম শতকের চীন দেশীয় পরিব্রাজক যূয়ান চোয়াঙ তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে সমতট রাজ্যের সীমা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, এর উত্তরে-নিম্ন ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগর, পূর্বে-পার্বত্য চট্টগ্রাম, এবং পশ্চিমে-পদ্মা নদী। যূয়ান চোয়াঙ সমতটের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় সমতট কামরূপের দক্ষিণে এবং বাংলাদেশের এক বৃহৎ অংশ বা এর নামান্তর মাত্র। ৭ম শতকের শেষ পাদে এসে ইৎসিঙ এর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাও প্রায় একই রকম। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সমতটে 'রাজভট্ট' নামে জনৈক খড়্গ রাজার উল্লেখ করেন। রাজা বৌদ্ধ ধর্মে অণুরক্ত ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল 'জয়কর্মান্তবসাক'- যা বর্তমান চান্দিনা উপজেলার বড়কামতা গ্রাম। যূয়ান চোয়াঙ এর বিবরণে একথাও মনে করার কারণ রয়েছে যে, মধ্যবাংলার কিছু অংশ অন্তত সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান

কুমিল্লা জেলাও যে সমতট রাজ্যভুক্ত ছিল, তারও সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। ৭ম-১২শ শতাব্দী পর্যন্ত তা পল্লবীত হয়েছে। ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দামোদর দেবের অপ্রকাশিত মেহার পট্টোলী প্রমাণে মনে হয় কুমিল্লা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র।

লালমাই ময়নামতি সভ্যতা খনন কাজের ফলে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে প্রতীতি জন্মায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ময়নামতি অর্থাৎ কুমিল্লা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এটি একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পট্টিকেরা রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিরুমলয়লিপিতে যে গোবিন্দচন্দ্র রাজার উল্লেখ রয়েছে তাঁর রাজ্যও হরিকেল, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর মতানুযায়ী, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে আরম্ভ করে একেবারে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডই সমতট নামে পরিচিত ছিল। এই মতটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। নীহাররঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতগণ এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে এ জেলার ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে 'ত্রিপুরা'কে দুই অংশে ভাগ করে। এর এক অংশের নামকরণ করা হয় 'চাকলা-রৌশনাবাদ'। অন্য অংশের নাম রাখা হয় 'ত্রিপুরা'। তবে সামগ্রিকভাবে 'ত্রিপুরা' বলতে কখনো পার্বত্য ত্রিপুরা, কখনো বর্তমান কুমিল্লা, আবার কখনো ত্রিপুরা-পার্বত্য ত্রিপুরাকে বোঝানো হত। এর সীমা ছিল বর্তমান বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ, সিলেটের অর্ধাংশ, নোয়াখালীর তৃতীয়াংশ এবং ঢাকা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে জেলা ত্রিপুরার ছয় আনা অংশ মাত্র ত্রিপুরাধিপতিগণের জমিদারী ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Tippera' বা ত্রিপুরা জেলার 'টিপারা প্রপার' (Tippera Proper) বলতে চাকলা-রৌশনাবাদকে বোঝাত। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সরকার এ জেলাকে তখন 'রৌশনাবাদ-ত্রিপুরা' বলত।

মুসলমান অধিকৃত ত্রিপুরার নাম ছিল চাকলা-রৌশনাবাদ। এটি গঠিত হয়েছিল ২২টি পরগনা নিয়ে। চাকলা-রৌশনাবাদ ছিল পার্বত্য ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ রাজ্য। বাংলার গভর্নর সূজা-উদ-দৌলা কর্তৃক ১৭৩২ সালে বাংলার সঙ্গে একে সংযুক্তিকরণের ফলে নামকরণ করা হয় চাকলা-রৌশনাবাদ। চাকলা-রৌশনাবাদের দায়িত্বে থাকেন ত্রিপুরা রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ রেসিডেন্ট। আর ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর অন্তর্গত অন্যান্য মহল অর্পিত হয় ঢাকার রাজস্ব কর্মচারীদের হাতে। বেশ ক'বছর সেনাবাহিনি মারফত এর খাজনা আদায় করা হত। কেবল ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে নিয়মিত খাজনা আদায় বিষয়ে চাকলা-রৌশনাবাদের সমঝোতা হয়। ক্রমে ১৭৯৩ সালে মহারাজার হাতে এর শাসনভার চলে যায়। এর আগে চাকলা-রৌশনাবাদ আধা-সরকারি (Semi-Independent) অঞ্চল ছিল। এই সময় এই অঞ্চলের অধীনে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা চলে আসে। আবার ত্রিপুরা-নোয়াখালী বিভক্তিকরণের ফলে চাকলার কিছু অংশ ত্রিপুরায় থেকে যায়।

১৭৮৯ পর্যন্ত কেবল রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যই এটিকে জেলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। ১৭৯০ সালে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বুলার (Bullar)

সাহেবের সুপারিশক্রমে ত্রিপুরা জেলার প্রতিষ্ঠা হয়। দাউদকান্দি, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, ভুলুয়া (নোয়াখালী) পরগনা নিয়ে ত্রিপুরা গঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে সরাইল, দাউদপুর, হরিপুর, বেজরা পরগনা ছাড়াও নোয়াখালীর মূল ভূখণ্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের পত্তন হয়। ১৮২১ সালে নোয়াখালী জেলা হিসেবে মর্যাদা পায়। ১৮৩০ সালে ছাগলনাইয়া থানা ব্যতীত নোয়াখালীর বাকি অংশ ত্রিপুরা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৩১ সালে সরাইল পরগনা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হয়, কিন্তু ১৮৭৬ সালে ছাগলনাইয়া থানা ত্রিপুরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঢাকা জেলার গজারিয়া থানা কুমিল্লা জেলার অধীনে ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে তা ত্রিপুরা হতে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত জেলাটি ত্রিপুরা জেলা নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে এক প্রশাসনিক আদেশে এটিকে কুমিল্লা জেলা নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এ নামেই এ জেলা সুপরিচিত।

কুমিল্লা দেশের পূর্বতন ১৯ জেলার অন্যতম জেলা। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লার অন্তর্গত চাঁদপুরও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা দুটি পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে কুমিল্লা থেকে প্রশাসনিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পূর্বে এই দুই মহকুমা সহযোগে কুমিল্লার পরিচিতি ছিল 'বৃহত্তর কুমিল্লা' হিসেবে। বর্তমান কুমিল্লা জেলায় একটি সিটি কর্পোরেশন, ৫টি পৌরসভা এবং ১৬টি উপজেলা রয়েছে। এই উপজেলাগুলো হলো কুমিল্লা সদর উত্তর, বরুড়া, চান্দিনা, দাউদকান্দি, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, হোমনা, মুরাদনগর, তিতাশ, মেঘনা, দেবীদ্বার, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া ও মনোহরগঞ্জ। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত (২০১৩) কুমিল্লাই বাংলাদেশের একমাত্র জেলা যাতে সর্বাধিক সংখ্যক উপজেলা রয়েছে।

১৮৬৪ সালে কুমিল্লায় পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালের ২৩ জুলাই 'সদর দক্ষিণ পৌরসভা, নামে একটি নতুন পৌরসভা সৃষ্টি করা হয়। ২০১১ সালের ২৩শে জুন স্থানীয় সরকার বিভাগ 'কুমিল্লা উত্তর' ও 'সদর দক্ষিণ' পৌরসভা বিলুপ্ত করে 'কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন' (কুসিক) গঠন করে। ১০ জুলাই, ২০১১ এর গেজেট প্রকাশিত হয়। মোট ২৭টি ওয়ার্ড এবং প্রায় ৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে উভয় পৌরসভা এক করে ১০ জুলাই, ২০১১ 'কুসিক' গঠিত হয়। এভাবে কুমিল্লা লাভ করে দেশের ৮ম সিটি কর্পোরেশনের মর্যাদা।

ঘ. জনবসতির পরিচয়

ধর্মীয় পরিচয় দৃষ্টির আলোকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতোই কুমিল্লাতে আনুপাতিক হারে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান জনগণের বসবাস রয়েছে। এই জনপদে সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষই মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। কুমিল্লায় বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি পেশার সম্প্রদায় রয়েছে যা জনবসতি ও জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যে ভিন্নমাত্রাকে চিহ্নিত করে। বাঙালির দেহ গড়ে উঠেছে বহু রক্ত ধারার সংমিশ্রণে। মানুষের নৃতাত্ত্বিক ও বর্ণভিত্তিক বিবরণ বিবেচনায় কুমিল্লা জেলার জনবসতির ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। এসব জনসম্প্রদায়

তাদের জীবিকা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সামগ্রিক জনপ্রবাহে বৈচিত্র এনেছেন, বহুরূপী জীবনবাস্তবতাকে সমাজচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন, পৈত্রিক পেশাকে বুক আগলে রক্ষা করেছেন, কিন্তু তাদের জীবনমানে শত শত বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তারা নিতান্তই প্রান্তজন এবং অভাজন হিসেবে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আদিবাসী টিপরা সম্প্রদায়, সন্দ্বীপী বা সুন্দুপী, হাজাম, রবিদাস (মুচি), ওহাবি, কাহার, কাদিয়ানি, বেদে, সুইপার, চটকি, নাগরচি ইত্যাদি। এছাড়া আছে কৈবর্তদাস, হালিয়াদাস, চণ্ডাল, গন্ধধবণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা), বারুই (পানচাষী), পাটিয়াল (মোর্তা দিয়ে পাটি বানায়), বাদ্যকর ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জাতি কোন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত নয়। বিভিন্ন রক্তধারায় মিশ্রিত এ জাতিকে নৃতত্ত্বগত জাতি না বলে ধর্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতি বলাই সঙ্গত। তুর্কি, ইরানি, আফগান, মোগল প্রভৃতি অভিযানকারীর মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার মুসলমানদেরকে বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কুমিল্লায় মুসলমান আমলে কোন সুলতান বা তাঁর বংশধরেরা বাস করতেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে পশ্চিমের দেশ হতে আগত অসংখ্য রাজ-কর্মচারী, সৈনিক, ফকির দরবেশ প্রভৃতির স্থায়ী বসতি এখানে নিশ্চিতভাবেই ছিল। কুমিল্লায় দেওয়ান, শিকদার, পাটোয়ারী, কাজী ইত্যাদি উপাধিযুক্ত বহু মুসলিম পরবিারের অস্তিত্ব দেখা যায়। এক সময়ে তাদের পূর্ব পুরুষগণ ভূমি প্রশাসনের রাজ-কর্মচারী ছিল। ইসলাম প্রচারের জন্য কুমিল্লায় বহু পীর ফকিরের আগমন ঘটে। এদের অনেকেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। আবার সৈয়দ, মীর ইত্যাদি উপাধিধারী লোকদের পূর্ব পুরুষও এসেছিল আরব থেকে। তাদের ছাড়া বাকিরা হলো ধর্মান্তরিত মুসলমান। মুসলিম সমাজে হিন্দুদের মতো তেমন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ দেখা যায় না। তবে দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো কুমিল্লায়ও এ ধরনের কিছু লোক ছিল এবং এখনো আছে। মুসলিম সমাজে এরা ঠিক অস্পৃশ্য না হলেও অপাঙক্তেয় জীবন-যাপন করে। নিম্নে এসব নিম্নবর্গের হিন্দু মুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা হলো,

সন্দ্বীপী বা সুন্দুপী : কুমিল্লা জেলার অনেক গ্রামে সন্দ্বীপী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। কোন কোন গ্রামের সব জনগণই সন্দ্বীপী। যেমন, বরুড়া উপজেলার মস্কিপুর, হোসেনপুর গ্রাম (মহেশপুর ইউনিয়নভুক্ত)। এছাড়া বরুড়ার অলিতলা, আরিফপুর, নারায়ণপুর, লতিফপুর, গোপালনগর, ভৈষখোলা ইত্যাদি গ্রামে এবং সদর দক্ষিণ উপজেলার লালমাইয়ে সন্দ্বীপী বা সুন্দুপী জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের শেকড় সন্ধানে দুটি মতের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মতে বলা হয়, উপকূলীয় সন্দ্বীপ অঞ্চল সাগরের জোয়ার ভাটায় বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। এভাবে সাগরগর্ভে চলে যাওয়ার ফলে কিছু লোক নিরূপায় হয়ে পড়ে। এমন কিছু 'নদীভাঙ্গা পরিবার' কয়েকশত বছর পূর্বে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থেকে আগত বলে তাদেরকে সন্দ্বীপী বা কথান্তরে সুন্দুপী বলা হয়। এ বিষয়ে মহেশপুর গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক মো : আবুল কাশেম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নমত প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, এরা সন্দ্বীপ থেকে এসেছে একথা সত্য। তবে বিশেষ কথা হলো যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ ছিল একরোখা ও স্বেচ্ছাচারী। তারা সমাজ-

রাষ্ট্রের আইন ও বিধি বিধানের তোয়াক্কা করত না, নিষেধের ডোরকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে সমাজ বহির্ভূত কাজ ও অপরাধ করে চলত। তখনকার শাসকবর্গ এ জাতীয় লোকদের শাস্তি হিসেবে জনমানবহীন দ্বীপে পাঠিয়ে দিত। কালক্রমে সন্দ্বীপ অঞ্চলের উত্তর পুরুষেরা দেশের নানা সমতল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই আজকের সন্দ্বীপী।

মূলত এদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের জন্য কুমিল্লায় 'সুন্দুপী' ও 'দেশি' এই দুই ধারায় ভাগ করে জনগণকে দেখা হয় বিশেষত আত্মীয়তা বা বিবাহবন্ধনের ক্ষেত্রে। এরা খুব সংগ্রামী ও পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী। জীবনধর্মে এদের সক্রিয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। কামে-প্রেমে-পরিশ্রমে ও একতার বন্ধনে এদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব দৃষ্ট হয়। এদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, অভ্যাস ভিন্ন ধাঁচের। তাদের আত্মীয়তা ও বিবাহবন্ধন সচরাচর নিজেদের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাদের অনেকের বংশগত পেশা কসাই, কেউ 'তরজার কাজ' (বাঁশের বেড়া, সিলিং, গোলা ইত্যাদি বানায়) করে। এদের কেউ একেবারে গরিব, ভিক্ষা করে জীবন বাঁচায়। বর্তমানে এদের অনেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে উন্নত আধুনিক জীবনযাপন করছে।

টিপরা : ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী জনগণ স্থানীয়ভাবে টিপরা নামে পরিচিত। অন্যান্য মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অনুরূপই তাদের দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্য। গায়ের রঙ ফর্সা এবং অনুজ্জ্বল বাদামি। তাদের প্রায় সবাই সনাতন হিন্দুধর্মের অনুসারী এবং শৈব বা শিবভক্ত। তবে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক খ্রিষ্টান ধর্মের অনুশাসন পালন করে, এরা ধর্মান্তরিত হওয়া টিপরা। কুমিল্লায় বসবাসরত এই একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের আস্তানা হলো লালমাই পাহাড়। কোটবাড়ি জাদুঘর এলাকা সালমানপুর, বৈষ্ণবমুড়া, জাম্মুড়া, হাতিগাড়া, দক্ষিণকাছাড় ইত্যাদি এলাকায় এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার রয়েছে। তবে লালমাই পাহাড়ের ক্ষুদ্রায়তন এবং চারপাশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস বলে ত্রিপুরা জনজীবনে বাঙালি প্রভাব পড়েছে।

ত্রিপুরা বা টিপরাগণ 'ককবরক' ভাষায় কথা বলে। নিজেদের মধ্যে তারা মাতৃভাষাই ব্যবহার করে থাকে। তবে বাংলা ভাষায় কথা বলাতেও তাদের পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে। তাদের ভাষায় রয়েছে তাদেরই জীবন বাস্তবতাধর্মী গল্প ও কিচ্ছাকাহিনি, রূপকথা ও উপকথা, গান, ছড়া, রসগল্প ও প্রবাদ-প্রবচন। তাদের ভাষায় বাংলা 'চ' ও 'ং' চিহ্নের ব্যবহার বেশি। ককবরক কথার নমুনা হিসেবে লালমাই পাহাড়ের জামমুড়ার স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা পরিবেশিত চুটকিটি উপস্থাপিত হলো,

"মুচু চা খালইয়োগো/গুদক চাখালেই তো গো
চাখাকে খোয়াক মোয়াক/হুআহা/হুআহা ও জ্বালা মচহ ইয়ংমা"
অর্থাৎ "মরিচ খাইলে ঝাল লাগে/আলুর দম খাইলে স্বাদ লাগে
হু আহা হু আ অ জ্বালা/মরিচের ঝাল লেগেছে"
[অনুবাদ : স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা, জামমুড়া, লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা]

টিপরা নৃগোষ্ঠী নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকেই স্বচ্ছন্দবোধ করে। তবে সাধারণ বাঙালি পোশাকও তারা পরে থাকে। টিপরাদের আচার অনুষ্ঠানে সুর-সংগীতের প্রাধান্য আছে। নিজস্ব বর্ষপঞ্জিকা ত্রিপুরাব্দের লগ্ন অনুসারে তারা উৎসব ও পূজা পার্বণ পালন করে

থাকে। তাদের নববর্ষবরণের নাম 'গরিয়া'। এটি তাদের অন্যতম নৃত্যগীতের লোকোৎসব। টিপরাদের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো অনুসৃত হয়। বিয়েতেও তাদের এই পিতৃতান্ত্রিকতা লক্ষণীয়। কুমিল্লার টিপরাদের চলাফেরা, হাট বাজার বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত বলে তাদের খাবার-দাবার ও সাধারণ বাঙালি ঘরানার। তবে তারা [illegible] চোঙ্গা বা মাটির পাত্রে রেখে বিশেষ কায়দার পঁচিয়ে এক ধরনের মদ তৈরি করে যা তাদের নেশার বস্তু। এই পাহাড়িরা বাঙালিদের সঙ্গে কোন রকম সংঘাত ছাড়াই বসবাস করে আসছে।

কাহার : ব্রাহ্মণ পিতা এবং নিষাদ বা চণ্ডাল মাতার সন্তানগণ কাহার হিসেবে পরিচিত। তারা আদিতে বিহারের অধিবাসী ছিল। তারা নিম্নশ্রেণির শুদ্র এবং আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। এই বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা শিবিকা বা পালকি বহন করা। সামাজিক বিচারে কাহারগণ কুর্মি ও গোয়ালা বর্ণের সমকক্ষ। তারা বেহারা নামেও পরিচিত। আবার হিন্দু বেহারাদের মাহারাও বলা হয়।

লাকসাম রেলওয়ে জংশন এবং পূর্ব লাকসামের মহাশ্মশান সংলগ্ন রেল লাইনের পাশে ৮/১০টি কাহার পরিবার বসবাস করে। কুমিল্লায় লাকসাম ছাড়া আর কোথাও কাহার সম্প্রদায় নেই। বর্তমানে লাকসামের কাহারদের বয়স্ক দু'চারজন এখনো বেঁচে আছেন যারা আগে পালকি বহন করতেন। বর্তমানে পালকির ঐতিহ্য উঠে যাওয়ায় তারা নতুন পেশা গ্রহণ করেছেন। যেমন অযোদ্ধা প্রসাদ কাহার লাকসাম বাজারের 'সাগর সুপার মার্কেটের' মালিক। কাহারেরা আঙুর দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট মদ তৈরি করে যা তারা নিজেরা খায় এবং গোপনে বিক্রি করে।

ওহাবি : এটি একটি বিশেষ মুসলিম সম্প্রদায় যা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠা পায়। সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ 'সুন্নী' বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় তাদেরকে 'ওহাবি' হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁরা নিজেদেরকে 'আদিপন্থী' এবং 'মুওয়াহিদি' বা একত্ববাদী' পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। ওহাবিরা কোন রহস্যময়তা সমর্থন করে না এমনকি ওলীদের বিশেষ ক্ষমতায়ও তারা বিশ্বাসহীন। একমাত্র নবীজীর সমাধিসৌধ ছাড়া আর কোন স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন তাঁরা সমর্থন করেন না। তারা মিলাদেরও পরিপন্থী। কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার সরাফতি, মুড়াবাজাল, সালুকিয়া ইত্যাদি ওহাবিপ্রধান গ্রাম। এছাড়া সদর দক্ষিণে নন্দনপুর, হালিমানগর প্রভৃতি গ্রামে ওহাবি রয়েছে।

রবিদাস : লাকসাম জংশন ও উত্তর বাজারের আশেপাশে ৩১টি রবিদাস পরিবার বসবাস করে। ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা এখানে বাস করে আসছে কয়েক পুরুষ ধরে। লাকসামে এদেরকে 'মুচি' বা 'চামার' বলা হয়। জুতা সেলাই করাই তাদের প্রধান পেশা। তাদের সন্তানদের কেউ কেউ আজ লেখাপড়া শিখছে এবং পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ রবিদাস পরিবার শুকর পোষে। লাকসামে তাদের একটি নিজস্ব শ্মশান আছে। লাকসাম ছাড়া কুমিল্লা সদরে কালীর বাজার এবং বরুড়া উপজেলা সদর ও অন্যান্য এলাকায় কম বেশি মুচি রয়েছে।

কাদিয়ানি : এ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানি। তিনি পূর্বপাঞ্জাবের অমৃতসর এলাকার কাদিয়ান গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর নাম থেকেই

অনুসারীগণ কাদিয়ানি এবং আহমদিয়া নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মীর সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই মতবাদটি প্রচার পায়। তাঁরা আল্লাহ-রাসুলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ইসলামী শরিয়তবিরোধীদের অবিশ্বাসী ও ইসলামবিরোধী মনে করে। সর্বশেষ নবী হিসেবে মুহম্মদ (সা:) এর স্বীকৃতি, ইমাম মেহেদী ও সাসীহর আবির্ভাব, ঈসা এর মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের ভিন্নমত রয়েছে। নবীজীকে তাঁরা শেষ নবী মনে করেন না। কাদিয়ানিকেই তাঁরা ইমাম মেহেদী ও সাসীহ মনে করে। কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার কাইক্কার চর গ্রামে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোক আছে।

সওদাগর : বেদে সম্প্রদায়েরই একটি বিশেষ উপগোষ্ঠী তারা। ধর্মীয় বিচারে এরা মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এরা কসমেটিক সামগ্রী ফেরি করে বিক্রি করে দেশের নানা প্রান্তে। তবে এরা অন্য বেদে গোষ্ঠীর মতো ভাসমান নয়। কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর তীরের একটি গ্রামে তারা স্থায়ী ভিটায় পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। মনোহরগঞ্জ বাজারের পশ্চিম পাশে কাজিমউদ্দীন মসজিদ পেরিয়ে পশ্চিম দিকে গেলেই তাদের এ বিশেষ পাড়াটি পাওয়া যায়, যেখানে বাস করছে এরকম প্রায় দেড়শ পরিবার। এদের বউ-ঝিও এ বৃত্তির সাথে জড়িত। অশিক্ষা ও বাল্যবিবাহ এ সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক চিত্র। এদের বিয়ে-শাদী নিজেদের মধ্যে যেমন হয়, তেমনি সাধারণ গৃহস্থ মুসলিম ঘরেও হয়ে থাকে। গৃহস্থ ঘরে বিয়ে করতে পারা বা বিয়ে দিতে পারা তাদের জন্য আভিজাত্যের প্রতীক।

হাজাম : এরা একটি বিশেষ মুসলিম জনসম্প্রদায় হিসেবে এখনো অস্তিত্বমান আছে। এদের পূর্বপুরুষ হয়তো কোন আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির লোক ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই এ জনগোষ্ঠী মুসলমান বালকদের খৎনা করিয়ে আসছে। ষাড় এবং পাঁঠাকে খাসী করানোর কাজও এরা করে থাকে। কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার পাঠানপাড়া, চান্দিনার ছায়কট, সদর উত্তরের বামৈল, লাকসামের ফাজিলপুর গ্রামে হাজাম সম্প্রদায় রয়েছে। তবে সামাজিক চাহিদা পূরণার্থে সব অঞ্চলেই এদের প্রতিনিধি পাওয়া যায়। এরা লোকজ পদ্ধতিতে কলমতারা (বিশেষ ছুরি) দিয়ে খৎনার চামড়া কেটে ন্যাকড়া আগুনে পুড়িয়ে কাটা চামড়ার ওপর বেঁধে দেয়। আধুনিক সময়ে অনেকে ডাক্তারের নিকট খৎনা করায় বলে এদের কদর কমে যাচ্ছে। সাধারণ মুসলিম পরিবারে এদের সামাজিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ নয়।

নাগারচি : এদেরকে বাদ্যকর বা বাজানিয়াও বলে। এরা নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। তাদের বসবাস সাধারণত শহর ও মফস্বল শহর কেন্দ্রিক। হিন্দু ও মুসলমানগণ তাদের পূজা-পার্বণ ও বিয়ের অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজানোর জন্য এদের নিয়ে থাকে। তারা ঢাক, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদি বাজিয়ে পরিবেশকে সরগরম করে তোলে। সুর ও বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও মেরামতের কাজও তারা করে। বরুড়া ও লাকসাম উপজেলা সদর, কুমিল্লা শহর ও অন্যান্য স্থানে এদের বসতি আছে।

চটকি : এরা বেদেদেরই একটি দল। এদের স্থায়ী বসবাস রয়েছে কুমিল্লার বরুড়া ও লাকসাম উপজেলা সদরে। এরা 'চল' (মাছ ধরার যন্ত্র) বানায়, ছাতা মেরামত করে। লাইট, তালাচাবি ইত্যাদি মেরামত করেও জীবিকা চালায় এই চটকি সম্প্রদায়।

সুইপার : লাকসাম রেলওয়ে জংশনের পাশে বেশকিছু সুইপার ও মেথর পরিবার রয়েছে। মূলত রেল জংশন গোড়াপত্তনের পূর্ব হতেই এ এলাকায় এদের জীবনযাত্রা শুরু হয়। চারপাশের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে এরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে, তবে এদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটেনি আজও।

৬. নদ-নদী ও খাল-বিল

কুমিল্লা জেলার ভূতাত্ত্বিক গঠন কাঠামোতে আজ যে প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষযোগ্য– তার অধিকাংশই নদীর অবদান। প্রাচীনকাল থেকেই এ জেলার ভেতর দিয়ে বেশকিছু নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে এর গঠনকে নির্ধারণ করেছে। কুমিল্লা জেলার নদ-নদীর আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার সীমানা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, কারণ নদীর প্রবহমানতা স্থানবিশেষে গণ্ডিবদ্ধ নয়। জেলার ভূতাত্ত্বিক ভিত্তি থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যে পলজ শিলার অস্তিত্ব রয়েছে, তা যে প্রাচীন নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত হয়েছিল তা সন্দেহাতীত। লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের পুরাতন লালচে পলি ও প্রাচীন নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। এ কারণে নদী নালার পরিচয় প্রদান তাৎপর্যবহ। কুমিল্লার উত্তরাংশে রয়েছে তিতাস প্রবাহ, মধ্যাংশে গোমতী, মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ডাকাতিয়া, দক্ষিণ-পূর্বাংশে ছোট ফেনী এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে আছে মেঘনা নদী। এই নদীগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক উপ বা শাখা নদী এবং বিল-খাল।

মেঘনা : মেঘনা নামে কোন স্বতন্ত্র নদী কোথাও উৎপন্ন হয়নি। আসাম ও মেঘালয় পর্বতসমূহ থেকে উৎপন্ন অনেক নদী সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মিলিত হয়ে 'মেঘনা' নাম ধারণ করে কুমিল্লা জেলায় প্রবেশ করেছে। ভৈরবের পর মেঘনা পশ্চিম-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার এবং পরে প্রায় দক্ষিণামুখী হয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুরের সীমানা স্পর্শ করেছে।

গোমতী : এর উৎপত্তি ত্রিপুরা রাজ্যের তিচ্না উর্ধ্বভাঁজ থেকে। ত্রিপুরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুমিল্লা শহরের ৮মাইল উত্তরে বিবির বাজারের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কুমিল্লা থেকে জাফরগঞ্জ, দেবীদ্বার উপজেলা এবং কোম্পানীগঞ্জ ও মুরাদনগর উপজেলা পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম মুখে এবং মুরাদনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে গোমতী দাউদকান্দির নিকট কলাতিয়া নামক মেঘনার একটি শাখার মধ্যে পড়েছে। বর্ষায় নদীটি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রচুর পানি বয়ে এনে বন্যা সৃষ্টি করতো বলে গোমতী তীরে বাঁধ দিয়ে কুমিল্লা শহর ও শহরের পশ্চিম দিকের কৃষি জমি রক্ষা করা হয়েছে। তবে এতে বহন করে আনা পলি দ্বারাই নদীটি দিনদিন গভীরতা হারাচ্ছে। ফলে বন্যাও হচ্ছে। এজন্যই গোমতীকে কুমিল্লার দুঃখ বলা হয়।

গোমতীর এ সুপরিচিত ধারা ও জলপ্রবাহ ছাড়াও আরও একটি জলস্রোত গোমতী নামে পরিচিত। মেঘনার কলাতিয়া শাখার সঙ্গে গোমতী যেখানে মিশেছে সেই মিলিত স্রোত দুই মাইল দক্ষিণে এবং দাউদকান্দি থেকে মাইলখানেক দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে মেঘনায় পড়েছে। সেই বাঁকের মুখে সৃষ্টি করেছে ধনাগোদা নামক নদী।

ধনাগোদা দক্ষিণ পূর্বদিকে বেশ কয়েক মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর বোয়ালজুড়ি নামক একটি খালের সঙ্গে মিশেছে। মতলব বাজারের উত্তরে ধনাগোদা অনেক বাঁকের সৃষ্টি করে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। মতলব বাজারের পশ্চিমাংশে এটি গোমতী নামে পরিচিত। এতে মনে হয় মেঘনার কলাতিয়া শাখার সৃষ্টি হবার আগে গোমতী দাউদকান্দিকে উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে বেষ্টন করে বর্তমান ধনাগোদার খাত দিয়ে মেঘনায় মিলিত হত।

গো-মুত (প্রস্রাব) থেকেই নাকি গোমতী নামের উৎপত্তি বলে কিংবদন্তি রয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম গোমতীর বিদ্রোহী রূপ দেখেননি, দেখেছেন আপন বেগে চলার মৃদু ছন্দ ও মন্থরগতি জল-কলতান। সে কলতান তাঁর চোখে ছড়িয়ে ঘুমের আবেশ। 'ছায়ানট' কাব্যের 'চৈতি হাওয়া' কবিতার একটি স্তবকে কবি গোমতীর কথা তুলে ধরেছেন,

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুমতী নদীর ঘুঙুর পরা পায়।

ডাকাতিয়া : ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এ নদীর উৎপত্তি। এটি কুমিল্লায় প্রবেশ করে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ধারা লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্ব দিকের বাগমারা গ্রামে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে গিয়ে পড়ে দক্ষিণমুখী গতি ধারণ করে লাকসাম হয়ে বর্তমান মনোহরগঞ্জ উপজেলা সদরে গিয়ে স্ফীত হয়। তারপর চিতোষীর পূর্বদিক দিয়ে পশ্চিমমুখে হাজীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে। হাজীগঞ্জ থেকে অনেক বাঁক সৃষ্টি করে চাঁদপুরে গিয়ে মেঘনায় মিলেছে।

ছোট ফেনী : ডাকাতিয়া ও ছোট ফেনী নদী উৎপত্তি স্থলে একই। বাগমারা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে নদীটি বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়ে ছোট ফেনী নাম নেয়। তারপর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে অগণিত বাঁক সৃষ্টি করে গুণবতী ও ফেনীর দাগনভূঁঞার পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বুড়ী নদী : গোমতীর শাখা নদী। এটি মুরাদগর উপজেলার কোম্পানীগঞ্জের কাছে গোমতী থেকে নির্গত হয়ে উত্তর-পূর্ব মুখে গতিধারণ করে বরদাখাত পরগনার পূর্ব ও গঙ্গামণ্ডল পরগনার পশ্চিম সীমানা নির্দিষ্ট করে কুটির নিকট সালদা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নবীনগরের কাছে তিতাস নদীতে পড়েছে। সমতটের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের তাম্রশাসনে 'বুড়িগাঙ্গিন' নামে এ নদীর উল্লেখ আছে।

ঘুঙুর নদী : ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বুড়িচং উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুমিল্লায় প্রবেশ করেছে। উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর দিকে সালদা নদীতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এটি একটি মৃতপ্রায় নদী।

কার্জন খাল : ১৮৯৯-১৯০৪ পর্যন্ত সময়কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় লর্ড কার্জন সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেন এবং এজন্য চার কোটি টাকা ব্যয় করেন। বরুড়া উপজেলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে খোশবাস, মহেশপুর, ঝলম ও চিতড্ডা ইউনিয়নকে খালটি উত্তর দক্ষিণে স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়েছে। এটি চান্দিনা বরুড়ার সবচেয়ে বড় খাল। সম্ভবত লর্ড কার্জনের সেচ সম্প্রসারণ নীতির আওতায় এ খাল কাটা হয়। এ খালের জল ধারায় লর্ড কার্জনের

নামটি আজও বেঁচে আছে। বর্ষায় নৌকায় মালামাল পরিবহন, নৌকায় 'নাইওরী আনা, ভাসমান নৌকায় বেদে সম্প্রদায়ের বসবাস, পাট জাগ দেওয়া ইত্যাদি সংস্কৃতির সাথে এ খালের ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রামপ্রসাদের খাল ও মাজোরা নদী : দেবীদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ থেকে রামপ্রসাদের খাল নামক একটি খাল উত্তর পূর্বদিকে চলে গেছে। এর উত্তর ভাগ মাজোরা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ক্ষীণধারার নদীটি অবশেষে সালদা নদীতে মিশেছে।

চান্দিনার বড় খাল এবং সেই খালের সঙ্গে যুক্ত বরুড়ার কার্জন খাল লাকসাম ও চিতোষীর মধ্যবর্তী স্থানে ডাকাতিয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ এলাকার বেরুলা, গাগৈর, নদনা ও চাইলতাতলী খাল ডাকাতিয়ার সঙ্গে মিশেছে। এছাড়া সদর দক্ষিণ উপজেলার মৃতপ্রায় গঙ্গাতৃরি নদী লালমাই পাহাড়ের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডাকাতিয়ার সঙ্গে মিলেছে। এছাড়া আছে বিজয়পুর খাল, হারা খাল ও চৌদ্দগ্রাম খাল।

১৮৭৬ সালে হান্টার বৃহত্তম কুমিল্লায় ৯২ বর্গমাইল বিলের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারায় তা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় কয়েকটি বিল ও জলাভূমি এখনো বিদ্যমান। এগুলো হলো- তৃষ্ণা বিল (নাঙ্গলকোট), বাইদার বিল (মুরাদনগর), ভারেল্লা বিল (বুড়িচং), সাতবাড়িয়া বিল (চৌদ্দগ্রাম) এবং ঘুঘরা জলা (চান্দিনা-কচুয়া), দীঘল গাঁয়ের জলা ইত্যাদি।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রাচীন সমতট রাজ্যের অংশ কুমিল্লা শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পালন করে এসেছে বাতিঘরের ভূমিকা। এখানে প্রাচীন ভেড্ডিগণ উঁচুমানের শিক্ষা সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। ৫ম শতকের শেষে এবং ৬ষ্ঠ শতকের শুরুতে এ জেলায় বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রলিপি থেকে এর প্রমাণ মিলে। দেবীদ্বার উপজেলার গুণাইঘর গ্রামে 'আশ্রম বিহার' ও 'রাজ বিহার' নামে দুটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। বাংলাদেশের বিহারগুলোর মধ্যে এদুটো সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচনা করা হয়। গুপ্তদের পরে খড়্গ, দেব, চন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজবংশের শাসন চলে কুমিল্লায়। তাঁদের রাজত্বকালে লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়। এর কয়েকটি ১২শ, ১৩শ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। প্রাচীন বিহারগুলো ছিল বর্তমান কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হলেও চিকিৎসা, ন্যায়-নীতি ইত্যাদি শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে কুমিল্লায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম অনুসারী তুর্কিদের আগমনের ফলে এ জেলার শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়। তখন বৌদ্ধরা ছিল সীমিত সংখ্যার এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ছিল। হিন্দু অধিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং তা ছিল মসজিদকেন্দ্রিক। ধর্মীয় আরবি ফার্সির সঙ্গে বাংলা ভাষা, গণিত ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল

পাঠশালা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। তাতে সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকই শিক্ষা গ্রহণ করত। সেই ধারাবাহিকতায়ই কুমিল্লা আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠ হয়ে উঠেছে।

কুমিল্লার প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু হলেন মহাস্থবীর শীলভদ্র, যিনি ছিলেন ৭ম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান (বর্তমান সময়ের উপাচার্য পদ)। তাঁর জন্মস্থান ছিল সমতটের রাজধানী 'জয়কর্মান্তবসাক' (বর্তমান চান্দিনা উপজেলার বড়কামতা) এলাকায়। শীলভদ্রের হাত ধরে এ পূণ্য শিক্ষাভূমি আজ আধুনিক বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে। এই বিদ্যাপীঠগুলির পর্যায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ- যেগুলো প্রথম দিকে শুরু করে এখনো জ্ঞানের আলো বিতরণ করছে। এছাড়া বয়সে নবীন হয়েও যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার গুণগত মান, সার্বিক শৃঙ্খলার মানদণ্ড এবং সর্বোপরি বোর্ডের প্রতিযোগিতাপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষায় শীর্ষ ফল অর্জন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের ও নাম পরিচয় প্রদান করা হল। এখানে ৪টি শিক্ষা স্তরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচিত হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা পর্যায়

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় : কুমিল্লার কোটবাড়িতে শালবন বিহার ও ময়নামতি মিউজিয়াম সংলগ্ন লালমাই পাহাড়ের সালমানপুর মৌজার ৫০ একর জমিতে ২০০৬ সালে দেশের ২৫তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সুনামের সাথে মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. আমির হোসেনের নেতৃত্বে ১১০ জন শিক্ষক, প্রায় ৩ হাজার জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৪টি বিষয়ে অনার্স মাস্টার্সে পঠন, পাঠন চলছে। ৩টি অনুষদ কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। পাহাড়ের উঁচু টিলায় রয়েছে এর ৩টি একাডেমিক ভবন এবং পাদদেশের সমতলে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন। হল রয়েছে ছেলেদের ৩টি (শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) ও মেয়েদের ১টি (নবাব ফয়জুন্নেসা হল)। এ ছাড়া আছে একটি গ্রন্থাগার, মসজিদ, শহীদ মিনার (নির্মাণাধীন), ক্যাফেটেরিয়া এবং ২টি শিক্ষক ডরমিটরি। বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লালমাটির পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে এর অবস্থান। পাহাড়ের উপরে ঝুলে থাকা হল ও অন্যান্য ভবন থেকে আকাশ ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখলে বুক ভরে যায়, নস্টালজিয়া মন আচ্ছন্ন করে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ : রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র রায় ১৮৯৯ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি শহরের কান্দিরপাড় এলাকায় রাণীর দিঘির পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত এটি বাংলাদেশের নবম প্রাচীন কলেজ। ১৯১০ সালে এটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ১৯২৭ সালে কলেজটিতে ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে কলেজটিতে ২২টি বিষয়ে অনার্স ও ২০টি বিষয়ে

মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৫৮-৬৮ পর্যন্ত এ কলেজে নৈশকালীন শিফট ছিল। ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজের ডিগ্রি শাখাটি শহরের পশ্চিম প্রান্তে ধর্মপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৮ সালে কলেজটি সরকারি করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এটি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত কলেজটি উচ্চমাধ্যমিক ও অনার্স মাস্টার্সের ভাল ফলের জন্য অর্জন করেছে দেশ জোড়া খ্যাতি ও পরিচিতি। এছাড়া খেলাধুলা, বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিভার প্রমাণ রেখে আসছে।

উভয় ক্যাম্পাস জুড়ে কলেজ ৩৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষকের প্রচেষ্ঠায় প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠন চলছে। কলেজে উচ্চ শিক্ষা সর্বস্তরের ছাত্রদের জন্য রয়েছে 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল' ও ছাত্রীদের জন্য আছে 'নবাব ফয়জুন্নেছা হল'। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রদের জন্যও ৩টি হোস্টেল আছে। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। কুমিল্লা বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খান দু' দু' বার এ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কলেজে এসেছিলেন এবং কলেজ ম্যাগাজিনে একটি ইংরেজি কবিতাও লিখেছিলেন। রাণীর দিঘির পাড়ে যেখানে কলেজের নান্দনিক স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত, সেখানে বসে কাজী নজরুল ইসলাম গান ও কবিতা রচনা করতেন, আড্ডা দিতেন। এখানে বসেই কবি লিখেছিলেন "মাধবীলতা দোলে, কী আনন্দে দোলে" গানটি। অল্প কথায় এ কলেজের সুইচ্চ গৌরবগাথা বলে শেষ করার নয়। কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তিতাশ চৌধুরী কলেজের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে লিখেছেন 'কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ : এ যুগের কিংবদন্তি' নামক বৃহদাকার গ্রন্থ। এক কথায় কুমিল্লার তথা দেশের শিক্ষা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনে কলেজটির রয়েছে অনন্য সাধারণ অবদান। ১৯৯৯ সালে কলেজটির গৌরবময় শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপিত হয়।

এছাড়া রয়েছে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে নারী শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শ্রীকাইল কলেজ : কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার শ্রীকাইলে অবস্থিত। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪১ সালে নিজ গ্রামে ৩৫ একর জমিতে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড. অতীন্দ্রনাথ বসু। ৫২ জন ছাত্র নিয়ে কলেজটি প্রথম যাত্রা শুরু করে। শুরুতে এ কলেজে কোন ছাত্রী ছিল না। বর্তমানে কলেজটি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণায় মুখর। কলেজে একটি ত্রিতল একাডেমিক ভবন, একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, অধ্যক্ষের বাসভবন, শিক্ষকদের ২০টি আবাসিক ফ্ল্যাট ও একটি মিলনায়তন রয়েছে। একসময় শ্রীকাইল ছিল বৃহত্তর কুমিল্লার প্রথম গ্রেডের দ্বিতীয় কলেজ। ১৯৪৫ সালে এই কলেজের ছাত্র অনুণ দত্ত অবিভক্ত বাংলার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। কলেজটির বর্তমান ফল সন্তোষজনক।

এছাড়াও কুমিল্লা সদরে সোনার বাংলা কলেজের নাম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ যুগের কিংবদন্তি

প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা জিলা স্কুল। স্থাপিত : ১৮৩৭ খ্রি.

অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ : মুরাদনগরের রামচন্দ্রপুরে অধ্যাপক আব্দুল মজিদ স্বনামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনিই কলেজটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে কলেজটিতে ৩৫জন শিক্ষক ও প্রায় ১২শ ছাত্র-ছাত্রী আছে। প্রথম বছর থেকেই এ কলেজের শিক্ষার্থীরা বোর্ডের মেধাতালিকায় স্থান করে নিতে থাকলে কলেজটি শিক্ষিত মহলে পরিচিত হয়ে ওঠে। তবে বিশেষ করে বাণিজ্য গ্রুপের শিক্ষার্থীদের বেশি ভাল করতে দেখা যায়। কলেজের শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে থাকে।

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ : এটি কুমিল্লা সেনানিবাসের ভিতরে সেনাবাহিনি পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইচ.এস.সি পরীক্ষায় প্রতি বছর এ কলেজের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। জিপিএ পাঁচ (A+) প্রাপ্তির সংখ্যার দিক দিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের পরেই এর অবস্থান। এছাড়া সার্বিক শৃঙ্খলার মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠানটি ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ : লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁয়ে নবাব বাড়ির সামনেই কলেজটি অবস্থিত। নবাব ফয়জুন্নেছার উত্তরাধিকারীগণ তাদেরই নিজস্ব ভূমিতে ১৯৪৩ সালে এ ঐতিহ্যবাহী কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কলেজটিতে ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। ১৯৮২ সালে এটিকে সরকারি করা হয়। এক সময় (সরকারিকরণের পূর্বে) এ কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন প্রয়াত ড. আহমদ শরীফ যিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শ্রেয়োবাদী দার্শনিক। নবাব ফয়জুন্নেছার একমাত্র প্রতিকৃতিটি

এ কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। কলেজটির বর্তমান অধ্যক্ষ ধীরেশ রঞ্জন ভৌমিক।

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ : ১৯৮৩ সালে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কুমিল্লার কোটবাড়িতে ময়নামতি সভ্যতা ও শালবন বিহারের পাশে অবস্থিত। পূর্বে সরকাররিভাবে স্থাপিত রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলটিকেই পরবর্তীতে ক্যাডেট কলেজে রূপ দেয়া হয়। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী (A+) পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট : ১৯১৪ সালে স্থাপিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউটটি কুমিল্লা শহরে টমসন ব্রিজ এলাকায় অবস্থিত। বিভাগ পূর্ব যুগ হতেই এটি বাংলাদেশে একক প্রতিষ্ঠান। পরে রাজশাহীতে এ জাতীয় একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এটি বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি জরিপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এখানে ভূমি জরিপ সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রদান করা হয়।

এছাড়া লালমাই পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের লালমাই কলেজ, বরুড়ার পয়ালগাছা পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ (১৯৬৯), বরুড়া শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ (১৯৭২) এবং 'কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ' (কুমিল্লা) এবং শতভাগ শিক্ষার্থী পাশের প্রতিষ্ঠান সোনার বাংলা কলেজ (বুড়িচং) এর নাম উল্লেখ করা যায়।

মাধ্যমিক পর্যায়

কুমিল্লা জিলা স্কুল : ১৮৩৭ সালে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে কুমিল্লা জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কুমিল্লার প্রথম ইংরেজি হাই স্কুল। কুমিল্লায় এ যাবৎ বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। শহরের ধর্মসাগর দিঘির পূর্বপাড়ে, কুমিল্লা স্টেডিয়ামের পাশে ৮ একর ভূমিতে স্কুলটির অবস্থান। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মি. এইচ.জে. লেইসেস্টার। বর্তমানে এই স্কুলে ৩টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি ছাত্রাবাস এবং ১টি অডিটোরিয়াম রয়েছে। স্কুলে দুইটি শিফটে ৫৩জন শিক্ষকের শ্রমে-ঘামে পঞ্চম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ছাত্রের পাঠদান প্রক্রিয়া চলছে। সর্বশেষ এস.এস.সি পরীক্ষায় এ স্কুলের ছাত্ররা সর্বাধিক সংখ্যক A+ পায় এবং শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জন করে। তাছাড়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক, ভাষা প্রতিযোগিতা, গণিত অলিম্পিয়াড ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীগণ সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠানটির বয়স ১৭৫ বছর পূর্ণ হয়।

তথ্যসূত্র : স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গীর আলম

নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় : বেগম রোকেয়ার জন্মের ৭ বছর আগে ১৮৭৩ সালে নবাব ফয়জুন্নেছা কুমিল্লা শহরের বাদুরতলায় এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বিদ্যালয়টির জন্য ৫ একর জমিদান করেন। বিদ্যালয়টি সরকারি করা হয় ১৯২৭ সালে। কুমিল্লা শহরে ছেলেদের জন্য যেমন সেরা স্কুল 'কুমিল্লা জিলা স্কুল' তেমনি মেয়েদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এ স্কুলের বহু ছাত্রী পিএসসি ও জেএসসি

পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে থাকে এবং এসএসসিতে শত শত শিক্ষার্থী A+ পায়। এটি উপমহাদেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের প্রাচীনতম স্কুলগুলোর অন্যতম। রোখসানা ফেরদৌস মজুমদার বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা।

ভিক্টোরিয়া স্কুল : ১৮৮৬ সালে লাকসামের গোবিন্দপুরের জমিদার রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন স্কুলটির প্রথম প্রধান শিক্ষক। এ স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ই ড. দীনেশ চন্দ্র সেন গ্রাম বাংলার বিলুপ্ত প্রায় পুঁথিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

কালীর বাজার ইউ.পি.উচ্চ বিদ্যালয় : এটি লালমাই পাহাড়ের পাদদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এলাকার বিদ্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ সালে এটি স্থাপিত হয়। প্রয়াত বাবু ফণীভূষণ মজুমদার ছিলেন স্কুলের নামকরা ইংরেজি শিক্ষক এবং চিন্তক। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবু ভুবন মোহন পালের সময়টি স্কুলের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে শামীমা সুলতানা, মনিরুল হক, নারায়ণ চন্দ্র দাস, খোরশেদ সেলিম ইত্যাদি শিক্ষকের পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় বিদ্যালয়টি এগিয়ে চলছে। দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লিভার বিশেষজ্ঞ ডা. মবিন খান এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

ঈশ্বর পাঠশালা : দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পিতার নামে ১৯১৪ সালে এ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি শহরের লাকসাম রোডে ৫.৮৪ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। মূলত শিক্ষার্থীদের সমুদয় প্রয়োজন পূরণের কথা মাথায় রেখে এটিকে কমপ্লেক্সরূপে স্থাপন করা হয়, যেখানে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও বইয়ে সমৃদ্ধ রামমালা পাঠাগার, নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস, রামমালা ছাত্রাবাস, প্রার্থনালয়, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি। পাঠশালার প্রাঙ্গনে নিয়মিত আড্ডা দিতেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় : জেলার বরুড়া উপজেলার মহেশপুর গ্রামে ১৯৭২ সালে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টির বর্তমান ভূমি ২ একর। জনাব আব্দুল আজিজ সর্দার বিদ্যালয়টির ভূমিদান করেন বলে তার নামেই স্কুলটির নাম রাখা হয়। প্রতিষ্ঠার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুলটি ধ্বংস হয়ে গেলে দুই দশক পর পুনপ্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকের সমন্বিত প্রচেষ্টায় অল্পদিনেই বিদ্যালয়টি উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্তির দিক থেকেই প্রাতিষ্ঠানটি বেশি সুনাম কুড়িয়েছে। মাধ্যমিকেও পাশের হার প্রায় শতভাগ। এই বিদ্যালয়টি এসএসসি পরীক্ষারও কেন্দ্র। বিদ্যালয়ে একটি দ্বিতল ভবন, একটি একতলা ভবন, একটি টিনশেড ভবন, একটি গণপাঠাগার ও ১টি ছাত্রাবাস আছে। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জায়গা করে নিচ্ছে।

তথ্যসূত্র : জনাব জহিরুল হক, মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিপুলাসার আহমদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৯) ভবনটির স্থপতি বিশ্ববিখ্যাত লুই আই কান। এটি মনোহরগঞ্জ উপজেলার শ্রেষ্ঠ

বিদ্যাপীঠ। গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চবিদ্যালয় (দাউদকান্দি), বাঙ্গরা উমালোচন উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৭, মুরাদনগর) এ বিশ শতকের প্রথম দশকে এক বছর শিক্ষকতা করেন বিখ্যাত রাজনীতিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। হোমনার রামকৃষ্ণপুরে বাবু যোগেন্দ্র লাল রায় ও জনাব মতিউল্লাহ ভূইয়ার উদ্যোগ ও উদারতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণপুর কেং কে আর কে উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৮), আওয়ার লেডি অব ফাতিমা গালর্স হাই স্কুল কুমিল্লা শহরে খ্রিষ্টানদের পরিচালিত একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। কোটবাড়িতে আছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, যা দেশের ৪টি ল্যাবরেটরি স্কুলের একটি। শহরের নানুয়ার দীঘির পাড়ে আছে পশ্চিমগাঁয়ের জমিদার নওয়াব আলী খান বাহাদুরের পিতৃনামে ঐতিহ্যবাহী ইউসুফ হাইস্কুল (১৮৭৯) যে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী। বরুড়া হাজী নোয়াব আলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৭) উপজেলার মধ্যে নাম করা। এই স্কুলে দীর্ঘ জীবন পাঠদান করে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন বিখ্যাত শিক্ষক সৈয়দ আহমদ বিএসসি। দাউদকান্দির জগৎপুর হাই স্কুল (১৯৫০) এ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন কবি আল মাহমুদ।

এছাড়া কুমিল্লা সরকারি হাইস্কুল (১৮১৯), দেবীদ্বার রেয়াজুদ্দিন হাইস্কুল (১৯১৮), বারপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, (১৯১৯; দাউদকান্দি), রামচন্দ্রপুর হাইস্কুল (১৯১৮; মুরাদনগর) রামমোহন তমিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৬; বরুড়া), নবাব ফয়জুন্নেছা ও বদরুন্নেছা যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১; লাকসাম), তলাগ্রাম তারিণীচরণ লাহা উ/বি (১৯৩১; বরুড়া), চান্দিনা পাইলট হাইস্কুল (১৯১৬), বড়ধুশিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (ব্রাহ্মণপাড়া), রায়পুর কে.সি. হাই স্কুল (১৯১২; দাউদকান্দি), লাকসাম পাইলট স্কুল (পূর্বতন অতুল হাইস্কুল), চৌদ্দগ্রাম এইচ.জে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২১), ময়নামতি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৩), চান্দলা কে.বি হাইস্কুল (১৯২০; ব্রাহ্মণপাড়া), ইলিয়টগঞ্জ হাই স্কুল (১৯০৮; দাউদকান্দি), হরিশচর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় (লাকসাম) ইত্যাদি কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক পর্যায়

মহেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : যে বছর শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, সেই ১৯১৯ সালে মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বরুড়া উপজেলার সবচেয়ে বড় গ্রাম মহেশপুরে ৩৯.৫০ শতাংশ ভূমিতে তা অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এবং ১১ জন শিক্ষক আছে। বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শওকত আলীর সুদীর্ঘ শিক্ষকজীবনসাধনায় ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। সে ধারাবাহিকতা এখনো আছে। এই স্কুলে জনাব শওকত আলীর হাতে একটি মেধাবী ও আলোকিত প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা এই স্কুলে অর্জিত বিদ্যাকে পুঁজি করে সুউচ্চ কর্মক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। বর্তমানে ৩টি একতলা ভবনে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের প্রক্রিয়া চলেছে। স্কুলের পাশের হার শতভাগ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী টেলেন্টপুল ও সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পাচ্ছে।

এছাড়া কুমিল্লা শহরের গাংচরের হারুন সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, শহরের ধর্মসাগর পাড়ের গুল বাগিচা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নশরতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (লাকসাম), কুমিল্লা মডার্ন স্কুল (নজরুল এভিনিউ), পৌর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বরুড়া পৌরসভা), বিশ্বাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৬; চান্দিনা), রামমোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৬; বরুড়া) যা স্বপ্নবান শিক্ষক সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে উত্তরোত্তর ভাল করে চলেছে। নালঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (চৌদ্দগ্রাম) ইত্যাদি জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

মাদ্রাসা : কুমিল্লা জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত মাদ্রাসাটির নাম ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা। এটি দেবীদ্বার উপজেলার ধামতী ইউনিয়নে অবস্থিত। একাডেমিক কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ও মেধাতালিকায় শীর্ষে স্থান লাভের জন্য এটি দেশব্যাপী পরিচিতি অর্জন করেছে। এ ছাড়া আছে শহরের চকবাজারের কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসা, গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা (লাকসাম), কুমিল্লা শহরের লাকসাম রোডস্থ কাশেমুল উলুম মাদ্রাসা (১৯৪২), রাজামারা সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা (বরুড়া), কালাকচুয়া মাদ্রাসা (বুড়িচং) ইত্যাদি বেশ ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত মাদ্রাসা।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

কুমিল্লা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্যের কেন্দ্র। এখানের সভ্যতা বেশ পুরনো। তার প্রমাণ এখানের বৌদ্ধ বিহারগুলো। পুরনো সভ্যতা ও স্থাপত্যকীর্তির বেশ কয়েকটি আজ বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এসব স্থান ও স্থাপত্যিক নিদর্শনগুলো ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ। এগুলো হলো, দেবীদ্বার উপজেলার গুনাইঘর (প্রাচীন 'গুণিকাগ্রহার') এর 'আশ্রম বিহার ও 'রাজ বিহার' যা মহারাজা শ্রীবৈন্যগুপ্তের সময়ে নির্মিত হয়েছিল, চান্দিনার পূর্বদিকের বড়কামতা ঢিবি, বরুড়া উপজেলার মন্দুক গ্রামের বড় জলাশয় পাড়ের উঁচু মন্দুক ঢিবি, মুরাদনগরের পাহাড়পুর ঢিবি, কুমিল্লা চট্টগ্রাম সড়কের পাশের নোয়াপাড়া বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ, পাঁচথুবী ঢিবি ইত্যাদি। এছাড়া এখন সুস্পষ্টভাবে বর্তমান আছে খনন করে বের করা ময়নামতি সভ্যতার নিদর্শন। আছে প্রাচীন হিন্দু নৃপতি নির্মিত মনোহর মন্দির ও মঠ কিংবা বৌদ্ধ মন্দির ও গীর্জা। এখানে আছে বহিরাগত মুসলিম পীর ফকিরদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মসজিদ। তাছাড়া আছে পুরনো জমিদার বা রাজবাড়ি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সদরের নবাববাড়ি ও ধর্মসাগর পাড়ের রাণীর কুঠির ইত্যাদি। আর আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কমনওয়েলথ সমাধিসৌধ ও বাঙ্কার। আছে রেল-জংশন ও অন্যান্য পুরাকীর্তি। কুমিল্লায় বিদ্যমান এসব ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণগুলোর কথা এখানে বলা হলো।

ময়নামতি সভ্যতা কেন্দ্রিক স্থাপনা

শালবন বিহার : কোটবাড়ি সংলগ্ন লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। দেববংশের শ্রী ভবদের আনুমানিক ৭ শতকের শেষাংশে এটি নির্মাণ করেন। বর্গাকৃতির বিহারটির আয়তন ১৬৭বর্গমিটার এবং মোট কক্ষ ১১৫টি। এই বিহারে রাজা ও সন্ন্যাসীদের জন্য পৃথক রন্ধন ব্যবস্থাপনা ছিল। এতে একটি কেন্দ্রীয় কুশাকৃতির মন্দির আছে। মন্দিরের ৩ দিকে আছে ৩টি করে ৯টি গোলাকৃতির পিলার।

আনন্দ বিহার : শালবন বিহার থেকে দুই মাইল উত্তরে এবং কুটিলা মুড়া থেকে এক মাইল দক্ষিণে এর অবস্থান। এটি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহার। প্রায় বর্গাকৃতি এ বিহারের প্রতি বস্তুর দৈর্ঘ্য ৬২৪ ফুট। প্রথম দেববংশের তৃতীয় শাসক শ্রী আনন্দদেব ৭-৮ শতকের প্রথম দিকে এটি নির্মাণ করেন। এর খোলা আঙিনার মাঝে একটি মন্দির রয়েছে। প্রধান মন্দিরকে কেন্দ্র করে দূর্গাকারে এটি নির্মিত হয়েছে। এখানে উৎখননে প্রবেশপথের ৬টি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহারটি বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষণাধীন।

কুটিলা মুড়া : এটি সেনানিবাসের ভেতরে অবস্থিত। ৭-১৩ শতকে নির্মিত ১২টি স্তূপ এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর প্রথম সারিতে রয়েছে প্রধান ৩টি স্তূপ যা 'ত্রিরত্ন স্তূপ' (৭ম শতক) নামে পরিচিত। এগুলি বৌদ্ধ ত্রিরত্ন বুদ্ধ (জ্ঞানী), ধর্ম (ন্যায়) ও সংঘের (শৃঙ্খলা) প্রতীক। তাই বাংলাদেশের বৌদ্ধ স্থাপত্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ইটাখোলা মুড়া : কোটবাড়ি কালীরবাজার সড়কের দক্ষিণ পাশে রূপবান মুড়া এবং উত্তর পাশে ইটাখোলা মুড়া অবস্থিত। খননের ফলে এখানে পূর্বমুখী একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ভূমি নকশা উন্মোচিত হয়েছে। এর মাঝখানে একটি বুদ্ধ মূর্তি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। কিন্তু মূর্তিটির উর্ধ্বাংশ নেই। মূর্তি প্রকোষ্ঠের জন্যই অনেকে একে মন্দির বিবেচনা করেছেন। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে ১৮ তোলা স্বর্ণ, একটি রৌপ্য মুদ্রা ও ১টি তাম্রশাসন উল্লেখযোগ্য। আর প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির আবক্ষ অংশটি লোহার ঢাকনি (ফাঁক ও শলাযুক্ত) দিয়ে তালাবদ্ধ রয়েছে। এর ভিতরে অনেকে টাকা পয়সা ফেলে যায়।

রূপবান মুড়া : বিজিবি ব্যাটালিয়ান অফিস সংলগ্ন একটি উঁচু টিলার ওপর এটি অবস্থিত। এর প্রাচীনতম স্তর ৬-৭ শতকে এবং সর্বশেষ স্তর ১০-১১ শতকে নির্মিত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এখানে ১টি ক্রুশাকৃতির মন্দির, অষ্টকোণাকার স্তূপ এবং বর্গাকার ১টি স্থাপত্যকাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে। এর 'রূপবান মুড়া' নামকরণটি সার্থক ও শৈল্পিক হয়েছে। সবকটি মুড়া ও বিহার থেকে এটি সবচেয়ে সুন্দর, শৈল্পিক ও রূপবান যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মন্দিরও মঠ কেন্দ্রিক স্থাপনা

চণ্ডীমুড়া মন্দির : সদর দক্ষিণ উপজেলার বড় ধর্মপুর মৌজায় এবং লালমাই পাহাড়ের সর্বশীর্ষ চূড়ায় এর অবস্থান। লালমাই বাজার এবং কুমিল্লা রেডিও স্টেশনের এক কিলোমিটার পশ্চিমে এক মনোহর পাহাড়ী প্রাকৃতিক পরিবেশে এটি অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থানরত ইটের তৈরি দুটি মন্দির। একটি শ্রী শ্রী চণ্ডীমন্দির ও অপরটি শিবমন্দির। প্রত্যেকটির আয়তন ১২ ফুট এবং উচ্চতা ১৫ ফুট। চণ্ডীমুড়া মন্দির বাংলাদেশে অবস্থিত একরত্ন মন্দিরের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য। এর চূড়া অনেকটা শিখরের মতো ছাদের কার্নিশ বাংলা বা চালা ঘরের ছাঁদের মতো বাঁকানো। ঠিক এই স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে নির্মিত বাংলাদেশের একমাত্র মন্দির এটি। এই মন্দির ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বলে পণ্ডিতদের ধারণা। চণ্ডীমন্দিরে অষ্টভূজা সর্বাণি মহাসরস্বতীর মূর্তি রয়েছে।

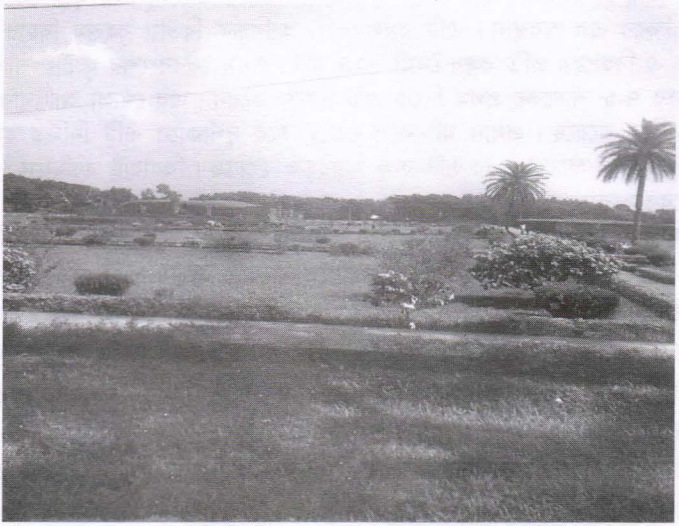

প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা (আনন্দ বিহার)

ময়নামতি যাদুঘর, কোটবাড়ি, কুমিল্লা

সতের রত্ন জগন্নাথ মন্দির : শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এ মন্দির অবস্থিত। এর চূড়াটি ছিল সুউচ্চ। মোট চূড়া বা রত্ন ছিল ১৭টি। এই মন্দিরে অষ্টকোণাকৃতির একটি কেন্দ্রীয় কক্ষ আছে। এই কেন্দ্রীয় কক্ষের ওপরই ছিল এর সুউচ্চ চূড়া বা রত্ন। ত্রিপুরার অধিপতি দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৬৮৫-১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে এ মন্দিরের নির্মাণ শুরু করেন। পরে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬১ সালে নির্মাণ কাজ শেষ করেন। কুমিল্লার ইতিহাস ঐতিহ্যের গ্রন্থ 'রাজমালা'য় এ মন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে,

এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ।

জগন্নাথ বাড়ি মন্দির : জগন্নাথ বাড়ি মন্দিরটি লাইসাম হাই স্কুল সংলগ্ন জগন্নাথ দিঘির পূর্বপাড়ে অবস্থিত। প্রাচীনতা বিচারে এর বয়স এক শতাব্দীর বেশি। ১৯০৪ সালের ২৪ নভেম্বর শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সংস্কার ও পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয় ২০০৪ সালের ২২ জানুয়ারি। যশোদা চৌধুরাণী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংস্কার কাজের তত্ত্বাবধান করেন শ্রী স্বপন সাহা। একটি নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী হিসেবে মন্দিরটি সকলের নজর কাড়তে সক্ষম। সম্ভবত, এটিই কুমিল্লার সবচেয়ে সুদৃশ্য মন্দির। একটি প্রশস্ত ভিত্তি দালানকে আশ্রয় করে মন্দিরটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে শীর্ষ চূড়ায় মিলিত হয়েছে। সাতটি পর্যায় বা স্তরে মন্দিরটি সরু হয়েছে। প্রতি স্তরের চারপাশেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রীছাউনির মতো খোপ বিশিষ্ট বাড়তি অংশ রাখা হয়েছে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য। সর্বনিম্ন স্তরের চারপাশে আছে দেব-দেবীর পেইন্টিংস। অন্যান্য স্থাপনা নিয়ে মন্দিরটি একটি সমন্বিত কমপ্লেক্স।

হাটির পাড় মঠ : মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের হাটিরপাড় গ্রামের 'মঠবাড়ি'তে অবস্থিত। অত্যন্ত প্রাচীন এই সুউচ্চ মঠটি চার জোড়া পিলার বা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মঠটির উপরে ৮টি দরজার খোপের মতো জায়গায় দেব-দেবী ও লতাপাতার নকশা আছে। তার উপরের অংশ একটি গম্বুজে এসে মিলিত হয়েছে। মঠটির একেবারে শীর্ষে একটি স্বর্ণকলস বসানো ছিল বলে শোনা যায়। ধারণা করা যায় কোন ঐশ্বর্যবান জমিদার বেশ ঘটা করেই একদিন এ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। মঠটির বর্তমান রূপ ও বাস্তবতা অনুধাবন করে ধারণা করা যায় মঠটি ৫-৬শ বছরের পুরাতন। তবু কালের নিরব সাক্ষী হয়ে ভগ্নদশায় মঠটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

জমিদার বাড়ি কেন্দ্রিক স্থাপনা

লাকসামের নবাববাড়ি : লাকসাম সদরের পশ্চিমগাঁয়ে 'নবাব ফয়জুন্নেছা হাউজ' অবস্থিত সর্বসাধারণের কাছে যা 'নবাববাড়ি' হিসেবে পরিচিত। ১৮৬০-১৮৭২ এর মধ্যে এ বাড়ি নির্মিত হয়। 'নবাব ফয়জুন্নেছা হাউজ'টি রাজকীয় স্থাপত্যশৈলীর একটি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ি। বাড়ির সামনে সীমানাপ্রাচীরসহ রাজকীয় তোরণও রয়েছে। বাড়ির আঙিনার পশ্চিম পার্শ্বে একটি বড় ভবন বর্তমানে পরিত্যক্ত ও জীর্ণ দশায় রয়েছে যা নাকি ছিল তখনকার 'অতিথিশালা'। এর পেছনের আঙিনায়ও অপর একটি ভবন রয়েছে। তবে 'নবাব ফয়জুন্নেছা হাউজ'ই এখানকার প্রধান বাড়ি। বাড়িটিকে দেখতে প্রায়শই এখানে পর্যটক ও গবেষকদের আগমন ঘটে। বর্তমানে বাড়িটিতে নবাব ফয়জুন্নেছার পঞ্চম প্রজন্ম কামরুল হক সপরিবারে বসবাস করছেন।

বর্ণিত বাড়িটিতে ফয়জুন্নেছা জন্মগ্রহণ করেননি। ১৮৬০ সালে অনুষ্ঠিত উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাব ফয়জুন্নেছার বিয়ের কাবিনের 'এক লক্ষ এক টাকায়' এই বাড়ি নির্মিত হয়েছিল। দু:খজনক হলেও সত্যি, ফয়জুন্নেছা বাপের যে ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন, ভেতর বাড়ির সেই জায়গাটিতে বর্তমানে কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। এই নবাব বাড়িটিকে শীঘ্রই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় এনে সংরক্ষণ করা দরকার।

মৈশান বাড়ি : এই জমিদার বাড়িটি কুমিল্লার নান্দনিক স্থাপনাগুলোর অন্যতম। বিশাল পরিসরের সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়িটির অবস্থান লাকসাম পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে (শেখ শাদী ক্যাডেট স্কুল এন্ড মাদ্রাসা সংলগ্ন)। এই বাড়ির সর্বশেষ জমিদার বাসিন্দা ছিলেন অতুল কৃষ্ণ রায় (পিতা অমর কৃষ্ণ রায়)। মুক্তিযুদ্ধের আগে জমিদার পরিবার বাড়িটি বিক্রি করে দিলে 'মৈশান'গণ এ বাড়ি কিনে। সেই থেকেই বাড়িটি মৈশান বাড়ি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সামনের আঙিনা ছাড়া বাড়িটির অন্দরমহলে রয়েছে পুকুর, বাগান, ছায়া ঘেরা গাছ গাছালি।

মসজিদ কেন্দ্রিক স্থাপনা

শাহসুজা মসজিদ : পুরাতন গোমতী নদীর তীরে শহরের মোগলটুলিতে এ ঐতিহাসিক মসজিদটি অবস্থিত। এতে মোগল স্থাপত্য শিল্পের অপরূপ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন কুমিল্লার জনৈক মোগল ফৌজদার মোগল ঘাঁটির অধিবাসীদের জন্য এ মসজিদ নির্মাণ করেন এবং শাহ সুজার নামে নামাঙ্কিত করেন। মূল মসজিদের নির্মাণ সংক্রান্ত কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। কিংবদন্তি রয়েছে, বাংলার সুবেদার শাহসুজা তাঁর ত্রিপুরা বিজয়কে স্মরণীয় করতে এই মসজিদ বানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই নামে চাঁদপুর জেলায় ও একটি মসজিদ আছে।

মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট ও প্রস্থে ২৮ ফুট এবং প্রাচীরগুলোর পুরুত্ব ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। এর চার কোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ আছে। মসজিদের কেবলা প্রাচীরে ৩টি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ফুল ও লতাপাতার নকশায় শোভিত। অষ্টকোণাকৃতি ড্রামের ওপর নির্মিত ৩টি গোলাকার গম্বুজ দ্বারা ঢাকা হয়েছে মসজিদের ছাদ। গম্বুজগুলোর শীর্ষদেশ কলসছড়া দ্বারা সুশোভিত। বিভিন্ন সময়ে মসজিদটির সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে। ১৮৮২ সালে ২৪ ফুট প্রস্থ্যের সমতল ছাদ বিশিষ্ট বারান্দাটি নির্মাণ করেন হাজী ইমামউদ্দীন।

বড় শরীফপুর মসজিদ : মনোহরগঞ্জ উপজেলার বাইগাঁও ইউনিয়নের বড় শরীফপুর গ্রামে নাটেশ্বর দিঘির উত্তর পূর্ব পাড়ে এ পুরাতন মসজিদটি অবস্থিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৬-১৭০৭ সালে এ মসজিদ নির্মিত হয়। এ এলাকার কোতোয়াল মুহম্মদ হায়াত আবদ করিম তা নির্মাণ করেন বলে একে কোতোয়াল মসজিদও বলা হয়। ১৯৫৯ সালে মসজিদটিকে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কিছুটা সংস্কার করা হয়। আয়তাকার মসজিদটি দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট এবং প্রস্থ্য ২২ ২/১ ফুট। এতে রয়েছে ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ এবং ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বড় চারকোণায় রয়েছে ৪টি অষ্টভুজাকার বুরুজ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ দুটি বর্তমানে বন্ধ। মসজিদটি একটি নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

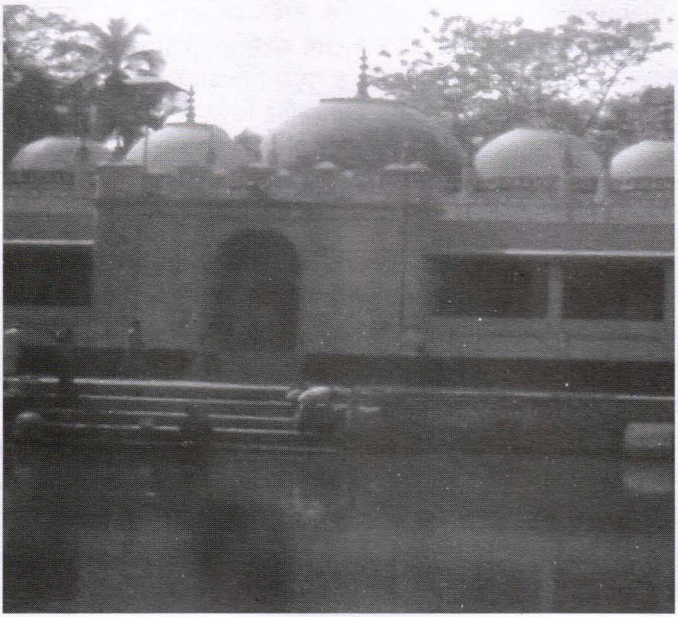

পাঁচ গম্বুজ মসজিদ, পশ্চিমগাঁও, লাকসাম

জগন্নাথবাড়ি মন্দির, লাকসাম

লৎসর শাহী মসজিদ : লৎসর মিয়া বাড়ি শাহী মসজিদটি প্রায় আড়াইশ বছরের পুরনো। ১৭৭০ সালে তৎকালীন জমিদার শেখ জয়নুদ্দিন মিয়া প্রাচ্যের কারুকার্য খচিত এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট। টালি ও ইট দিয়ে ৩০ ইঞ্চি দেয়ালের এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটির ভিতরের অংশে ফুল ও লতাপাতার নকশা আছে। মিয়া পরিবার ঐশ্বর্য হারানোর ফলে তাদের পক্ষে মসজিদটির সংস্কার করা সম্ভব হয় নি, তাই মসজিদটির অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে রয়েছে। এখনই প্রয়োজনীয় সংস্কার করা গেলে ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যকীর্তিটি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

আদিনা মুড়া মাজার মসজিদ : এর অবস্থান লালমাই পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ের চূড়ায়। মসজিদ ও মাজর চত্বরটি ৬৪ শতক জায়গায় অবস্থিত। মূলত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানের জন্যই এ মাজার ও মসজিদটিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তি শোনা যায়। মাজারের খাদেম শাহসুফি মনিরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৭৫০ বছর পূর্বে এ মাজারের পত্তন হয়। হযরত শাহ জালালের সাথী হযরত শাহ কামাল ইয়ামেনি (রা:) এখানে ঘুমিয়ে আছেন। লোকজনের বিশ্বাস এখানে এসে সাধনা করতে পারলে আদিনা থেকে মদিনা দেখা যায়। এখানের মসজিদটি ১০৯৩ হিজরিতে নির্মিত। মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট, উচ্চতা ১৮ ফুট। দেয়ালের ঘনত্ব ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রতি শুক্রবারে এই মসজিদে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোক নামাজ পড়তে আসে। শিশুরাও দল বেঁধে ছড়া কাটতে কাটতে আসে বিশেষ খাবারের লোভে,

আয়রে তোরা কে কে যাবি আদিনা মুড়াতে
আদিনা মুড়ায় সিন্নি খাওয়ায় কলা পাতাতে।

নবীসুর মসজিদ : মনোহরগঞ্জ উপজেলার দিশাবন্দ গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি দুই পাশে দুটি জোড় পুকুরের মাঝখানের পাড়ের উঁচু টিলায় অবস্থিত যা সমতল ভূমি থেকে ১০ ফুট উঁচুতে। নবীসুর নামে এক ব্যক্তির নামে এর নামকরণ হয়েছিল। মূল এক গম্বুজ মসজিদটির ভেতরে ১০-১২ জন নামাজ পড়তে পারে। ভেতরে ফুল, ফল ও অন্যান্য নকশা ঝুলন্ত অবস্থায় বলে মসজিদটি ঘিরে রহস্যের বার্তা পাওয়া যায়।

চিতড্ডা মসজিদ : বরুড়া উপজেলার চিতড্ডা ইউনিয়নের চিতজ্ঞা গ্রামে অবস্থিত। এটি বরুড়ার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ। মোহাম্মদ জামান চৌধুরী ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির আয়তন ৩৭-৬″x১৮-৯″। মসজিদটির দেয়ালের পুরত্ব ৩-৯″। মসজিদটি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে।

ভারেল্লা মসজিদ : ময়নামতি সেনানিবাস থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত বর্গাকার মসজিদ যা ১২২৯ হিজরিতে স্থাপিত হয়। প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২২-৪″ এবং দেয়াল ৩-৮″ পুরু।

নবাব বাড়ি মসজিদ ও নবাব ফয়জুন্নেছার কবর : ১৯০৩ সালে নবাব ফয়জুন্নেছার মৃত্যুর বছর, এ মসজিদ নির্মিত হয়। ফয়জুন্নেছাই এর নির্মাণ শুরু করেছিলেন। লাকসামের পশ্চিমগাঁয়ে নবাববাড়ির পশ্চিম পাশেই এর অবস্থান। মসজিদটির বর্তমান নাম 'নবাব ফয়জুন্নেছা জামে মসজিদ'। এর গম্বুজ ১০টি এবং চারদিকে ৪৪টি ছোট

মিনার রয়েছে। এর আয়তন ৪৮´-২৪´ এবং দেয়ালের পুরুত্ব ৩´-৪´´। মসজিদের দক্ষিণ পাশেই রয়েছে নবাব ফয়জুন্নেছার কবর।

অর্জুনতলা মসজিদ : বরুড়া পৌরসভা থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে অর্জুনতলা গ্রামে ১২০৯ হিজরিতে দেওয়ান মোহাম্মদ ছামি মিয়া কর্তৃক নির্মিত হয়। এর আয়তন ৮০ x৪০´´ এবং গম্বুজ ৩টি। এর দেয়ালের ঘনত্ব ৪-৬´´।

যুদ্ধ কেন্দ্রিক স্থাপনা ও অন্যান্য

ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি : একে কমনওয়েলথ সমাধিক্ষেত্রও বলা হয়। কুমিল্লা সেনানিবাসের পাশে টিপরা বাজার ও ময়নামতি সাহেবের বাজারের মাঝামাঝি কুমিল্লা সিলেট সড়কের বামপাশে সাড়ে চার একর পাহাড়ি ভূমিতে এ সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত। স্থানীয়রা একে বলে 'ইংরেজ কবরস্থান'। বাংলাদেশের দুটি ওয়ার সিমেট্রির একটি কুমিল্লায় অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ৭শ ৩৭জন সৈনিকের সমাধি স্থান এটি। তবে এর মধ্যে ২৪ জন জাপানি যুদ্ধবন্দী এবং একজন বেসামরিক নাগরিকও রয়েছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, সৈয়দপুর ইত্যাদি এলাকায় ও হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করা সৈনিকদের এখানে এনে সমাহিত করা হয়। আর্মি গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা রকম ফুল গাছে সুশোভিত এ ক্ষেত্র নির্মাণ করেন।

কুমিল্লা কমনওয়েলথ সমাধির পাহাড়ের প্রথম ধাপে ইউরোপীয়দের এবং উপরের ধাপে আছে উপমহাদেশের যোদ্ধাদের কবর। সমাধিগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো। প্রত্যেক সারিতে আছে সৈনিকদের নাম, বয়স, পদবী, নিহত হওয়ার তারিখ এবং ঠিকানা। সমাধিক্ষেত্রে একটি শ্বেত পাথরের ক্রুশ রয়েছে। বর্গাকার ক্ষেত্রটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ ফুট। ১৯৬২ সালে ১টি সমাধি এখান থেকে তার স্বজনরা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। সৈনিকদের সিংহভাগই (৩৫০ জন) বৃটেনের। এছাড়া আছে ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি দেশের সৈন্য। 'কমনওয়েলথ গ্রেভস কমিশন' কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সমাধিক্ষেত্র দুটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রতিদিন অনেক মানুষ এ ঐতিহাসিক স্থাপনাটি দেখতে হাজির হয়।

বাঙ্কার : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত ও যুদ্ধে ব্যবহৃত বাঙ্কারগুলো আরেক ঐতিহাসিক স্থাপনা। অত্যন্ত মজবুত এই বাঙ্কারগুলো অবিকল অবস্থায় রয়েছে কুমিল্লার লাকসামে। লাকসাম রেলজংশন এলাকা, লাকসাম পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের রেল লাইন সংলগ্ন এলাকায় কিছু বাঙ্কার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এছাড়া কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ১৯৩১ সালে বিপ্লবীদের হাতে নিহত ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের সমাধি রয়েছে। একইসাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জেলা প্রশাসক সামসুল হক খানের সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে।

লাকসাম রেল-জংশন : লাকসাম রেল-জংশন বাংলাদেশের বড় জংশনগুলির একটি। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি উপমহাদেশে প্রথম রেললাইন চালু করেন। এর কাছাকাছি সময়ে লাকসামের দৌলতগঞ্জের উত্তরাংশের উঁচু ভূমিতে রেলওয়ে জংশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন 'কত লাকসাম কত বাতি' বলে একটি কথা ছড়িয়ে পড়ে। বড়তুপা মৌজার প্রায় ৩০০ একর সম্পত্তির ওপর এ জংশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ লাকসাম জংশনকে

কেন্দ্র করে 'লাকসাম-চাঁদপুর, 'লাকসাম-নোয়াখালী' এবং 'ঢাকা-চট্টগ্রাম (ভায়া লাকসাম) রেলওয়ে নির্মাণ করে। নোয়াখালীর রেললাইন লাকসাম বাইপাস উত্তর বাজারের মাঝখান দিয়ে আর চট্টগ্রাম লাইন বাইপাসের পূর্ব দিয়ে এবং চাঁদপুর রেললাইন উত্তর বাজারের পশ্চিম দিয়ে গেছে।

এছাড়া কুমিল্লার অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে রয়েছে বরইগাঁও বৌদ্ধ বিহার (লাকসাম), দারোগা বাড়ি মসজিদ (১২১১ হি.; কুমিল্লা), ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত কাজীর মসজিদ (পশ্চিমগাঁও, লাকসাম), বক্স আলী চৌধুরী মাজার মসজিদ (ঝলম, বরুড়া), কুমিল্লার নবাববাড়ি (নবাববাড়ি চৌমুহনী, কুমিল্লা), মুক্তকেশী কালীবাড়ি মন্দির (লাকসাম), ১৬১১ সালে নির্মিত আলীশ্বর শান্তি নিকেতন (বৌদ্ধমন্দির), ৭ গম্বুজ বিশিষ্ট খোশববাস মসজিদ (১২৬৯ বঙ্গাব্দ, বরুড়া), নবাব ফয়জুন্নেছা স্থাপিত (১৮৮০) পাঁচগম্বুজ বিশিষ্ট আরফান্নেছা মসজিদ (পশ্চিমগাঁও, লাকসাম), চান্দলা শিবমন্দির (ব্রাহ্মণপাড়া), গোবিন্দপুরের জমিদারবাড়ি (লাকসাম), রেললাইনের জোড়া মঠ (বরুড়া), ১২১২ হিজরির জংলী বিবির মসজিদ (ছোটরা, কুমিল্লা), কাবিলা মসজিদ (১২০৬ হি., বুড়িচং), আওয়ার লেডি অব ফাতিমা ক্যাথলিক গীর্জা (কুমিল্লা শহর), ওড্ডা ফতেখাঁ মসজিদ (বরুড়া), কেশব রায় চৌধুরি প্রতিষ্ঠিত মহেশপুর সর্বজনীন রাধা-কৃষ্ণ মন্দির (মহেশপুর, বরুড়া) তিরিশ আউলিয়ার মাজার (এলাহাবাদ), দয়াপুর মসজিদ (সদর দক্ষিণ) বিজয়পুর শিব কালীবাড়ি মন্দির (১১৪১ বঙ্গাব্দ, সদর দক্ষিণ), গাইনের ডহরা মসজিদ (লাকসাম) ইত্যাদি।

জ. গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও স্থানের পরিচয়

বরুড়া : ৩২৫ শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ-রাজড়া ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবদানে বরুড়ার যে সংগ্রামী ইতিহাস ও অবকাঠামোর ক্রমোন্নতির স্মারক রচিত হয়েছে, তা বিভিন্ন পুস্তকে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায়। বরুড়া অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ-রাজন্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সমাজকর্মীদের আগমনে এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে আজ বরুড়া উপজেলা আদর্শ উপজেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ পর্বে বরুড়া : রাজবংশীয় শাসন-শোষণ, ঔপনিবেশিক নিগ্রহ ও অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রাম পেরিয়ে বরুড়া জনপদ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্বে প্রবেশ করে। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য বরুড়ার শত শত যুবক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করে সে গেজেটে বরুড়া উপজেলার ২১৬ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম স্থান পায়। তাই একথা নির্বিবাদে বলা যায় যে, মহান মুক্তিযুদ্ধে বরুড়ার ভূমিকা গৌরবজনক। মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার জনাব নূরুল ইসলাম মিলন, বেলায়েত হোসেন, সহকারী মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার জনাব ফিরোজ আহমদের একনিষ্ঠ নেতৃত্বে বরুড়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাণপণ চেষ্টা করে এ অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বরের ৪ তারিখেই বরুড়া পাক শত্রু মুক্ত হয়।

বরুড়া উপজেলার অবস্থান, আয়তন ও সীমানা : দেব রাজাদের রাজধানী দেবপর্বত তথা বর্তমান লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে বরুড়া উপজেলায় অবস্থিত। এর আয়তন ৯৩ বর্গমাইল বা ২৪২ বর্গ কিলোমিটার (প্রায়)।

সীমানা ও ইউনিয়ন পরিচিতি : বরুড়া উপজেলার পূর্বে কুমিল্লা সদর উত্তর ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা ও লাকসামের একাংশ, উত্তরে বুড়িচং ও চান্দিনা উপজেলা, দক্ষিণে লাকসাম উপজেলা ও শাহরাস্তি উপজেলা (চাঁদপুর), পূর্বাংশে লালমাই পাহাড়ের অংশবিশেষ এবং পশ্চিমে চান্দিনা ও কচুয়া উপজেলা (চাঁদপুর) অবস্থিত।

শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যে বরুড়া : সপ্তম শতকের মানুষ মহাস্তবীর শীলভদ্র চান্দিনা-বরুড়া অঞ্চলের বড়কামতা (বর্তমান বরকান্তা) গ্রামে জন্মেছিলেন। মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত কবির জন্মস্থান বরুড়া। তাঁর নাম শেখ চান্দ বা শেখ চাঁদ। বরুড়ার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষের মতো। তার মাঝে পুরুষ ৫০.০৫% ও মহিলা ৪৯.৯৫%। মুসলিম জনগোষ্ঠী ৯১.৩৭%, হিন্দু ৮.৪৪%, বৌদ্ধ ০.১৪% ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী ০.০৫%। উল্লেখ্য যে, এই অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আওতায় খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী অন্তর্গত। বরুড়ার ঘোষ্পায় কিছু খ্রিষ্টান ও রিফিউজির অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া বরুড়ার বেশ কয়েকটি গ্রাম জুড়ে রয়েছে 'সন্দীপ' বা 'সুন্দুপী' নামক বিশেষ জনগোষ্ঠীর বসবাস।

ময়নামতি মিউজিয়াম : সদর দক্ষিণ উপজেলায় অবস্থিত মূলত ময়নামতি সভ্যতার প্রাপ্ত উপকরণ দিয়েই এ জাদুঘর সাজানো হয়েছে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড় এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিহার ও মুড়া থেকে প্রাপ্ত মূর্তি ও তৈজসপত্র নিয়ে জাদুঘর গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ রাজাদের জীবন যাপন প্রণালীর অনেক উপকরণই এ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এর কোন কোনটি সম্পূর্ণ নিখুত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং কোনটি ভঙ্গুর অবস্থায় বা অংশ বিশেষ হিসেবে উদ্ধার করে রাখা হয়েছে। এখানে রয়েছে লোহা ও ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি, নানা রকমের হাড়ি পাতিল ও অন্যান্য তৈজসপত্র। এছাড়া রয়েছে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এগুলোর কোনটি লোহার, কোনটি তামা-কাসার এবং অন্যগুলো পোড়া মাটির সামগ্রী। নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ছাড়াও রয়েছে নাগরিক শিল্পরুচির সামগ্রী ও সৌখিন দ্রব্য। পোড়ামাটির শিল্পকর্ম হিসেবে আছে সাপ ও বেজির লড়াই, পদ্মে মুখ দেওয়া রাজহাঁস ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রকম ফসিল ও শিলাখণ্ড এবং নানারকম প্রস্তরের হাতিয়ার। এখানে রয়েছে প্রাপ্ত শিলালিপি ও ঐ সময়ের বিভিন্ন স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা। এভাবে জাদুঘরটি সমতট সভ্যতার উপকরণগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করছে।

নাঙ্গলকোট উপজেলা : জনশ্রুতি অনুযায়ী নাঙ্গলকোট নামের উৎপত্তির পেছনে যে গল্প চালু আছে নাঙ্গলকে কেন্দ্র করে কোর্ট কাচারি পর্যন্ত আয়োজন হয়েছিল বলে এলাকাটির নাম নাঙ্গলকোট হয়। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে কেউ এর বাইরে কোন কারণ আছে কি না তা স্মরণ করতে পারেনি। তাই আমরা জনশ্রুতিকেই নাঙ্গলকোট নামের উৎপত্তি হিসাবে ধরে নিতে পারি।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্ভূক্ত নাঙ্গলকোট একটি নবীন উপজেলা। স্বাধীনতার প্রায় ১২ বছর পর চৌদ্দগ্রাম থানার ৬টি এবং লাকসাম থানার ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে নাঙ্গলকোট উপজেলা গঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। ২৪৭ বর্গকিলোমিটার আয়তনের উপজেলাটি জেলা সদর হতে ৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর জনসংখ্যা ২,৭৫,৯৮৫ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ১,৩৪,৮৭৪ জন এবং মহিলা ১,৩১,১১১ জন। শতকরা হিসাবে পুরুষ মোট জনসংখ্যার ৪৮-৮৭ ভাগ এবং মহিলা ৫১-১২ ভাগ। উপজেলাটির মানচিত্রে নির্দেশিত সীমা উত্তরে লাকসাম, দক্ষিণে সেনবাগ, পূর্বে চৌদ্দগ্রাম এবং পশ্চিমে মনোহরগঞ্জ।

শান্তির বাজার : পাশে একটি বাজার আছে যা গড়ে উঠেছিল ইলেকশনকে কেন্দ্র করে। প্রতি ইলেকশনেই এখানে ঝগড়া হতো তাই তারা মিমাংসা করার জন্য যে স্থানটি বেছে নিতো সেখানেও জমত বিরাট মেল দরবার। এভাবে স্থানটি শান্তির বাজার নামে আর যেখানে ইলেকশন হত, তা ইলেকশন বাজার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢালুয়া : এটা ছিল নাঙ্গলকোটের ঢালু অঞ্চল। এখানে বড় বড় নৌকা লঞ্চ ভিড়তো এক সময়। লোকজন বলত ঢালের শহর। তা থেকেই কালক্রমে তা ঢালুয়াতে পরিণত হয়।

মঘুয়া : ঢালুয়াতে যখন বড় বড় নৌকা ভিড়ত তখন মঘুয়াতে গড়ে উঠেছিল মগদের আবাস। এটা হয়তো নিতান্তই গল্প। কিন্তু এলাকার লোকজন মঘুয়া নামকরণের পেছনে মগদের ভূমিকাকেই প্রধান বলে মনে করে।

মৌকরা : এলাকাটি একটু উঁচু হওয়ায় এখানে প্রচুর সরিষা ফলত। সরিষার মৌ করা গন্ধে এলাকাটি থাকত মুখর। সে থেকেই এর নাম মৌকরা।

তথ্যসূত্র : তবারক উল্লাহ সিজিয়ারা

চিলপাড়া : এটা ডাকাতিয়া তীরবর্তী অঞ্চল। ডাকাতিয়ার ভাঙন এক সময় নাঙ্গলকোটকে চৌদ্দগ্রাম হতে আলাদা করে রেখেছিল। পূর্বে এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। চিলের আনাগোনা ছিল প্রচুর। তাই অঞ্চলটির নাম চিলপাড়া।

সাতবাড়িয়া : সাতটি বাড়ি নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম। অবশ্য বর্তমানে গ্রামটিতে সাতটি নয়, শত শত বাড়ি আছে।

পুঁটিজলা : চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোটের মাঝে ২/৩ কিলোমিটারের নিম্নাঞ্চল এটি। এখানকার গ্রামগুলো অনেকটা সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের মত। প্রচুর পুটি মাছ পাওয়া যেত এখানে। তাই এ এলাকার নাম হয়েছে পুঁটিজলা।

কিনার পাড় : নদীর কিনারা বা তীরে অবস্থিত বলে গ্রামের নাম কিনার পাড়। যতদূর জানা যায় ডাকাতিয়া এক সময় কিনারপাড় দিয়েই বয়ে যেত।

দুববার চর : প্রচুর দূর্বাঘাস পাওয়া যেত এখানে। এ স্থানটি ছিল এক সময় নদীর পলল দিয়ে গড়ে ওঠা চর। এখানে জনপদ গড়ে ওঠেনি। প্রচুর দূর্বা ঘাস পাওয়া যেতো বলেই এর নাম হয়েছিল দুববার চর।

চলন : নাঙ্গলকোট উপজেলার এ অঞ্চলটি গঠিত হয়েছিল চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম ও নাঙ্গলকোটের আদ্য অক্ষর চ, ল ও ন নিয়ে। সেই থেকে স্থানটির প্রাচীন নাম হারিয়ে চলন হয়ে যায়।

শাকতলী : এখানে এক সময় জনবসতি ছিল না। প্রচুর শাক পাওয়া যেত জমিগুলোতে। সেই থেকেই স্থানটির নাম শাকতলী।

তথ্যসূত্র : আনিসুর রহমান সিজিয়ারা, নাঙ্গলকোট

সদর উপজেলা : কুমিল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রাচীন জেলা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৯০ সালে। বৃটিশ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল কুমিল্লা। ১৯৮৪ সালে এক প্রশাসনিক আদেশে কুমিল্লার তিনটি মহকুমা চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে জেলা শহরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কুমিল্লা জেলার যে ১৬টি উপজেলা রয়েছে আদর্শ সদর এর দক্ষিণে সদর দক্ষিণ, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা আর পশ্চিমে বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলা। কুমিল্লার উপর দিয়ে উৎপন্ন বিবির বাজার স্থল বন্দরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ১৯টি ইউনিয়ন নিয়ে কুমিল্লা সদর উপজেলা মোট আয়তন ২৮.৯৬ বর্গকিলোমিটার। কুমিল্লা শহরের বর্তমান আয়তন ১১.৪৭ বর্গ কি.মি.। উপজেলাটি ২৩°০৩ ও ২৩.৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°১৮ ও ৯১°২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

মোট জনসংখ্যা ৫,১৬,৩১৯ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৮৩৮ জন। মোট গ্রাম ৪৫৮ মৌজা ৪৭৯। পুরুষ মোট জনসংখ্যার ৫২.৯৭ ভাগ ও নারী ৪৭.০৩ ভাগ সাত বৎসর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৪৪.৬০ ভাগ। কুমিল্লার লালমাই ও ময়নমাতি পাহাড়ের প্রাচীন সভ্যতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানকার নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যগুলো হল কুটিলা মুড়া, ইটা খোলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, আনন্দরাজার বাড়ি, ভোজ রাজার বাড়ি, সপ্তরত্ন মন্দির, শাহ সুজা মসজিদ, রাজেশ্বরী কালী বাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া সদর দক্ষিণ উপজেলা ও বুড়িচং উপজেলায় প্রচুর ঐতিহ্যগত উপাদান রয়েছে, লোক-সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার।

আদর্শ সদর উপজেলাটির অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান এখন সদর দক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত। কিছু আছে বরুড়া। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন হওয়ায় এখানকার নাগরিক জীবনে এসেছে বিশাল পরিবর্তন।

স্থান ও মহল্লা : কুমিল্লা অতি সুপ্রাচীন জনপদ। একসময় কমলাঙ্ক নগরের খুব নিকট দিয়েই প্রবাহিত হত গোমতীর স্রোত, সাগরও ছিল নিকটে। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মিলন মেলায় পূর্ণ এ জনপদের স্থান ও মহল্লার নামগুলো এ জনপদের শ্রেণি চরিত্র ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে অনেকটাই একাত্ম। আদর্শ সদর উপজেলার কিছু স্থান ও মহল্লার নামকরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমি ৫০ হতে ৬০ বৎসর বয়সী মুরুব্বীদের মতামত নিয়েছি। যারা এ মতামত দিয়েছেন তাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিলনা কিন্তু একটা বক্তব্য সমন্বয় করতে অসুবিধা হয়নি। বিশেষত নামগুলোর উৎপত্তি নিয়ে একটা পরিবেশগত বক্তব্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। প্রামাণিক কোন তথ্য এক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। যেহেতু বাংলা একাডেমি মাঠ সমীক্ষা থেকে টেক্সট নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলেছে সেহেতু আমি ঐ বিষয়কে মাথায় রেখেই নামকরণ সম্পর্কিত বিষয়টা তুলে ধরেছি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এ টেক্সটাই হবে আগামী দিনের গবেষকদের নমুনা অবলম্বন।

কান্দিপাড় >কান্দিরপাড় : শোনা যায় বহু পূর্বে কুমিল্লা শহরের উপর দিয়ে কান্দি বলে একটা নদী ছিল, সে নদীরই পাড় আজকের কান্দিরপাড়। এর নিকটবর্তী অঞ্চল টমসমব্রিজে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নৌকা ভিড়ত আর চর থেকে গড়ে উঠেছিল আজকের চর্থা।

রাজগঞ্জ : এটা ছিল আগরতলার মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজার, যেখানে লোকজ জনগোষ্ঠী তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করত। গঞ্জগুলো গড়ে উঠত নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা অনুকূল। বিশেষত নৌকা ও জাহাজ চলাচলের সুবিধা আছে সেখানেই আমাদের বড় বড় গঞ্জগুলো গড়ে উঠেছিল। রাজগঞ্জ হল তেমনই একটা গঞ্জ যা গড়ে তোলায় রাজ আনুকূল্য ছিল। সেই কারণেই এর নাম রাজগঞ্জ।

মোঘলটুলি : মোঘলরা যেখানে টুলি বা আস্তানা গড়ে তুলেছে তাই মোঘলটুলি। মোঘল সম্রাট এর সন্তান শাহ সুজা ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তাড়িত হয়ে কুমিল্লায় এসে আস্তানা গড়েন। তখন থেকেই স্থানটির নাম মোঘলটুলি হিসাবে খ্যাত। এখানে ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শাহ সুজা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এটি এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাপ্তানবাজার : একসময় গোমতি ছিল অনেক গভীর খরস্রোতা নদী। গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও গোমতীতে বড় বড় জাহাজ ভিড়ত। হাজারটনি নৌকা ভাসাত বিভিন্ন স্থান থেকে মালামাল নিয়ে। জাহাজের কাপ্তান ও খালাসীদের আনাগোনায় মুখর থাকত এ অঞ্চলটি। মূলত ঐ ক্যাপ্টেন বা কাপ্তান শব্দ থেকেই কাপ্তানবাজার নামের উৎপত্তি।

পুরাতন চৌধুরী পাড়া : কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত চৌধুরীদের আবাসভূমি ছিল এটি। পূর্বে এর নাম চৌধুরী পাড়াই ছিল। পরে বাগিচা গাঁয়ে আরেকটি চৌধুরীপাড়া গড়ে উঠলে এর নাম হয় পুরাতন চৌধুরী পাড়া।

গোয়ালপট্টি বাগিচা : এখানে ছিল প্রচুর পেয়ারার বাগান। কুমিল্লার স্থানীয় জনগোষ্ঠী এই কিছুদিন আগেও পেয়ারাকে গয়াম বলত। তাই লোকবিশ্বাস গয়াম শব্দটি থেকেই গয়াম বাগিচা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

পানপট্টি : শহরের মধ্যখানে থানাপুকুর পাড় রাস্তা ধরে হাঁটলে যে রাস্তাটা কাঠের গোলা হয়ে চকবাজারের দিকে চলে গেছে তা পানপট্টি। এখানকার পানের গদিগুলো দেখলে এখনো মনে হয় এক সময় গঞ্জের মানুষের ভিড় স্থানটাকে কোলাহল মুখর করে রাখত। পানের আড়ত বা পান বিক্রির প্রধান বাজার বলেই স্থানটির নাম পট্টি। বস্তুত এটা রাজগঞ্জ বাজারেরই অংশ বিশেষ।

গোয়ালপট্টি : গোয়ালপট্টি হল কুমিল্লা শহরের পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা বর্তমানে কাঠ খোদাই করার নকশার জন্য বিখ্যাত আর আছে কিছু স্বর্ণালংকারের দোকান। কিন্তু স্থান নাম বলছে এখানে ছিল গোয়ালাদের আদি ব্যবসা মিষ্টি দ্রব্য বানানো। গোয়াল পট্টির মাঠা (ঘোল) একসময় খুব বিখ্যাত ছিল। আর বিখ্যাত ছিল দধি, চিড়া, মাখন ও কলার জন্য। দুই/একটি দোকান এখানে এখনো টিকে আছে কিন্তু সেগুলোতে দই, চিড়া, মাঠা বা মাখন পাওয়া যায় না।

বরং গোয়ালপট্টি এখন বিখ্যাত প্রথমত কাঠের নকশা আর দ্বিতীয়ত জিলাপি ও গজার জন্য। যে কোন মিলাদের জন্য জিলাপি ও গজা লাগবে তো নিঃসন্দেহে চলে আসুন গোয়ালপট্টি।

জামতলা : গোয়ালপট্টি থেকে বিশগজ পূর্বদিকে আসলে যে গলিটি উত্তর দিকে ঢুকে ঋষিপট্টি চলে গেছে তার নাম জামতলা। এক সময় এখানে প্রচুর জামগাছ ছিল তাই এরূপ নামকরণ। এখানো জামগাছের সংখ্যা কম নয়। ২/৪টি বাড়িতে বেশ কিছু পুরনো জামগাছ এখনো চোখে পড়ে।

ছাতিপট্টি : ছাতিপট্টিতে এক সময় ছাতিই বিক্রি হত। এখনো কুমিল্লা শহরের বড় বড় ছাতির দোকানগুলো এখানেই অবস্থিত। অবশ্য দোকানগুলোতে ছাতির সাথে আরো রকমারী পণ্যও পাওয়া যায়। যেমন, মাছধরার বড়শি, মাছের খাবার, আতশ বাজি, মুসলিম বিয়ের সারঞ্জাম কিনতে হলে আপনাকে ছাতিপট্টি আসতেই হবে। আর যে জন্য আসতে হবে তা হল স্বর্ণালংকার। স্বর্ণ কেনাবেচার প্রধান বাজার এখন ছাতিপট্টি, বজ্রপুর। কুমিল্লার সব বড় স্বর্ণদোকান ছাতিপট্টিতেই অবস্থিত যেমন হাজী জানাব খান জুয়েলারি, লুতু ভূঞা জুয়েলার্স, ইসলামিয়া জুয়েলার্স, আজম খান জুয়েলার্স ইত্যাদি। ছাতিপট্টির পাশে অবস্থিত বর্তমান অজিতগুহ কলেজটি ছিল শহীদ বুদ্ধিজীবী অজিতগুহের বাস ভবন এবং এখানে প্রচুর সুপারী বাগান ছিল বলে এর নাম 'সুপারী বাগান' এখনো আছে।

ডিগাম্বরী তলা : গোয়ালপট্টির ঠিক বিপরীতে রয়েছে ডিগাম্বরী তলা। এর প্রকৃত নাম ডিগাম্বরী তলা ছিলনা, ছিল দিগাম্বরী তলা। অনেক আগে এখানে একজন দিগম্বর থাকত। একটা বড় বটগাছের তলেই ছিল এ দিগম্বরের আস্তানা। তাই তার নামানুসারে জায়গাটির নাম হয়ে যায় ডিগাম্বরী তলা।

গর্জনখোলা : গোমতীর গর্জন খুব কাছ থেকে শোনা যেত এখানে। খোলা শব্দটি খলার পরিবর্তিত রূপ। খলা অর্থ উঠান বা তল। পুরাতন গোমতীর তীর ঘেষে গড়ে ওঠা এ জনপদটি এক সময় মুদি মালের গুদাম হিসাবে বিখ্যাত ছিল। নিকটস্থ চকবাজারের সব মালামাল গোমতীর তীরে ভেড়া নৌকা থেকে খালাস হতো গর্জন খোলাতেই।

কাশারি পট্টি : চকবাজার হয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রার যে মোগলাই সড়কটি ৮০'র দশকে ও ঢাকা চট্টগ্রামের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম ছিল এর দক্ষিণ দিকে মৌলভীপাড়ায় আসার স্থানটির নাম কাশারিপট্টি। এক সময় এখানে কাশার জিনিসপত্র ভাঙ্গা-গড়া কেনাবেচা হত। এখন এ শিল্পের কোন অস্তিত্বই কুমিল্লায় নেই। অবশ্য কাশা ও পিতলের জিনিসপত্র যা বেচাকেনা হয় সব ছাতিপট্টিতে। এখানে ২/৩টি মার্কেট গড়ে উঠেছে যেখানে পূজায় ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রীসহ কাশা ও পিতলের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রি হয়।

মৌলভীপাড়া : মৌলভীপাড়া ছিল মৌলবিদের আবাস ভূমি। এখানে মৌলভী পুকুর নামে একটি বড় পুকুর রয়েছে। মৌলবি হয়তো আছে ২/৪ ঘর কিন্তু নামে। মৌলভীপাড়া এখন আর মৌলভী পাড়া নেই।

তেলিকোনা, সাহাপাড়া : এটা ছিল তেলিপালদের আবাস ভূমি। ৪/৫টি পরিবার মাত্র এখন এখানে অবশিষ্ট আছে। কিন্তু পাড়াটির কপাল থেকে তেলি নামের গন্ধটা এখনো মোছেনি। তেলিকোনার উত্তর পাশে যে স্থানটি এর নাম সাহাপাড়া। কুমিল্লার সব বড় বড় সাহা পরিবারগুলো এখনো সাহাপাড়াতেই বাস করে। সম্প্রতি রাণীর বাজারে পাশে একটি নতুন সাহাপাড়া গড়ে উঠেছে। কিছু অভিজাত সাহা ব্যবসায়ী ও

চাকরিজীবি গত ৪/৫ বছর যাবৎ পূজাপার্বনে বিশেষ ভূমিকা রেখে নতুন সাহাপাড়াটিকে জন সমক্ষে পরিচিত করাতে পেরেছেন।

মগবাড়ি : মগবাড়ি ছিল মগদের আবাসস্থল। এর অদূরেই রয়েছে ছোটরা কলোনি ও খ্রিষ্টান কবরস্থান। তবে মগবাড়িতে মগদের কোন প্রাচীন চিহ্ন বা অস্তিত্ব আর অবশেষ নেই।

নওয়াব বাড়ি : বাড়িটি নওয়াব আলী নওয়াব চৌধুরীর। বিরাট বাড়ি এখনো এর চারপাশে বিরাট দেয়াল ঘেরা নিরাপত্তা বলয় সবার দৃষ্টি কাড়ার মত। ঐ বাড়িটির পাশেই বর্তমানে ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে নওয়াব বাড়ি চৌমুহনী।

বালুতুপা : গোমতীর বালুস্তূপ পড়ে তৈরি হয়েছে বলে এর নাম বালুতুপা। এখান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে বর্তমান গোমতী।

বারপাড়া : বারপাড়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বারটি পাড়া থেকে। গ্রামটির নামকরণ হবার এটাই প্রধান কারণ।

ঠাকুরপাড়া : এখানে এক সময় এক ঠাকুর ছিল। এ ঠাকুরের জন্যই পাড়াটি বিখ্যাত ছিল বলে এর নাম ঠাকুরপাড়া। এখনো ঠাকুরপাড়ায় বেশ কটি স্থায়ী মন্দির আছে। ঠাকুরপাড়া কালিতলা, টমছম ব্রীজ যেতে সালাউদ্দিনের পশ্চিম পাশে পর পর ২টি মন্দির আছে এখনো। আর আছে একটি বৌদ্ধ মন্দির যার নাম কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহার। এটি স্থাপিত হয় ১৯৬১ সাল।

নন্দীবাজার : এখানে বসবাসকারী নন্দী সম্প্রদায়ের নামানুসারে বাজারটির নামকরণ হয় নন্দী বাজার। যদিও বর্তমানে নন্দী পরিবারের সংখ্যা নিতান্ত কম, মাত্র ৩০/৩৫ পরিবার।

কুমিল্লার অধিকাংশ স্থান নামের উৎপত্তি হয়েছে ব্যবসায়িক অবস্থান সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোন উপলক্ষকে ঘিরে। এখানে কিছু নাম দেয়া হল যা স্থানগত বৈশিষ্ট্যে অংশ হিসাবে বিবেচিত বলে আমার কাছে মনে হয়। যেমন ভাটপাড়া (ভাটদের আবাস ভুমি) কোচাইতলী (নিম্নাঞ্চল ও জলাভূমি হওয়াতে এখানে মানুষ কোচ দিয়ে মাছ ধরত। বর্তমান ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতলটি ২০/২৫ বছর পূর্বেও ছিল অসংখ্য ডোবা নালায় পূর্ণ। ১৩/১৪টি পুকুর ছিল এখানে, শাকতলা (পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণের নিম্নাঞ্চল, এখানে প্রচুর দেশজ শাক পাওয়া যেত। অঞ্চলটি এখনো প্লাবিত। নগরীর সম্প্রসারণের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই কুমিল্লার সব পানি জমা হয় এসব অঞ্চলে) তামাক্কা পাড়া (এখানে তামাক ব্যবসায়ীরা থাকে। অঞ্চলটি এখনো নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষের বসত), টিক্কারচরে (এখানে টিক্কা বানানো হত এবং এটি ছিল গোমতীর চর। বলা আবশ্যক এক সময় কুমিল্লায় ডাব্বা হুক্কার জন্যও বিখ্যাত ছিল)। অশোকতলা (এখানে প্রচুর অশোক গাছ ছিল বলে স্থানীয় বয়স্করা অভিমত দিয়েছেন) বাগিচাগাঁও (এটা ছিল বাগান বাড়ি, ত্রিশের দশকেও এখানে প্রচুর বাগান ছিল), ভূতের গলি (বাগিচাগাঁওয়ের একটা অংশ, যেখানে দিনের বেলাও মানুষ যেতে ভয় পেত।) বাদুরতলা (প্রচুর গাছ গাছালিতে পূর্ণ এ অঞ্চলটিতে এক সময় বাদুররা নিরাপদে বাস করত। বাদুরতলার গাছ পালা বিলুপ্ত হওয়ায় কলাবাদুরগুলো এখন ঠাঁই নিয়েছে সার্কিট হাউস, পার্ক ও মিশনারি স্কুলের গাছ গাছালিতে), মালিবাড়ি (মালিদের আবাসভূমি, এখনো এখানে মালিরাই আছে। এরা মূলত ফুলমালি)। দারোগা বাড়ি (বৃটিশ আমলে

এক জাদরেল দারোগা থাকতেন এখানে। তার দাপটে এলাকা কাঁপত। সেই থেকেই স্থানটির নাম দারোগা বাড়ি)। অমূল্য পুকুর পাড় (ডিগাম্বরী তলার খুব নিকটবর্তী অঞ্চল যেখানে জনৈক ভদ্রলোক থাকতেন যার নাম অমূল্য। পূর্বাঞ্চলের বড় পুকুরের মধ্যে এটি ছিল একটি। এখন তা ভরাট করে মসজিদ ও আধুনিক বাড়ি হয়েছে। বছর পাঁচেক আগেও এ পুকুরটি এখানে ছিল।) মুন্সেফবাড়ি (জনৈক মুন্সেফের নামানুসারে পাড়াটির নাম মুন্সেফবাড়ি।) তালপুকুর (এখনো আছে, এক সময় এর চারপাশে প্রচুর তালগাছ ছিল। এখন এসবের অস্তিত্বও নেই)। জোড় দিঘি (ঠাকুর পাড়ায় এ দু'টি দিঘি নব্বইয়ের দশকেও ছিল, পরে এগুলো ভরাট করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হয়)। ঝাউতলা (ঝাউ গাছ ঘিরে এর নাম ঝাউতলা, এখানেও ঝাউগাছের অস্তিত্ব নেই)। খ্রিষ্টানপাড়া (খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর আবাস ছিল এটি, বর্তমানে এর নাম খ্রিষ্টানপাড়া ও প্রফেসরপাড়া উভয় নামেই অভিহিত করা হয়।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ অঞ্চলটি কসবা থানার অন্তর্গত ছিলো এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তা বুড়িচং থানার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৮ সালে ব্রাহ্মণপাড়া ফাড়ি থানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে বুড়িচং হতে আলাদা হয়ে প্রশাসনিক থানায় রূপ লাভ করে। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা : ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ অঞ্চলটি ২নং সেক্টরের অধীন ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কসবা ব্রাহ্মণপাড়া সীমান্তের ঘুঘুর নদীর তীরে হোলাইমুড়ী নামক স্থানে পাক হানাদার বাহিনির সাথে ৪র্থ বেঙল রেজিমেন্টের অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাবের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনির সম্মুখ যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেন সহ ১৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। পাকবাহিনির সদস্যরা পরবর্তীতে চান্দলা ও ষাইটশালা গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করে শতাধিক গ্রামবাসীকে হত্যা করে গণকবর দেয়। মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনির নৃশংসতার স্মৃতিবাহী তিনটি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায় ।

১. উত্তর চান্দলা ভূঞা বাড়ি।
২. দক্ষিণ চান্দলা প্রবোধ কুমার দাসের বাড়ি।
৩. রেললাইন সংলগ্ন হরিমঙ্গল পুকুর পাড়ের গণকবর।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার কিছু তথ্য

সীমানা : উত্তরের কসবা ও মুরাদনগর উপজেলা। দক্ষিণে বুড়িচং উপজেলা। পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং কসবার একাংশ। পশ্চিমে দেবীদ্বার এবং মুরাদনগরের একাংশ।

আয়তন : উপজেলার মোট আয়তন ১২৮.৯০ বর্গকিলোমিটার বা ৪৯.৬১ বর্গমাইল উপজেলার শহর ২টি মৌজা নিয়ে গঠিত যার আয়তন ১.৯৭ বর্গকিলোমিটার।

জনসংখ্যা : মোট লোক সংখ্যা, ১,৬১,৯০৬ জন ; পুরুষ ৫১% ; মহিলা ৪৯% ; মুসলিম ৯৬.১৪% ; হিন্দু ৩.৩৬% ; খ্রিষ্টান ০.১২% ; বৌদ্ধ ০.১০% ; অনান্য ০.২৮% ; আদিবাসী পরিবার ৮টি।

শিক্ষার হার : শিক্ষার গড় হার ৩২.৬% ; পুরুষ ৪০.২৫% ; মহিলা ২৪.৯%।

প্রধান নদী : গোমতী, সালদা, ঘুংঘুর, তিতি নদী, বুড়ি নদীর একাংশ।

প্রধান বিল : মকিমপুরের গো-বাক বিল, ষাইটশালার বেড়ী বিল ও পেল্লার বিল ; জামতলীর বারুনী বিল।

মোট মৌজা : মোট মৌজার সংখ্যা ৫৩টি।

মোট গ্রাম : মোট গ্রাম সংখ্যা ৬৫টি।

মোট ইউনিয়ন : মোট ইউনিয়ন ৮টি, মাধবপুর, চান্দলা, শিলদাই, শশীদল, দুলালপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, সাহেবাবাদ, মালাপাড়া।

মুরাদনগর উপজেলা : ব্রিটিশ শাসনামলে মীর মুরাদ আলী নামক একজন জায়গীরদার উক্ত অঞ্চলের ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন জমিদার ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। তার প্রবল প্রতাপ ও প্রজা হিতৈষণার গুনে তিনি সেকালে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। এভাবেই তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম দাঁড়ায় মুরাদনগর। মুরাদনগর ১৮৫৮ খ্রিঃ থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (তখন এর নাম ছিল হার্লা) পরবর্তীতে ১৮৭৮ সালে পুনরায় নামকরণ করা হয় মুরাদনগর।

সীমানা : উত্তরে নবীনগর, দক্ষিণে চান্দিনা, পূর্বে দেবীদ্বার/ব্রাহ্মনপাড়া, পশ্চিমে হোমনা, তিতাস, বাঞ্ছারামপুর।

আয়তন : মুরাদনগর উপজেলার মোট আয়তন : ৩৪০.৯৩ বর্গ কিঃমি।

অন্যান্য তথ্য : মোট মৌজা ১৫৩টি, গ্রাম ৩০৮টি।

লোকসংখ্যা : ৪৬৮০৮০ জন ।

শিক্ষার হার : ৩৮.৪৩% (২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী)।

লাকসাম উপজেলা : লাকসাম কুমিল্লা জেলার একটি অন্যতম উপজেলা। এখানকার সভ্যতা বেশ পুরনো। সেই সূত্রে এখানে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সমবায়িক সংস্কৃতি চর্চার একটি উন্নত ধারা গড়ে উঠেছে। লাকসামের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক প্রান্তে রয়েছে উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাব ফয়জুন্নেসার রাজকীয় ইতিহাস। ফয়জুন্নেসার নবাববাড়ি ও জমিদারি শাসনের ইতিহাস ছাড়াও এখানে অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের শাসনের ইতিহাস জানা যায়। প্রাচীন রাজবাড়িগুলো আজো সেই ইতিহাস ঘোষণা করছে।

লাকসাম নামকরণের কিংবদন্তি : লাকসাম নামকরণের ইতিহাস অনুসন্ধানে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। একটি মতে ধারণা করা হয় যে, লাখ লাখ 'শামছ' এর আবাসস্থলে ছিল বলে এর নাম লাকসাম হয়েছে। 'শামছ' আরবি শব্দ এবং এর অর্থ সূর্য। 'সূর্য' বলতে তখন আউলিয়া দরবেশদের বোঝাত। উল্লেখ্য যে, সারা লাকসাম জুড়েই বিখ্যাত পীর ফকির ও অলি আল্লাহর মাজারের সংখ্যাধিক্য এখনও চোখে পড়ে। তাই বহু বিচার বিশ্লেষণ করে রেলওয়ে জংশন এলাকার নাম লাকসাম রাখা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলের অসংখ্য ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যই এমন নাম হয়েছে। অসংখ্য ধনী লোক বোঝাতে লাখ বা লাক কিংবা বেশি টাকা বা লাখ টাকার অধিকারী বোঝাতে লাক কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে। আর কুমিল্লার অঞ্চলকে সাম দিয়ে বোঝানো হয় সঙ্গী, জন, মানুষ। এই অর্থে লাকসাম যুক্তিযুক্ত।

সীমানা : লাকসাম উপজেলার উত্তরে সদর দক্ষিণ উপজেলা ও বরুড়া উপজেলা। দক্ষিণে মনোহরগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। আবার, পূর্বে চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলা এবং পশ্চিমে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলা অবস্থিত।

সংখ্যা তথ্য লাকসাম উপজেলা : লাকসাম উপজেলার আয়তন ১৫৬.৭৯ বর্গকিলোমিটার বা ৩৮,৭৪৫ একর।

জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য : লাকসাম উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৪০,১৫৩ জন (২০০১ এর আদমশুমারি)।

মনোহরগঞ্জ উপজেলা : কুমিল্লা জেলার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মনোহরগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। সড়ক পথে অথবা রেলপথে এ উপজেলায় পৌঁছানো যায়। কুমিল্লা শহর থেকে সড়ক পথে ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে লাকসাম উপজেলা এবং লাকসাম হতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মনোহরগঞ্জ উপজেলা সদর অবস্থিত।

উপজেলা গঠন : সরকারি এক প্রশাসনিক আদেশে ০৫/০২/২০০৫ তারিখে মনোহরগঞ্জ উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সীমানা : মনোহরগঞ্জ উপজেলার উত্তরে লাকসাম উপজেলা যা মনোহরগঞ্জের মৈশাতুয়া ইউনিয়নকে স্পর্শ করে আছে। মনোহরগঞ্জ উপজেলার পূর্বপ্রান্তের খিলা ইউনিয়নটির পরে অর্থাৎ পূর্বদিকে নাঙ্গলকোট উপজেলা (কুমিল্লা)। মনোহরগঞ্জের উত্তর পশ্চিম কোণে রয়েছে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা যা মনোহরগঞ্জের উত্তর ও দক্ষিণ ঝলম ইউনিয়ন এবং বাইশগাঁও ইউনিয়ন জুড়ে রয়েছে। মনোহরগঞ্জ উপজেলার পূর্ব দক্ষিণের নাথেরপেটুয়া ও বিপুলাসার ইউনিয়ন দুটি পড়েছে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার সাথে। আর মনোহরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা যা মনোহরগঞ্জের হাসনাবাদ, সরসপুর ইউনিয়নকে ছুঁয়েছে।

ইউনিয়ন পরিচিতি : লাকসাম উপজেলার দক্ষিণ ভাগের ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে ২০০৫ সালে মনোহরগঞ্জ উপজেলা গঠন করা হয়। ইউনিয়নগুলো হলো, ১. বাইশগাঁও, ২. সরসপুর, ৩. হাসনাবাদ, ৪. ঝলম উত্তর, ৫. ঝলম দক্ষিণ, ৬. মৈশাতুয়া, ৭. লক্ষ্মণপুর, ৮. খিলা, ৯. উত্তর হাওলা, ১০. নাথেরপেটুয়া ও ১১. বিপুলাসার।

উপজেলার আয়তন : ১৬৬ বর্গকিলোমিটার (প্রায়)। ইউনিয়ন– ১১টি, মৌজা- ১৪৫টি, গ্রাম-১৬৭টি।

মোট জনসংখ্যা : ২,৩৬,৫৫৫ (২০১১ এর খসড়া শুমারি অনুযায়ী)।

পুরুষ : ১,০৯,৬৪৯ জন, মহিলা : ১,২৬,৯০৬ জন।

ডাকাতিয়া নদী : ডাকাতিয়া নদী ভারতের রঘুনন্দন পাহাড় হতে উৎপত্তি হয়েছে। তারপর তা নিজগতিতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উত্তরাংশে মিয়া বাজার পার হয়ে সোনাইছড়ি দিয়ে লাকসামে প্রবেশ করেছে। লাকসাম হয়ে মনোহরগঞ্জ, অতঃপর শাহরাস্তি (চাঁদপুর) ও হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) হয়ে তা চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে মিশেছে।

ডাকাতিয়াকে বলা হতো লাকসামের দুঃখ। লাকসাম ভাগ হয়ে মনোহরগঞ্জ উপজেলা হওয়াতে এখন তা মনোহরগঞ্জের আধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে গেছে। এককালের ভরা যৌবন ডাকাতিয়ার উপচে পড়া স্রোতে দু'তীরে গড়ে উঠেছে

ব্যবসা কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনবসতি। কিন্তু দিন দিন পলি মাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ডাকাতিয়া। খরা মৌসুমে প্রায়ই পানিশূন্য থাকে ডাকাতিয়া। ডাকাতিয়া নদীর সংযোগ খালগুলো সম্পূর্ণ পানিশূন্য হয়ে যায়। ডাকাতিয়ার সংযোগ খালগুলো সরকারি ভাবে খনন জরুরী হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়ভাবে বাগমারা, হরিশ্চর, লাকসাম, ইছাপুরা, শ্রীয়াং. আমতলী, পোমগাঁও চিতোষী ইত্যাদি স্থানে নৌকা যাতায়াতে যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল নদী ভরাটের ফলে এখন তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। ডাকাতিয়া খনন ত্বরান্বিত করা গেলে শীত মৌসুমে হাজার হাজার একর জমিতে বিভিন্ন জাতের শীতকালীন ফসল উৎপাদন করা যেতো। তাছাড়া পরিকল্পিত মাছ চাষ করে পূর্বের মতো মাছের বিপুল সমারোহও ঘটানো যেত-যাতে স্থানীয় বা জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণ হতো। ডাকাতিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত বেরুলা, গাগৈর, কার্জন, নদনা, চাইলতাতলী ইত্যাদি খালগুলো খনন করা হলে বর্ষায় পানি ভরাট হয়ে থাকতে পারে এবং সময়মতো খালের মুখে বেড়িবাঁধ দিয়ে পানি আটকানো যেতে পারে।

ডাকাতিয়া নামকরণের কিংবদন্তি : ডাকাতিয়া নদীর নামের উৎপত্তি নিয়ে বহু কথা প্রচলিত আছে। বয়স্কদের কাছ থেকে জানা গেছে যে পুরনো দিনে কোন গ্রামীণ কুলবধূ বাপের বাড়ি হতে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছিল। তখন দস্যু হার্মাদ লাজুক গৃহবধুরও হাতের কাঁকন কেড়ে নিয়েছিল। সেজন্য এ জলপথের নাম হয়েছে ডাকাতিয়া।

অপর একটি কিংবদন্তি মতে জানা যায়, রূপসী কোন বধূর প্রেমিক তাকে ভিনগাঁয়ে কারো বউ হয়ে যেতে দেয় নি। নিজ দলবল নিয়ে সখীকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই এ নদীর নাম হয়েছে ডাকাতিয়া। কেউ কেউ বলছেন যে, পূর্বে এ জনপদের লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম । নদী পথে নৌডাকাতগণ সুদূর মেঘনা পাড়ি দিয়ে উজানে আসতো এবং তারা বাণিজ্যবাহী নৌকার পণ্য সামগ্রী ডাকাতি করে নিয়ে যেত। তাই এ নদীপথের নাম হয়ে গেছে ডাকাতিয়া।

হোমনা উপজেলা

সীমানা : উত্তরে বাঞ্ছারামপুর; দক্ষিণে দাউদকান্দি; পূর্বে মুরাদনগর; পশ্চিমে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁও (নারায়নগঞ্জ) উপজেলা।

আয়তন : হোমনা থানার মোট আয়তন ৩৫,২৮৪ একর।

অন্যান্য তথ্য : ইউনিয়ন পরিষদ মোট ১০টি; গ্রামসংখ্যা-১৫৮টি; পৌরসভা-১টি; ওয়ার্ড সংখ্যা-৯টি।

লোকসংখ্যা : ১৯,১৪৪,৪৯ জন (২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী)।

মোট পুরুষ-৯৮,০২৭ জন, মোট মহিলা-৯৩,৪২২ জন, মোট পরিবার-৩৪,১০১টি।

শিক্ষার হার -৩৩.১৮%।

পুরুষ(শিক্ষার হার) : ৩৮.২৪%।

মহিলা (শিক্ষার হার) : ২৭.৯৪%।

হোমনা থানাধীন ইউনিয়ন সমূহ : ১. আসাদপুর, ২. খারমোড়া, ৩. দুলালপুর, ৪. নিলখি, ৫. জয়পুর, ৬. ভাসানিয়া, ৭. চান্দেরচর, ৮. মাথাভাঙ্গা, ৯. ঘাঘুটিয়া, ১০. হোমনা সদর।

তিতাস উপজেলা : তিতাস উপজেলার নামকরণ নিয়ে যথারীতি নানা জনের নানা মত লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার একটি অংশের বিশ্বাস এ অঞ্চলটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, জলা-খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বিধায় এ অঞ্চলটির আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল সবসময় ঠাণ্ডা। মেঘনা নদীর জোয়ার এসে প্রতিদিন ধুয়ে দিয়ে যেত এ উপজেলাটির তীর। শাখা প্রশাখাগুলোর জলেও বারবার সিক্ত হতো এ অঞ্চলটি। সিক্ত নরম ভেজা মাটির এবং অপেক্ষাকৃত আদ্রতা মিশ্রিত বায়বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ অঞ্চলটির নাম হয় তিতাস। তিতা শব্দের আভিধানিক অর্থও সিক্ত, ঝেলা যা নামকরণ সম্পর্কিত উপযুক্ত যুক্তিকে সমর্থন করে। এ উপজেলার নামকরণ নিয়ে আরো একটি মতামত প্রচলিত হলো এই যে এ অঞ্চলে তিক্ত স্বাদ যুক্ত এক প্রকার শাক প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো এমনকি এখনো জন্মায় যার ফলে তিতাশাক নাম থেকে অল্প প্রয়াসে এবং গ্রাম্য রীতির উচ্চারণ জনিত কারণে এর নাম তিতাস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ উপজেলার নামকরণ সম্পর্কে আরো একটি শক্তিশালী মতামত লক্ষ করা যায় আর তা হলো, এ উপজেলার পাশ দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্যতম নদী তিতাস প্রবাহিত এবং তিতাস নদী থেকে অসংখ্য খাল এসে ঢুকেছে এর বুক চিরে।

প্রতিষ্ঠাকাল : তিতাস উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ৩০শে মার্চ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ। পূর্বে যা দাউদকান্দি উপজেলার অংশ ছিল।

ইউনিয়ন সংখ্যা : ইউনিয়ন পরিষদ মোট ৯টি ।

১. সাতানী, ২. জগতপুর, ৩. বলরামপুর, ৪. কড়িকান্দি, ৫. কলাকান্দি, ৬. ভিটিকান্দি, ৭. নারান্দিয়া, ৮. জিয়ারকান্দি, ৯. মজিদপুর।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা : কুমিল্লা জেলার দক্ষিণপূর্ব কোনে রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে উর্বর সমতল ভূমিতে চৌদ্দগ্রাম উপজেলার অবস্থান। ১৮৬১-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মি. স্মার্ট কর্তৃক যে রেভিনিউ সার্ভে হয় তাতে চাকলা রৌশনাবাদের যে ৫৩ পরগনার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে চৌদ্দগ্রাম পরগনার নাম পাওয়া। পরে ১৮৯০-৯২ খ্রিষ্টাব্দে মি. কামিং এর জরিপেও মধ্য বিভাগে এই পরগনার নাম উল্লেখ করা হয়। এ উপজেলার উত্তরে ও পূর্বে ভারত ও কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলা, দক্ষিণে ফেনী সদর ও দাগনভূঁইঞা উপজেলার উত্তরে ভারত ও পশ্চিমে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট ও লাকসাম উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। ২৩°০৩´ ও ২৩°২২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°১০´ ও ৯১°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলাটির বর্তমান আয়তন ২৭১.৭০ বর্গ কি. মি. ও মোট জনসংখ্যা ৩,৭৮,৯৪০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ৩২০৩ জন (প্রায়)। জেলা সদর থেকে চৌদ্দগ্রামের দূরত্ব ২৮ কি.মি.। ১৯০৫ সালে চৌদ্দগ্রাম থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। মোট গ্রাম ও মৌজার সংখ্যা যথাক্রমে ৪২৯ ও ৩৯৮।

নামকরণ : চৌদ্দগ্রাম জনগণের চৌদ্দটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলেই এর নাম চৌদ্দগ্রাম। এক সময় এ বাজারটি ছিল চৌদ্দগ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা বেচার একমাত্র স্থান। বর্তমানে অনেক নতুন বাজার গড়ে উঠেছে তবে চৌদ্দগ্রামের গুরুত্ব তাতে সামান্যও কমেনি।

চান্দিশকরা সেনবাড়ি : চৌদ্দগ্রামের ঐতিহাসিক প্রত্ন-স্থাপত্য সমূহের মধ্যে চান্দিশকরা সেনবাড়িই অন্যতম। চৌদ্দগ্রাম বাজারের পশ্চিম দিকে চান্দিশকরা গ্রামে অবস্থিত এই জমিদার বাড়ির নির্মাণ সন জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় এটি ১৮০০ শতকের শেষের দিকে নির্মিত হয়। সেন বাহাদুর নামে পরিচিত জমিদার উমাকান্ত সেনগুপ্ত (সেন বাহাদুর) এর বসত বাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বাড়ির সামনে প্রায় একই সময়ে তৈরি শ্রী শ্রী জয় কালী মন্দির নামে একটি মন্দির রয়েছে। বাড়ির সামনেই পুকুর পাড়ে চৌদ্দগ্রাম কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান অবস্থিত যেটি ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি বছর মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এখানে মেলা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মূল বাড়ি এবং কালী মন্দিরটি পুরোপুরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে।

পাইয়ারখোলা মঠ : উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে জগন্নাথ ইউনিয়নে অবস্থিত পাইয়ারখোলা গ্রামের এই জোড়া মঠদ্বয় এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের স্মারক। এই মঠকে কেন্দ্র করেই পার্শ্ববর্তী বাজারের নামকরণ করা হয় মঠেরতলা বাজার। মঠের পিছনে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট জমিদার বাড়ি রয়েছে। মূলত মঠদ্বয় সংলগ্ন জমিদার বাড়ির প্রবেশদ্বার। স্থানীয় লোকজনের মতে ভৈরব পাল নামে কোন এক রাজা এই মঠ এবং জমিদার বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বাড়িটিকে এলাকার লোকজন মুন্সী বাড়ি নামেই জানেন। এই বাড়ির উত্তরাধিকারীরা দেশ বিভাগের পূর্বে ভারতে চলে যান। এখন বাড়িতে কোন লোকজন থাকে না। স্থানীয়দের মতে এই স্থাপনাসমূহ ২০০ বছরেরও পুরানো বাড়িটি এখন স্থানীয় লোকজনের দখলে।

কিংকাসনাই ও বাওই গ্রাম বৌদ্ধ বিহার : উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে কাশিনগর ইউনিয়নের কিংকাসনাই গ্রামে অবস্থিত এই বৌদ্ধ মন্দিরটি ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু পূর্ণেন্দু মহাস্থবির এবং জ্যোতি পাল মহাস্থবির এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্তী বাওই গ্রামে অবস্থিত বাওই গ্রামে বৌদ্ধ মন্দির শতবর্ষ পুরানো। তবে মূল মন্দিরটি ১৯৭১ সালে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় পাশেই ২০০৪ সালে একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল মন্দিরটি এখন জীর্ণ অবস্থায় পুরানো কাঠামোতেই রয়েছে। বৌদ্ধ অধ্যুষিত কিংকাসনাই এবং বাওই গ্রামের লোকজনের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এই মন্দিরদ্বয়কে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়।

চৌদ্দগ্রাম : এক সময় চৌদ্দগ্রাম পরগনায় ছিল। কবে কখন চৌদ্দগ্রাম নামটির উৎপত্তি হয় এর সঠিক হিসাব জানা যায় না, তবে লোক মুখে প্রচলিত ধারণা হল চৌদ্দটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে এলাকাটির নাম চৌদ্দগ্রাম। বর্তমান চৌদ্দগ্রাম উক্ত চৌদ্দটি গ্রামের জিনিসপত্র বেচাকেনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

রাজার বাজার : রাজার হাটের বর্তমান নাম কনকাপৈত কিন্তু প্রাচীন এ জনপদটির পূর্বের নাম ছিল রাজার হাট। বয়োবৃদ্ধরা এখনো একে রাজার হাট বলেই চেনে। ত্রিপুরার মহারাজার খাজনা আদায়ের জন্য এখানে যে কাছারিটি ছিল তাকে কেন্দ্র করেই এ বাজার সৃষ্টি হয়। ঐ রাজ কাছারিটি এখানে আছে। আশির দশকের পর এ বাজারের নাম পাল্টে ইউনিয়নের নাম অনুসারে কনকাপৈত করা হয়।

তুলাদিঘি : কনকাপৈত বাজারের পাশেই আছে একটা বিরাট দিঘি। এর নাম তুলাদিঘি জানা যায় এক সময় এ দিঘির পাড়ে প্রচুর তুলাগাছ ছিল এবং এখানে ২/১টা তুলা গাছ সে ঐতিহ্য বহন করছে।

তথ্যসূত্র : মাষ্টার আব্দুল মান্নান, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কনকাপৈত উচ্চ বিদ্যালয়।

জগন্নাথ দিঘি : এ দিঘিটির নামকরণ করা হয় জগৎ প্রভু জগন্নাথ দেবের নামে। দিঘিটি এলাকার মানুষের পানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আগরতলার মহারাজ খনন করেন। সম্ভবত মহারাজ গোবিন্দ মানিক্য এ দিঘি খনন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বাংলোতে বসেই তার 'রাজর্ষি' নাটকটি লিখেন বলে এলাকায় একটি জনশ্রুতি আছে।

চান খাঁর দিঘি : এটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব চান খাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দিঘিটি খনন করেন স্থানীয় কোন জমিদার।

বরদৈল মুন্সিবাড়ি (একটি কিংবদন্তি) : জগন্নাথ দিঘি ইউনিয়নের বরদৈল মুন্সীবাড়ি একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবার। বৃটিশ আমলে এ বাড়িতে মোট ছয়জন আইসিএস ছিলেন। এক সময় ভারতীয় জাপানী রাষ্ট্রদূত এ বাড়ির সন্তান ছিলেন। কাজী জাফর যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ বাড়ির সন্তান। এ ছাড়া এ বাড়ির একজন জমিদারের নাম ছিল ভৈরব চন্দ্র। এখানে মিনাপাথর নামে যে মাঠটি আছে তা নিয়ে ভৈরব চন্দ্রের সঙ্গে আগরতলা মহারাজার সংঘাত ছিল। এ সংঘাত দূর করতে মহারাজ ভৈরবচন্দ্রকে আগারতলায় ডেকে পাঠান। লোকশ্রুতিতে আছে ভৈরবচন্দ্র আগরতলা মহারাজার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ও পৌঁছলেন সেখান থেকে ফেরার পথে ভৈরব চন্দ্র কুমিল্লা এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চৌদ্দগ্রাম পৌঁছে মারা যান। এখানে প্রবীণদের মুখে ভৈরবচন্দ্রের সম্পর্কে একটা কথা শোনা যায়, যার হয়তো কোন অর্থই নেই কিন্তু এক সময় এ কথাটি মানুষ সুযোগ পেলেই উচ্চারণ করত,

তাড়ে নাড়ে নাড়ে নাড়ে তাড়ে নাড়ে না
তাড়ে নাড়ে নাড়ে নাড়ে রে।
তাড়ে নাড়ে নাড়ে নাড়ে।
বালক দেওয়ান ভৈরব চানরে।

বলা আবশ্যক বালক দেওয়ান ভৈরব চাঁন যে হাতির পিঠে চড়ে আগরতলা যান সে হাতির পিঠেই তিনি মারা যান।

হদদিনের হদ : ফকরুদ্দিনের পথ বা রাস্তা শহর চাঁদপুর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন ফখরুদ্দিন শাহ যা বর্তমানে ঢাকা চট্টগ্রাম ট্র্যাঙ্ক রোডের সাথে একীভুত। এ রাস্তাটি এখনো চৌদ্দগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়-'হদদিনের হদ' নামে পরিচিত।

বুড়িচং উপজেলা : বুড়িচং শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বুড্ডি চিয়াং শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ আস্তানা। স্থানীয় ভাষায় টং শব্দটি মূলত চং শব্দেরই অপ্রভ্রংশ যা কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত উচ্চারণে আমাদের সামনে উপস্থিত। এ ব্যাপারে কথা বললাম বুড়িচং এরশাদ কলেজের অধ্যক্ষ ড. আলী হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে। আলী স্যার

জ্ঞানী মানুষ নজরুল গবেষক ও কবি এবং সাংবাদিক। তিনি বুড়িচং শব্দের যে ব্যাখ্যা দিলেন তা নিম্নরূপ :

বুড়ি শব্দটি সম্ভবত প্রাচীন জ্ঞানী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে করা হয়েছে আর চং মানে স্থান বা আবাস। উপজেলার আরো কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে বিচ্ছিন্নভাবে এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তারা কোন মন্তব্য করতে পারলেন না। তবে কেউ কেউ যে মন্তব্য করেছেন তা উপর্যুক্ত মন্তব্যের সাথে মিলে যায়।

বুড়িচং একটি সুপ্রাচীন জনপদ। এর মোট আয়তন একশ তেষট্টি দশমিক সাত ছয় (১৬৩.৭৬) বর্গকিলোমিটার। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী উপজেলার লোক সংখ্যা তিন লক্ষ এক হাজার আটশত পঁচিশ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ৫৪ঃ৪৬। এর সীমানা উত্তরে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে সদর উপজেলা পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য আর পশ্চিমে চান্দিনা ও দেবিদ্বার উপজেলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ উপজেলাটির অধিকাংশ অংশ কসবা থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সালে বুড়িচং প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে নতুন থানার মর্যাদা পায়। তখন পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণপাড়া থানার অংশ বিশেষ বুড়িচং থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৬ সালে বুড়িচং থানার পুলিশ ফাঁড়ি হিসাবে গণ্য ব্রাহ্মণপাড়া পৃথক থানার মর্যাদা পাওয়ায় থানার আয়তন বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

বুড়িচং উপজেলার সবচেয়ে উর্ধ্বাঞ্চল ময়নামতি। এখান থেকে দড়িয়ার পার হয়ে ষাইটশাইল পর্যন্ত যে নিচু ভূমি ও সমতল ভূমি পরিলক্ষিত হয় এক সময় তা কলিদহ সাগর হিসাবে পরিগণিত হত। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী সময়টা ছিল মোঘল বাদশা শাহ আলমের শাসনকাল। বৃটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। তখনই কলিদহ সাগরের পূর্বপাড় দিয়ে প্রথম জেলা পরিষদের রাস্তা নির্মাণ করা হয়। সিলেট হতে কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ করা হয় বুড়িচং এর সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য এখনো সেটা প্রধান সড়ক হিসাবে গণ্য হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ স্থাপিত হবার সুযোগে বুড়িচং আধুনিক যোগাযোগের সুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়। উপজেলার উপর দিয়ে স্থাপিত রেলপথের বর্তমান পরিধি ৭ কিলোমিটার আর রেল স্টেশন আছে একটি। আটটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত বুড়িচং উপজেলার গ্রামের সংখ্যা একশ ছিয়াত্তর (১৭৬), মৌজা একশ বায়ান্ন আর পরিবার ছেচল্লিশ হাজার প্রায়। জেলা সদর হতে পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত উপজেলাটির প্রায় নয় কিলোমিটার সীমান্ত, বেড়িবাঁধ এলাকা রয়েছে আঠার কিলোমিটারের কাছাকাছি। বৃটিশ আমলে উপজেলার নিম্নাঞ্চল বর্ষাকালে প্লাবিত হয়ে যেত বিধায় নৌকাই ছিল যাতায়াত মাধ্যম। শুষ্ক মৌসুমে সড়ক ও রেলযোগাযোগের আওতাধীন এলাকাগুলো ছিল পায়ে, ঘোড়ায় বা সাইকেলে চলার পথ। কলিদহ সাগরের পশ্চিম পাড় বলে খ্যাত ময়নামতি ছিল তখন এক উন্নত জনপদ। এখানে একটি বাজার আছে যা সাহেব বাজার নামে পরিচিত। এটা ছিল তখন মূলত জাহাজ ঘাট। বড় বড় জাহাজ আসত এখানে আর ছিল হাজারমণি পালতোলা জাহাজ। সমতট বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য এ সাহেব

বাজারেই সম্পন্ন হয়। এখনো সাহেবদের আনাগোনার কারণে স্থানটির নাম ফিরিঙ্গি বাজার হিসাবে পরিচিত। ফরিজপুর গ্রামটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। কালের আবর্তে কলিদহ সাগর ক্রমান্বয়ে ভরাট হয়ে নিচু স্থলভূমিতে কোথাও বা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়।

মেঘনা উপজেলা : প্রবল প্রেমও মেঘনা নদীর মেঘলা পরিহিতা মেঘনা উপজেলা। মেঘনা নদীর শাখা প্রশাখা আলিঙ্গন করে বুকে জড়িয়ে রেখেছে মেঘনাকে। মেঘনা নদীর নীল স্বচ্ছ সুপেয় জলধারা যেমন নির্মল তেমনি মেঘনার মানুষও বটে। স্বপ্নিল আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য এর নির্মল জনসাধারণ অক্লান্ত ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে মেঘনাকে। মেঘনা যেন তাদের মনের আয়না।

ভৌগলিক অবস্থান : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ৩০/৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বাংলার ইতিহাস খ্যাত বীর ঈশা খাঁর সোনারগাঁও এর ১ কিলোমিটার এর মধ্যে এ উপজেলা। ২৩°৩৪ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°৪১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৬৪ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত এ উপজেলা।

সীমা : উত্তরে নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা, পূর্বে কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলা, দক্ষিণে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা, পশ্চিমে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা এবং মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা।

আয়তন : ৯৮.৬৭ বর্গকিলোমিটার/৩৮.০৬ বর্গমাইল।

থানা : ১৯,১৭০টি।

জনসংখ্যা : পুরুষ ৪৭,৭১৬ জন এবং মহিলা ৪৯,২৫ জন সর্বমোট ৯৬,৯৭০ জন।

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৯৮৪ জন/বর্গ কিলোমিটার, ২৫৪৮ জন/বর্গমাইল।

মোট ইউনিয়ন সংখ্যা : ৮টি।

মৌজার সংখ্যা : ৪০টি ।

গ্রাম : ১০৪টি।

শিক্ষার হার : পুরুষ ৩৮.০৪%, মহিলা ২৯.৯২%, মোট ৩৩.৮৪%।

চান্দিনা উপজেলা

নাম : চান্দিনা

সীমানা : উত্তরে দেবীদ্বার, উত্তর পূর্বে বুড়িচং, পূর্বে আদর্শ সদর, দক্ষিণে বরুড়া, পশ্চিমে দাউদকান্দি, পশ্চিম-দক্ষিণে কচুয়া থানা।

আয়তন : ২০২ বর্গ কিলোমিটার।

মোট লোকসংখ্যা : ৩,৫১,৬৮৭ জন (২০১১ আদমশুমারি)

পুরুষ : ১,৬৭,২৮১, **নারী :** ১,৮৪,৪০৬ জন।

শিক্ষার হার : ৪৩.৯৭%

পুকুর-দিঘি : কাজী বাড়ির দিঘি বিখ্যাত (চান্দিনা থানার পেছনে পূর্ব পাশ)

মন্দির : ১৬টা, চান্দিনা রাজকালী মন্দির বিখ্যাত।

ঐতিহাসিক স্থাপনা :
মুক্তিযুদ্ধের স্মরণ স্তম্ভ, উপজেলা পরিষদের ভেতরে, ফাঐ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইউনিয়ন-মাইজকাইট, গণকরব : ১. কঙ্গাই, ২. কাশিমপুর।

দেবিদ্বার উপজেলা : কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলা ১৩টি ইউনিয়ন নিয়ে ১৯১৭ সালের ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা বছরের ৩ মাস পর ২১ সেপ্টেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবিদ্বার থানার কার্যক্রম চালু হয়। দেবিদ্বার উপজেলার অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২৩ অক্ষ ২৯ এবং ২৩ অক্ষ ৪২ এর মধ্যে ৯০ অক্ষ ৫৯ এবং ৯১ অক্ষ ০৫ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এ উপজেলার উত্তরে ব্রাহ্মণপাড়া ও মুরাদনগর উপজেলা, দক্ষিণাংশে চান্দিনা উপজেলা, পশ্চিমে মুরাদনগর উপজেলা, পূর্বে বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা।

নামকরণ : এ উপজেলার নামকরণ নিয়ে তিনটি ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ভাটটুরিয়ার দেবীকোটের রাজ পরিবারের ভ্রাতৃকলহে বানরাজা এ অঞ্চলে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। বানরাজা দেবীকোট থেকে আসায় দেবীকোটের নামানুসারে কালক্রমে দেবীকোট থেকে আজকের দেবিদ্বারের নামকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন কথাও রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটিশ শাসনামলে বৃটিশ ক্যাপ্টেন জন ডেভিড ত্রিপুরার চিতনা নামক স্থান থেকে একটি নৌবহর নিয়ে গোমতী নদী পথে ঢাকা যাওয়ার সময় বর্তমান দেবিদ্বারের ভিংলাবাড়ি নামক স্থানে বানরাজার সৈন্যদের সাথে ক্যাপ্টেন ডেভিড তার সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় এ যুদ্ধের নাম ডেভিড ওয়ার (ডেভিড যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে ওই নামানুসারে ডেভিড ওয়ার থেকে আজকের দেবিদ্বার নামে পরিচিতি লাভ করে। ৩য় মতাদর্শীদের মতে যতদূর জানা যায় এ উপজেলা সদরে বহু দেব দেবীর পূজা অর্চনা হতো। ফলশ্রুতিতে এ উপজেলার নামকরণ হয় দেবিদ্বার।

দেবিদ্বার ইতিহাস : এই এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দেবিদ্বার সভ্যতা বহুপ্রাচীন। এই এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন সভ্যতার বাহক হিসেবে দোদীপ্যমান। এছাড়াও এ এলাকায় কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বসবাস করে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেবিদ্বার অবদানও অনস্বীকার্য। দেবিদ্বার ওস্তাদ আফতাবউদ্দিন খান সরোদের মত দেখতে সুর সংগ্রহ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এছাড়াও তিনি মেঘডাবুর যন্ত্র নামে সুরযন্ত্রের স্রষ্টা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান চন্দ্র সারং এবং ওস্তাদ আয়েত আলি খান আধুনিক সরোদ উদ্ভাবন করেন। দেবিদ্বারের বাঁশের বাঁশি সমগ্র উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ।

ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ হিসেবে কুমিল্লার রাজনৈতিক ঐতিহ্যও দীর্ঘ দিনের। পূর্ববাংলার একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে এখানে একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বহমান ছিল। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রাণ পেয়েছে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রধান রাজনৈতিক দল ও অঙ্গসংগঠনের আওতায় এখানকার রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম ছিল। তাই সময়ের প্রয়োজনে এখানে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন দানা

বেঁধেছিল। আর এসব আন্দোলন সফল হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ ভূমিকায় এবং সংগ্রামী সচেতন ছাত্র ও জনসাধারণের অংশগ্রহণে। তাই কুমিল্লার 'রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি' পরিচয়কে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে এখানে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলো,

দল-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বর্ণনা

কংগ্রেস : ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের নীতি ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পারস্পরিক সমঝোতা ভিত্তিক সমাধান। কুমিল্লায় কংগ্রেসি কর্মকাণ্ড মূলত ১৯২১ থেকে সক্রিয় হয়ে ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে। এরই মাঝে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকলে কুমিল্লায়ও তার প্রভাব পড়ে। এ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্ত, বসন্ত কুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমপ্রভা মজুমদার, আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, আব্দুল জব্বার, তারু মিয়া প্রমুখ।

মুসলিম লীগ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরবর্তী রাজনীতির আলোকে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিমলীগ গঠন করেন। কুমিল্লা জেলার শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে জিন্নাহর নেতৃত্বে আস্থাবান হলেও এখানে ১৯৩৭ এর আগে মুসলিম লীগের তেমন প্রভাব দেখা যায় নি। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে জিন্নাহ কুমিল্লা টাউন হলে ভাষণ দেয়ার পরই কুমিল্লায় মুসলিম লীগ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৭-৪০ পর্বে মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে একেএম জহিরুল হক (লীল মিঞা) ও মফিজউদ্দিন আহমদ। কুমিল্লায় সীমিত সংখ্যক মুসলিম নেতা-কর্মী পাকিস্তান আন্দোলনে বিরোধীতা করলেও তা প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়। এসময়ে নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী ও আবিদুর রেজা চৌধুরী প্রসঙ্গ মুসলীম নেতৃবৃন্দের নাম জানা যায়।

মুসলিম লীগের ভাঙন ও আওয়ামী লীগের সৃষ্টি : ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের পতন শুরু হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বার্থ সৃষ্টি হলে ১৯৫১ সালে ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালে একেএম জহিরুল হকের (লীল মিঞা) সভাপতিত্বে কুমিল্লায়ও এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নুরুল আমিন সরকারের মন্ত্রিসভায় কুমিল্লা জেলার মফিজউদ্দীন আহমদ ও তোফাজ্জল আলী স্থান পান।

অভয়াশ্রমের রাজনৈতিক আবহ : জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ছাড়াও কিছু কিছু বিপ্লবী গোষ্ঠী বিশ শতকের গোড়ার দিকে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। কুমিল্লায়ও তার তৎপরতা দেখা যায়। ১৯২৩ সালে শহরের ঢুলিপাড়ায় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'অভয়াশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত তা ছিল বিপ্লবীদের প্রাণকেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধী ১৯২৫ ও ১৯২৭ সালে অভয়াশ্রমে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া পরিদর্শনে এসেছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আব্দুল গাফফার খান, সুভাষ বসু, শরৎ বসুসহ অনেকে। ব্রিটিশ সরকার ৩বার (১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২) এ আশ্রমকে বেআইনি ঘোষণা করে। অখিলচন্দ্র দত্ত, ইন্দুভূষণ দত্ত, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জী প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আন্দোলন ভিত্তিক ভাষ্য

কৃষক আন্দোলন : বিশ শতকের বিশের দশকে কৃষক রাজনীতির সূচনা হয়। কুমিল্লায় ও কৃষক আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে। তখন থেকেই আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, অছিমউদ্দিন আহমদ (বরুড়া), রমিজউদ্দীন আহমদ (দাউদকান্দি), আবদুল ওয়াহেদ, আব্দুল জলিল (মুরাদনগর), হাবীবুর রহমান চৌধুরী কৃষকের কল্যাণে নেতৃত্ব দেন। চৌদ্দগ্রাম, মনোহরগঞ্জ, মুরাদনগর ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষ আন্দোলন সংগঠিত হয়। চৌদ্দগ্রামের মাহিনী গ্রামে রায়কোটের আব্দুল হাকিম হাজারী এলাকাবাসীকে খাজনা দেয়া বন্ধ করতে বলেন। ১৯৩১ সালের এ ঘটনায় গুর্খা সৈন্যরা রাতে গ্রাম ঘেরাও করে গুলি চালালে ৪টি প্রাণ ঝরে যায়। ১৯৩২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন হাসনাবাদের (মনোহরগঞ্জ) কৃষক নেতা এবাদত উল্লাহ। এ আন্দোলনে আলী এবং ছনিমউদ্দিনসহ ৬ জন নিহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বরুড়ার পয়ালগাছা ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের হারুর মা স্বগ্রাম থেকে ঝাঁটা মিছিল এর নেতৃত্ব দিয়ে হাসনাবাদে এসে উপস্থিত হয়। শেরে বাংলার নিখিল প্রজা সম্মিলনির অধিবেশনে প্রজাদের স্বার্থে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আবেদন জানান আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী। ১৯৩৭ সালে সাম্প্রাদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয় তাতে জেলা কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে রমিজউদ্দীন আহমদ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কমরেড মুহম্মদ ইয়াকুব আলী ছিলেন একজন কৃষক নেতা যিনি এখানকারই মানুষ।

লবণ আইন আন্দোলন : ১৯৩০ এর ১২ মার্চ গান্ধীজী গুজরাটে এ আন্দোলন সূচনা করেন। কুমিল্লায়ও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এতে নেতৃত্বদানের জন্য গান্ধীজী নির্বাচিত ৬জন সত্যাগ্রহীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুমিল্লার কংগ্রেস কর্মী হাবীবুর রহমান চৌধুরী। ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে নোয়াখালীর সমুদ্রতীরে বহু কেন্দ্র খুলে লবণ আইন অমান্যর বাণী প্রচার করা হয়। একই বছর ৬ এপ্রিল কুমিল্লা শহর থেকে জেলার প্রথম সত্যাগ্রহী দল বসন্তকুমার মজুমদারের নেতৃত্বে নোয়াখালী যায় আন্দোলন সফল করতে।

আইন অমান্য আন্দোলন : ১৯৩২ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে কুমিল্লার নেতৃবৃন্দ সাড়া দেন। তখন জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী, সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক যথাক্রমে হেমপ্রভা মজুমদার, বসন্ত কুমার মজুমদার এবং হাবীবুর রহমান চৌধুরী একযোগে গেপ্তার হন ও ২ মাস করে জেল খাটেন। ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী বোর্ডের দালানে কংগ্রেসি পতাকা উত্তোলন করে এবং আইন অমান্য করে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন : ১৯৪২ এর ৮ই আগস্ট ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব করলে কুমিল্লার কয়েকজন মুসলিম কংগ্রেস নেতা এ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কারাবরণ করেন। আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী বন্দি হয়ে বকসা ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক থাকেন এবং হাবীবুর রহমান চৌধুরী ১৪ মাস কারাভোগ করেন। আগস্ট আন্দোলনের পর হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতিতে দাঙ্গা সংগঠিত হয়। তবে কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি।

ভাষা আন্দোলনে কুমিল্লা : ভাষা আন্দোলনে কুমিল্লার রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। মামুন সিদ্দিকী 'কুমিল্লায় ভাষা-আন্দোলন' নামে একটি পৃথক গ্রন্থই রচনা করেছেন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান বৃহত্তর কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ধীরেন্দ্রনাথের দাবি অগ্রাহ্য হলে পরদিনই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রতিবাদসভা হয়। কুমিল্লায় বামপন্থি রাজনৈতিক দল, ছাত্রলীগের প্রগতিশীল অংশ, তমুদ্দুন মজলিশ প্রভৃতি সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ২১শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং আওয়াজ ওঠে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমিনের কল্লা চাই"। হরতালের দিন নুনাবাদ কলোনির উর্দুভাষী মোহাজিরদের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্ররা আহত হয়। মজার ব্যাপার হলো পরবর্তীতে কুমিল্লার ভাষা আন্দোলনে মোহাজিরগণও যোগ দেয় যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঢাকায় বরকতদের প্রাণদানের পরদিনই জহিরুল হক লীল মিঞার সভাপতিত্বে টাউন হলে জনসভা হয়। এ ছাড়া এ আন্দোলনে অতীন্দ্রমোহন রায়, কামিনীকুমার দত্ত, চিত্ত বোস, অধ্যাপক অজিতগুহ, অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ, অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক লায়লা নুর প্রমুখের সংশ্লিষ্টতা আছে। আমাদের ভাষা আন্দোলন বর্তমানে আন্তর্জাতিক আসনে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, এর পেছনেও রয়েছে কুমিল্লার রফিকুল ইসলামের অসামান্য অবদান।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিবরণ

বসন্তকুমার মজুমদার (১৮৭৬-১৯৪৪) : চৌদ্দগ্রাম উপজেলার যাত্রাপুরে (কাশিনগর) জন্ম। তিনি কুমিল্লার রাজনৈতিক অঙ্গনে চার দশক সোচ্চার ছিলেন। স্কুল জীবনেই 'যুগান্তর' পার্টির সদস্য হন। বঙ্গভঙ্গের সময় বিদেশি বর্জন নীতিতে যুক্ত হয়ে ১৯০৭ সালে প্রথম গ্রেফতার হন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯১৫ সালে রাজবন্দি হিসেবে তাঁকে আটক করা হয় এবং ১৯২০ এ মুক্তি পেয়ে নোয়াখালীতে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গকারী দলে ভূমিকা রাখেন। মাহিনী (চৌদ্দগ্রাম) ও হাসনাবাদের (মনোহরগঞ্জ) কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন আজীবন কংগ্রেস সদস্য ও অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী।

কামিনীকুমার দত্ত (১৮৭৯-১৯৫৯) : জন্মগ্রাম শ্রীকাইল, মুরাদনগর। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই বামপন্থী রাজনীতিক অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনসহ অভয়াশ্রমকেন্দ্রিক রাজনীতিও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। বি.এল. পাস করে মুন্সেফ হন এবং স্বাধীন আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বিপ্লববাদে ব্রতী সংগঠনগুলোর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামী অনন্ত সিং ও অন্যান্যরা কিছুদিন তাঁর বাসায় আত্মগোপনে ছিলেন। তাদের মামলাও তিনি পরিচালনা করেন। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ও পরে পাকিস্তান আইনমন্ত্রীর পদে আসীন হন। তাঁর কুমিল্লা শহরের বাসভবনটি স্ত্রীর নামে 'মৃণালিনী দত্ত ছাত্রীনিবাস' করা হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) : বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রামরাইল গ্রামে জন্ম হলেও তাঁর জীবন, রাজনীতি ও মৃত্যু ছিল কুমিল্লা আবর্তিত। আইনজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে তিনি বিখ্যাত। রিপন কলেজ থেকে আইন শিক্ষা নিয়ে কুমিল্লায় ওকালতি শুরু করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির রাজনৈতিক আদর্শে তিনি ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন করে ১৯২১ সালে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনিই প্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী সমর্থক এ রাজনীতিবিদ ১৯৫৭-৫৮ পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ময়নামতি সেনানিবাসে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তাঁর স্মরণে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল'।

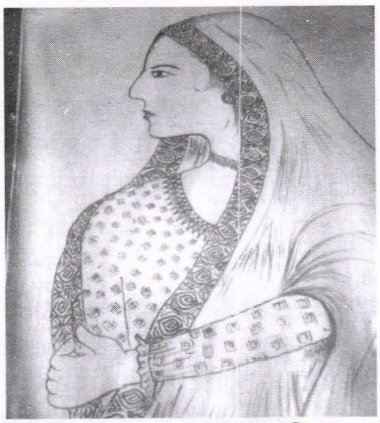

নবাব ফয়জুন্নেচ্ছা চৌধুরাণী

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

অজিত কুমার গুহ

হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮৮-১৯৬২) : বসন্তকুমার মজুমদারের স্ত্রী হেমপ্রভা কুমিল্লার রাজনীতি অঙ্গনে স্মরণীয় নাম। সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন এবং ১৯২২ সালে মহিলাকর্মী সংসদ গঠন করেন। ১৯৩২ সালে ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দু'মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। তাঁকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন,

কোন অতীতের আধাঁরে ভেরিয়া/ আসিলে আলোক জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত/ হেম প্রভু হল ধরণী।

আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬) : বর্তমান সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজীতে জন্ম। কুমিল্লার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। ১৯২৩ সালে কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় হন। রাজদ্রোহিতার জন্য ৫ বার কারাভোগ করেন। আগস্ট আন্দোলনে বকসা ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক থাকেন। ১৯৩৯- এ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তিনি সুভাস বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। ১৯৩৮-৪০ পর্বে তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা হিসেবে তার উপর হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আস্থা ছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য হন ও শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কমরেড ইয়াকুব আলী (বড় মিঞা) (১৮৯৪-১৯৬০) : তিনি বরুড়া উপজেলার গালিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। জীবনে বহুবার কারাবরণকারী এ নেতা ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

দেবেন ঘোষ : ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক দেবেন ঘোষের কন্যা স্কুলছাত্রী শান্তি এবং দিগম্বীতলার স্কুলছাত্রী সুনীতি বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দুজনে কুমিল্লা জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে তার অফিসে রিভলভার দিয়ে হত্যা করেন এবং আন্দামানে বন্দি হন। অখিলচন্দ্র দত্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার ডেপুটি স্পিকার (১৯৩৪-৩৬)। অনুশীলন দলের নেতা অতীন্দ্রমোহন রায়ের জীবনের ২৫ বছর কেটেছিল কারাগারে। এছাড়া কুমিল্লার রাজনীতিতে ছিলেন একেএম জহিরুল হক লীল মিঞা, মফিজউদ্দিন আহমদ, এম তোফাজ্জল আলী, অছিমউদ্দিন আহমদ, রমিজউদ্দিন আহমদ এবং জমিদার ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ এমদাদুল হক লাল মিঞা (ভাউকসার বরুড়া) প্রমুখ। বাংলাদেশ পর্বে নাম নিতে হয় খন্দকার মোশতাক আহমদের যিনি প্রবাসি বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকারের তিনি প্রভাবশালী মন্ত্রী হন। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর ১৫/০৮/৭৫-০৬/১১/৭৫ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তবে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকার জন্য এই নামটি আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে চলে গেছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের কাজী জাফর আহমেদ ১২/০৮/৮৯-০৬/১২/৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আদর্শবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে কমরেড মোজাফ্ফর আহমদের

('ন্যাপ-মোজাফ্ফর'-এর নেতা) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কুমিল্লার উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক হলেন আব্দুল মতিন খসরু (সাবেক আইনমন্ত্রী), অধ্যাপক আলী আশরাফ (সাবেক ডেপুটি স্পীকার), খন্দকার মোশাররফ হোসেন (সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী), ব্যারিস্টার শফিক আহমদ (বর্তমান আইনমন্ত্রী), মুজিবুল হক মুজিব (বর্তমান রেলমন্ত্রী), এম.কে আনোয়ার (সাবেক কৃষিমন্ত্রী), অধ্যাপিকা পান্না কায়সার (সাবেক সাংসদ) এবং আ.হ.ম মোস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামাল (সাংসদ এবং আইসিসি এর বর্তমান সহসভাপতি) ইত্যাদি।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : রাজনীতি ছাড়াও শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, সমবায়, উদ্যোগ, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গ তাদের কৃতকর্মের দ্বারা কুমিল্লাকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করেছেন। এদের কথা না বললে কুমিল্লার ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়।

শীলভদ্র : সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে ৭ম শতকে এই বৌদ্ধপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার নিকটবর্তী বড়কামতা গ্রামই তাঁর জন্মস্থান বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নালন্দা মহাবিহারের (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের (উপাচার্য) পদ লাভ করেন। তার রচিত একটি বই হলো 'আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান'।

শেখ চান্দ : মধ্যযুগের একজন অন্যতম কবি যিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রন্থ 'রসুলবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। তাঁর পিতা ছিলেন ফতে মুহম্মদ এবং পীর ছিলেন শাহ-দৌলা। তিনি বরুড়া উপজেলার শিলমুড়ী ইউনিয়নের হরুয়া গ্রামে শাহ-দৌলা পীরের বাড়িতে থাকতেন। বরুড়ার গালিমপুর ইউনিয়নের ভাউকসার গ্রামে রয়েছে কবির সমাধি। মোজাম্মেল হক এককভাবে কবি শেখ চান্দের কবিপ্রতিভা নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করেছেন। তাঁর অন্যান্য কাব্য 'হরগৌরীসম্বাদ' ও 'তালিবনামা'। 'রসুলবিজয়ে' কবি লিখেছেন,

মুরশিদের আড্ডা পাইয়া কহে হিন চান্দ
এগারশ বাইস সন রচিল প্রবন্ধ

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) : লাকসামের পশ্চিম গাঁয়ে জন্ম। ১৮৮৯ সালে 'নবাব' উপাধী লাভের মাধ্যমে উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাবে পরিণত হন। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনাশ্রিত গ্রন্থ 'রূপজালাল'। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরের বাদুরতলায় স্থাপন করেন বালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় দশ হাজার টাকা দেন, মক্কায় প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল ও মুসাফিরখানা। নবাববাড়ির সামনের দশগম্বুজ মসজিদ, শৈলরাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ দেশে-বিদেশে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ, পুকুর-দিঘি খনন এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করে এই মহীয়সী নারী অমর হয়ে আছেন।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৪-১৯৪৯) : মুরাদনগরের শ্রীকাইলে জন্ম। ছাত্র জীবনে 'পড়ো এবং কামাও' এ আদর্শের এক উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। কুমিল্লায় স্কুল-কলেজে পড়াকালে তরকারি বিক্রি করেছেন। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় খিদিরপুর

ডকইয়ার্ডে কুলির কাজ করেছেন। ডাক্তার হয়ে সেনাবাহিনিতে যোগ দেন। 'নবশক্তি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। ১৯৪১ সালে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজ গ্রামে শ্রীকাইল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বুদ্ধদেব বসু : ১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিরিশোত্তর পাঁচ আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। কবিতা ছাড়াও লিখেছেন উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প। অনুবাদেও দেখিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্ব। একাডেমিক ফল বিবেচনায় তিনি আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সেরা ছাত্র। রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তিনি 'প্রগতি' ও 'কবিতা' নামক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'কঙ্কাবতী' (কাব্য), 'নির্জন স্বাক্ষর' (উপন্যাস), 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী (নাটক), 'কালের পুতুল' (প্রবন্ধ), 'মেঘদূত' (অনুবাদ) ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ।

অজিতকুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯) : কুমিল্লায় জন্ম নেওয়া এই শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃতিচর্চার জন্য পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে দুইবার কারাবরণ করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় ১৯৫২ এর ১২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হয়ে দেড় বছর কারাভোগ করেন। এ বছর (২০১৩) ভাষা সংগ্রামী হিসেবে 'একুশে পদক' (মরণোত্তর) পান। কুমিল্লা শহরের সুপারি বাগানে তাঁর নামে একটি কলেজ রয়েছে।

এছাড়া কুমিল্লার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হলেন, রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ রায় (গোবিন্দপুর, লাকসাম) যিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, নবাব হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী, কবি নজরুলের গানের শিষ্য ভাই-বোন কুলেন্দু দাশ- শৈল রাণী দেবী (রবীন্দ্রসংগীতে খ্যাত), দেশাত্মবোধক ও গণসংগীত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তী, আগরতলা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ চিত্র শিল্পী বিমল কর (গালিমপুর, বরুড়া), সাহিত্যিক আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন (লাকসাম), শিল্পী আপেল মাহমুদ (দাউদকান্দি), উপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-সমাজসেবক জুনাব আলী (বুড়িচং), কবি খালেদ এদিব চৌধুরী (পয়ালগাছা, বরুড়া), প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট সৈয়দা জাহান আরা হায়দার (চর্থা, কুমিল্লা), সংগীতশিল্পী ও সুরকার সুধীন দাশ, নীলিমা দাশ, (তালপুকুরপাড়, কুমিল্লা), ভাষা সৈনিক ড. জসীম উদ্দিন আহমদ (দাউদকান্দি) গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার (দাউদকান্দি), বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক মেজর আব্দুল গণি (ব্রাহ্মণপাড়া), একুশে পদকপ্রাপ্ত দানবীর আবুল হাশেম (মুরাদনগর), শিশুসাহিত্যিক সাজেদুল করিম (চৌদ্দগ্রাম), ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' মর্যাদা আদায়কারী একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম (গণি লজ, রাজবাড়ি কমপাউন্ড, কুমিল্লা) যিনি কানাডাভিত্তিক Mother Language Lovers of the world সংগঠনের সভাপতি হিসেবে সংগ্রাম করেন, গায়িকা ও গীতিকার মীরা দেবী, সমবায় আন্দোলনে ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত মোহাম্মদ ইয়াসিন, হাল আমলের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানী এ.কে নাজমুল করিম (ফাল্গুনকরা, চৌদ্দগ্রাম), কণ্ঠশিল্পী আলম আরা মিনু (দাউদকান্দি), ক্রিকেটার এনামুল হক মনি, লেখক মোবাশ্বের আলী (চৌদ্দগ্রাম),

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও কবি বায়তুল্লাহ কাদেরী (শাহপুর দরবার শরীফ, কুমিল্লা), অভিনেতা আজিজুল হাকিম (দাউদকান্দি), একুশে পদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও সমাজসেবী যোবায়দা হান্নান, মানবসেবায় ব্রতী অনন্য চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত (চান্দিনা), এক সময়ে বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম (৭ফুট ৬ইঞ্চি) মানব ইউনুছ মিয়া (লাকসাম), ডাক্তার ফিরোজা (চান্দিনা) এবং কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ না করেও যিনি কুমিল্লার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন সেই আখতার হামিদ খান যিনি ছিলেন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানী ও কুমিল্লার সমবায় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, কুমিল্লা বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিত 'কুমিল্লা মেথড' এর উদ্ভাবক।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে কুমিল্লার রয়েছে সংগ্রামী ঐতিহ্য। মূলত ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী ও অন্যান্য অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ কুমিল্লায় যেভাবে আছড়ে পড়েছিল, তা-ই আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সফলতার সহায়ক হয়েছিল। দেশভাগের পরপরই ভাষার প্রশ্নে এখানে বড় ধরনের আলোড়ন সূচিত হয় ধীরেন্দ্রনাথের দাবির মাধ্যমে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দুর্বল হয়ে পড়ে ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে। এ ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ আসামির মধ্যে ৩জন ছিল কুমিল্লার। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ সবকটি আসন পায়। এ একাত্মতা পরবর্তী পর্যায়েও প্রতিফলিত হয়। ০২ মার্চ কুমিল্লার সর্বত্র হরতাল পালিত হয় এবং ০৩ মার্চ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলে। ২৩ মার্চ কুমিল্লায়ও প্রতিরোধের 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। যে বিপ্লবী প্রবাসী সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, সেই অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন দাউদকান্দির খন্দকার মোশতাক আহমেদ। বহু মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও সহযোগিতায় আমরা লাভ করি মুক্তির মহানন্দ। ১৯৭১ সালের রক্ত ঝরা দিনগুলোতে মুক্তি ও মিত্রবাহিনির যৌথ আক্রমণে হানাদার মুক্ত হয়েছিল কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চল। তারই ধারাবহিকতায় দেবিদ্বার এলাকা হানাদার মুক্ত হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর। মুক্তিবাহিনি ও মিত্রবাহিনির যৌথ অভিযানে ওইদিন হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। ৩ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনি কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের কোম্পানীগঞ্জ সেতুটি মাইন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। মিত্রবাহিনির ২৩ মাউন্ড ডিভিশনের মেজর জেনারেল আর.ডি বিহারের নেতৃত্বে বৃহত্তর কুমিল্লায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। মিত্রবাহিনির একটি ট্যাংক বহর বুড়িচং ব্রাহ্মণপাড়া হয়ে দেবিদ্বারে আসে। হানাদাররা ওই রাতেই দেবিদ্বার ছেড়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে মুক্তিবাহিনির বিভিন্ন গ্রুপ দেবিদ্বার সদরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরই মধ্যে মিত্রবাহিনির ট্যাংক বহরটি দেবিদ্বার থেকে চান্দিনা রোডে ঢাকা অভিমুখে যাওয়ার সময় মোহনপুর এলাকায় ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের সংথে গুলি বিনিময় হলে মিত্রবাহিনির ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়। এই দিনে দেবিদ্বারের উল্লাসিত জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠে। দুপুর পর্যন্ত ওইদিন হাজার হাজার জনতা বিজয় উল্লাসে

উপজেলা সদর প্রকম্পিত করে তোলে। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রধান সেনা ছাউনিটি কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট সন্নিকটে থাকায় এ অঞ্চলের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ৩১ মার্চ রাজধানী সহ বিভাগীয় শহরের বাইরে শত্রু সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরবময় অধ্যায় প্রথম থেকেই দেবিদ্বারে দানা বাঁধতে শুরু করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা এলাকায় নারকীয় এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ১৫ সদস্যের একটি পাক সেনার দল, পায়ে হেঁটে কুমিল্লা সিলেট মহাসড়ক হয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থানের প্রধান সেনা ছাউনি বর্তমান কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাসের দিকে যাত্রা শুরু করে। ৩১ মার্চ কাক ডাকা ভোরে কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলার ভিংলাবাড়ি নামক স্থানে ওই হায়েনার দলটি জনতা কর্তৃক প্রথম অবরুদ্ধ হয়। পাক সেনারা ধাওয়া খেয়ে দেবীদ্বার পৌর এলাকার চাপানগর গ্রামে ঢুকে এক গৃহবধুর শ্লীলতাহানীর চেষ্টাকালে আবুল কাসেম নামে এক যুবক ইট দিয়ে আঘাত করলে পাক সেনাদের গুলিতে তিনি প্রথম শহিদ হন। বিক্ষুব্ধ জনতা দেবিদ্বার থানার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ওই অস্ত্র এবং বঙ্গজ হাতিয়ার লাঠি, দা, সাবল এমনকি মরিচের গুড়া নামক অস্ত্রটিও ব্যবহার করেছিল। সেদিন শত্রুসেনারা বারেরা কোড়েরপাড়া পৌছার পর হালচাষরত কৃষক সৈয়দ আলী শত্রুসেনাদের দেখে হাতের পাজুন দিয়ে পাক সেনাদের পেটাতে থাকে, পাকসেনাদের গুলিতে সহকর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে আব্দুল মজিদ ঝাটা নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে হায়েনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তিনিও গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে শহিদ হন।

এমনি করে ভিংলাবাড়ি থেকে জাফরগঞ্জ শ্রীপুকুরপাড় জামে মসজিদ পর্যন্ত পনেরো কিলোমিটার পথে হাজার হাজার নিরস্ত্র ও সশস্ত্র বাঙালির সাথে পাক হায়েনাদের দিনব্যাপী যুদ্ধে পথিমধ্যে আট পাকসেনাকে হত্যাপূর্বক মাটিতে পুতে ফেলে এবং জাফরগঞ্জ শ্রীপুকুরপাড় জামে মসজিদে আশ্রয় নেয়া অবশিষ্ট সাত জনকে হত্যাপূর্বক বস্তা বন্দি করে গোমতী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। পরবর্তীতে প্রখ্যাত রাজাকার আফসু রাজাকার এবং আলী আহাম্মদ রাজাকারের নেতৃত্বে এ এলাকাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ভিংলাবাড়ি জাফরগঞ্জ শ্রীপুকুরপাড় জামে মসজিদ যুদ্ধখ্যাত ওই যুদ্ধে আবুল কাসেম, সৈয়দ আলী, আব্দুল মজিদ, তব্দল ড্রাইভার, মমতাজ বেগম, সফর আলী, নায়েব আলী, সাদত আলী, লালমিয়া, ঝারু মিয়া, আব্দুল ড্রাইভার, ফরিদ মিয়া, আব্দুর রহিমসহ ৩৩ বাঙালি শহিদ হয়েছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরের বাইরে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পাক বাহিনির একটি পুরো দলকে পরাস্ত করে নিরস্ত্র বাঙালিদের বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরব সম্ভব্যতা এটাই বাংলাদেশে প্রথম। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে দেবিদ্বারবাসীর অবদান ছিল প্রশংসনীয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর বর্তমানে একমাত্র জীবিত সদস্য ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ন্যাপ-সিপিবি ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক গঠিত বিশেষ গেরিলাবাহিনির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কমরেড আব্দুল হাফেজ, পালাটোলা ক্যাম্প প্রধান কিংবদন্তি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সুজাত আলী,

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আজগর হোসেন মাস্টার, সাবেক এমএনএ আব্দুল আজিজ খান, শহিদ নুরুল ইসলাম, শহিদ শাহজাহানসহ অসংখ্য কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধার অবদান ছিল স্মরণীয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সেনা ছাউনি কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট দেবিদ্বারের খুব কাছে থাকার কারণে এ এলাকার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যেমন বেশি ছিল, তেমনি রাজাকারদের সহযোগীতায় এ অঞ্চলে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে এলাকার মানুষকে। ১৪ এপ্রিল সমতট রাজ্যের রাজধানী খ্যাত এবং হিন্দু অধ্যুষিত বড়কামতা গ্রামে পাক হানাদাররা হামলা চালানোর সংবাদে কমিউনিস্ট নেতা আব্দুল হাফেজের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালি মাত্র দুটি থ্রিনট থ্রি রাইফেল ও লাঠি নিয়ে শত্রুসেনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। রাইফেলের গুলিতে এক প্লাটুন সৈন্যের পাঁচজন লুটিয়ে পড়লে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাক সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ওই রাতে ফিরে এসে হিংস্র হায়েনারা লুটপাট, নির্যাতনসহ অগ্নিসংযোগে পুরো গ্রামটি জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়।

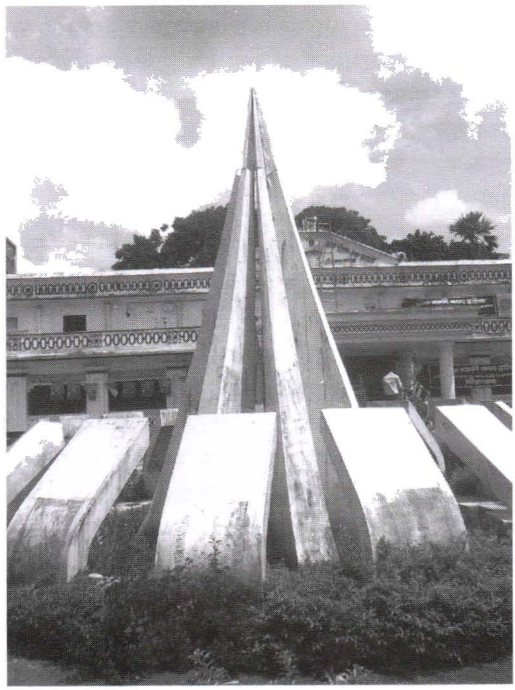

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ কুমিল্লা টাউন হল

২৪ জুন মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকার বাখরাবাদ গ্রামে পাক হায়েনাদের এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে অগ্নিসংযোগ লুটপাট, নারী নির্যাতনসহ ২৪০ নিরীহ বাঙালিকে

নির্মমভাবে হত্যা করে এবং ওই দিন ২১ যুবককে ধরে দেবিদ্বার ক্যাম্পে আনার পথে একজন পালিয়ে গেলেও অপর ২০ জনকে দেবিদ্বার সদরে পোস্ট অফিস সংলগ্নে ধৃতদের কর্তৃক গর্ত খুড়ে চোখ বেঁধে ব্রাস ফায়ারে হত্যা করে একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলে বাকি ১৯ জনকে ওই গর্তে চাপা দেয়া হয়। দেবিদ্বার উপজেলা প্রেসক্লাব ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক দীর্ঘ আন্দোলনের পর গত আগস্ট মাসে ওই বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। ৬ সেপ্টেম্বর রাজাকারদের সহযোগীতায় পাক হায়েনারা বারুর গ্রামে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিলে মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি দল সম্মুখ সমরে জয়নাল আবেদীন, বাচ্চুমিয়া, শহিদুল ইসলাম, আলী মিয়া, আব্দুল সালাম, সফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেনসহ ছয় মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন ভাগ্যক্রমে অপর একজন বেঁচে যান। ভূষণা ও ধামতী গ্রামকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ঘাটি হিসাবে চিহ্নিত করে পাক হায়েনাদের একটি বিশাল বাহিনি ২৯ নভেম্বর হামলা চালায়। ধামতী গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বাড়িসহ নব্বইটি বাড়ি, ভূষণা গ্রামের ষোলটি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। পাক হায়েনারা ভূষণা গ্রামের ছয় নিরিহ বাঙালি ও ধামতী আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর আজিমউদ্দিন সাহেবের নাতি শরিফুল্লাহ, অধ্যক্ষ হালিম হুজুরের দু'ভাগ্নে জহুর আলী ও আব্দুল বারি, সহোদর তাজুল ইসলাম ও নজরুল ইসলামকে তাদের স্বজনদের সামনে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়াও পোনরা গ্রামে (নরসিংদী জেলার) মুক্তিযোদ্ধা আবুবকর, ভিড়াল্লা গ্রামের শহিদ মজিবুর রহমানের কবর পথিকের হৃদয় এখনো আলোড়িত করে। ওই সময় ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের রাজামেহার এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে সাত পাকসেনা নিহত হলে ওই এলাকার দু'পাশের প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জ্বালিয়ে দেয় শত্রুসেনারা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেবিদ্বার উপজেলার নলআরায় (ফাতেহাবাদ গ্রামের একটি গভীর জঙ্গল) এবং ন্যাপ প্রধান এলাহাবাদ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতে দুটি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ওখান থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে চলে যেত।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাকসাম জনপদও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাই এখানে তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের এক আঞ্চলিক ইতিহাস। বিভিন্ন ব্যক্তির সামগ্রিক প্রচেষ্টায় লাকসাম এলাকায় পাক হানাদার বাহিনিকে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। এ প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন মরহুম এ.কে. চৌধুরী, তৎকালীন লাকসামের দুজন এম.সি.এ.আলহাজ্ব জালাল আহমদ ও মো. আব্দুল আউয়াল মিশ্রী গ্রামের মরহুম আব্দুল খালেক, চন্দনা এলাকায় আনসার কমান্ডার আলী মিয়া মোল্লা, আজগর এলাকাতে আলহাজ্ব আলতাফ আলীর নেতৃত্বে প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হয়। বরগাঁও এর জ্যোতিপাল মহাথের ও পূর্ণানন্দ মহাথের মুক্তিযুদ্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা দুজন বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জনমত তৈরি করেছিলেন।

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি হিসেবে কুমিল্লা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির রাজধানী হয়ে উঠেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এখানে জন্ম হয়েছে বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের

যাদের নাম পরিচয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু লোকশিল্পীদের কথা বিবেচনায় রেখে খ্যাতিমান ৩ জন লোকশিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস উপস্থাপন করা হলো।

শিল্পী আবদুল আলিম : ১৮/০২/২০১২ তারিখে কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে সুফিয়া ম্যানশনের 'বিসমিল্লাহ স্টোরে' বসে বর্তমান সংগ্রাহকের সঙ্গে এই শিল্পীর আন্তরিক আলাপচারিতা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর বন্ধু ও 'বিসমিল্লাহ স্টোরের' স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মাসুদ। এই বিস্তৃত কথোপকথনে জানা যায় এই শিল্পীর জীবন ও শিল্পসাধনার নানা অনুষঙ্গ এবং তাঁর সুখ-দু:খ ও স্বপ্ন-কল্পনার একটি সামগ্রিক রূপরেখা। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার ৩নং আন্দিকুট ইউনিয়নের হায়দারাবাদ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের নাম হনুফা বেগম এবং বাবা মৃত রহিজউদ্দিন। তিনি নিজ গ্রাম থেকেই ১৯৯২ সালে এসএসসি ও ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পাস করে ১৯৯৭ সালে মুরাদনগরের জাহানারা হক ডিগ্রি কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। তিনি বিভিন্ন লোকগানের প্রশিক্ষিত গায়ক ও কণ্ঠশিল্পী। মূলত মুর্শিদি, মারফতি, পল্লীগীতি ভাটিয়ালিই তিনি বেশি গেয়ে থাকেন। ৫-৬ বছর হতে শুরু করে এ পর্যন্ত গানের ভুবনেই আছেন। লোকসংগীতই তাঁর পেশা ও নেশা।

বাবা মায়ের কাছ থেকেই তিনি প্রথম গানের প্রেরণা পান। তাঁর বাবা-মা দু'জনেরই কণ্ঠ ভাল ছিল। মা গান করতেন, বাবা হারমোনিয়ামের কিছু কাজ জানতেন। সে হিসেবে তিনি সংগীত প্রিয় পরিবারেরই সন্তান। তিনি নিজের পরিবারটিকে একটি 'সংগীতপ্রিয় সমিতি' হিসেবে উল্লেখ করেন। "আপনার নাম বিখ্যাত শিল্পী আবদুল আলীমের নামে" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "আমার জন্মের সময় শিল্পী আবদুল আলীমের জয়জয়কার অবস্থা। বাবা-মা আবদুল আলীমের ভক্ত ছিলেন, তাই শিল্পী আবদুল আলীমের নামই রাখা হয় আমার জন্য"। ১৯৮৫ সালে ৫ম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে তিনি প্রথম মঞ্চে গান পরিবেশন করেন। এই মঞ্চে 'এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া' গানটি গেয়ে মুরাদনগর উপজেলায় প্রথম হয়ে ৫০ টাকার প্রাইজবন্ড পান। ১৯৯৯ সালে ঢাকায় এসে তিনি 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমির' 'লোকসংগীত' বিভাগে ভর্তি হয়ে ৪ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। এখানে শাহনাজ বুলবুল, আক্কাস দেওয়ান, সেলিম রেজা, হাসান একরামুল্লাহ প্রভৃতি শিল্পীকে গুরু হিসেবে পান। তবে মা-ই তাঁর গানের প্রথম গুরু। শিল্পী আব্দুল আলিম নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন। তবে সহযোগী হিসেবে যন্ত্রে থাকেন মতিলাল, বাংলা ঢোলে নিপুচন্দ্র মনিষ, তবলে সাধন, বাঁশিতে নজরুল, পাখি এবং পার্কাশনে থাকেন মামুন। তিনি সাধারণত শার্টপ্যান্ট বা জিন্স-গেঞ্জি পরে গান করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। তবে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে পাজামা-পাঞ্জাবী পরতে বাধ্য করা হয় বলে তিনি জানান। এর তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। এখানে শিল্পীর পছন্দই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের মতো জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে গান গাওয়ার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ডাক পান। তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে গান পরিবেশন করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন তালিকাভুক্ত শিল্পী তিনি।

মানিক সরকার : লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে মানিক সরকারের বিশেষত্ব এই যে, তিনি লোকসংগীতের যে বিশেষ ধারাটি চর্চা ও পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তা কুমিল্লাতে আর কোথাও নেই। তিনি একজন জারি গানের সরকার। কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার দিশাবন্ধ গ্রামে যে জারি গানের দলটি আছে তিনি তার প্রধান শিল্পী। পরিবেশনের সময় দলের দোহাররা গোল হয়ে নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সরকার হিসেবে তিনি চারপাশে ঘুরে ঘুরে 'দিশা' গেয়ে থাকেন। তখন দলের দু'চার জন 'ধুয়া' গায় এবং নাচতে থাকে ২১/০৯/১২ তারিখে শিল্পীর বাড়িতে বর্তমান সংগ্রাহকের একান্ত আলাপ-আলোচনায় প্রবীণ এই শিল্পীর জীবনের নানাদিক উন্মোচিত হয়।

এই শিল্পীর বর্তমান বয়স ৬০ বছর। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল মালেক হলেও জারি গান ও শিল্পের আঙ্গিনায় মানিক সরকার নামেই পরিচিত। সদর দক্ষিণ চৌয়ারা ইউনিয়নের নেউরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল হামিদ এবং মা হাজেরা বেগম। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা এস.এস.সি পর্যন্ত। ১৯৬৭ সাল থেকে সাব রেজিস্ট্রি অফিসের সহকারী হিসেবে চাকরিও করছেন। ৩ ছেলে ৩ মেয়ে নিয়ে নিজ গ্রামেই তিনি বসবাস করছেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ গানের চর্চা করে না। ৩৫ বছর ধরে নিজ গ্রাম, কুমিল্লা জেলা এবং দেশের অন্যান্য জেলায় দলবল নিয়ে মহররমের জারিগানের ৭টি পালা পরিবেশন করে আসছেন এই শিল্পী। তিনি ছাড়া তার দলে আছেন ওমর আলী, আবুদর রশিদ, ইদু মিয়া, শামছু মিয়া, শাহ আলম, আকবর, রোজা মিজান, মদন মিয়া, আব্দুল লতিফ এমন দশ বার জন শিল্পী। এদেরকে নিয়ে তিনি প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ২ ঘন্টা রিহার্সেল দেন। তবে দলের সদস্যদের তিনি তৈরি করেন নি। এরা তাঁর ওস্তাদেরই শিষ্য। কিশোর বয়সেই মানিক সরকার ওস্তাদের নজরে পড়েন। দু'জন ওস্তাদ ছিল তাঁর। একজনের নাম জয়নাল আবেদীন ও অন্য জনের নাম বাচ্চু সরকার। তাদের শেষ সময়ে এই শিল্পীকে তাঁরা শিখিয়ে যান ওস্তাদগণ অনেক চেষ্টা করে একটি গোসা, কিছু পয়ার মুখস্ত করতে দিতেন। এভাবে তিনি ৭ খণ্ডের বিষাদসিন্ধুর কাহিনি পয়ার আকারে মুখস্থ করেন। এই ৭টি পালার নাম হলো হোসেন শহিদ, কাশেম শহিদ, কাশেম সখিনার বিয়ে, মোসলেমের দুই বাচ্চা, আলী আজগর শহিদ, হানিফার লড়াই ও জহর খণ্ড। এখনো ৭টি খণ্ড তাঁর মোটামুটি আয়ত্তে আছে যা দিয়ে তিনি সভা বুঝতে পারেন। তিনি নিজ গ্রামের এজহারুল হক মিজানকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলেছেন কিছুদিনের মধ্যেই যে মঞ্চে উঠবে।

মহররমের চাঁদ উঠলে পুরো একমাস তাঁকে দলবল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, কারণ কোন না কোন বাসায় পরিবেশনার দাওয়াত থাকে। তিনি এবং তাঁর দলের সদস্যগণ 'হাইর' (সারি) গানও গেয়ে থাকেন। ভাদ্র মাসে রোয়া (নতুন ধানের চারা) লাগানোর সময় এ গান গাওয়া হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গলার সুর ভালো ছিল বলে ওস্তাদের আগ্রহে তিনি এই জগতে জড়িয়ে যান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিসহ বেতার, টিভিতেও তিনি এ গান পরিবেশন করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সম্মাননাসহ অন্যান্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের পরিবেশিত জারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "আমরা যে সুরে গাই এ সুরের জারি পুরো কুমিল্লাতে নাই, বাংলাদেশেও আছে কিনা সন্দেহ"। তিনি চান এ জারি গানের চর্চা ও পরিবেশনা ভবিষ্যতেও জারি

থাকুক। বর্তমানে এই শিল্পী জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছেন আমরা তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

তাঁর পরিবেশিত জারিতে এমন বন্দনা রীতি আছে,

আল্লাহ তোমার নাম, তোমার কাম, তোমার মেহেরবানি
দরিয়া শুকাইতে পার, পাহাড়ের পানিরে আল্লাহ...(ঐ)
পহেলা করিনু বন্দি (বন্দনা), আপে করতার (কর্তার)
দ্বিতীয় করিনু বন্দি, ফেরেশতা তাহার।
জিবরাইল, মিকরাইল, (মিকাইল) আরো ইসরাফিল
সালাম করিয়া বন্দিনো আজরাইল।

মানিক সরকারের পরিবেশিত জারির নমুনা : ('হোসেন শহিদ' পালা থেকে)

অভাই ইমাম অ; বেঈমান শহরে যাইওনা সেই শহরে জহর মিলে, পানি মিলে না। সেই শহরে গেলে ইমাম, জানে বাঁচবানা অভাই ইমাম অ; বেঈমান শহরে যাইওনা।

কুমার শচীনদেব বর্মণ (১৯০৬-১৯৭৫) : শহরের উত্তর চর্থায় জন্ম এবং এখানেই শৈশব কাটে। শৈশবেই লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এং বহু লোকসংগীত সংগ্রহ করে তাতে রাগসংগীতের মিশ্রণে সুরারোপ করেন। এভাবে নিজেকে একজন নামকরা কণ্ঠশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি 'পদ্মশ্রী' সহ ভারত সরকারের অনেক পুরস্কার লাভ করেন। 'নিশীথে যাইও ফুলবনে' 'ওরে সুজন নাইয়া' ইত্যাদি জনপ্রিয় গানের মাঝে তিনি অমর হয়ে আছেন।

এছাড়াও রায়হান উদ্দিন, আব্দুল বারিক সরকার ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, পরিমল দত্ত, সুমেন্দু চক্রবর্তী, কুলেন্দু দাশ, আয়েত আলি খাঁ, ফজলে নিজামী, সুরকার হিসাংসু দত্ত প্রমুখ কুমিল্লা জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যে গ্রামবাংলার মানুষের চিন্তাধারা জীবনযাপন বিচিত্ররূপে ফুটে ওঠে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন অঞ্চলের জন-মনের পারস্পরিক সান্নিধ্য ও নিবিড় পরিচয়ও বিধৃত হয়। ঐতিহ্যগত ঐক্য ও ভাব-সাদৃশ্য' লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর লোকসাহিত্যে ছড়া' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "বাহিরের লৌকিক ও প্রাকৃতিক জগতে যেমন অবিরাম নানা কাজ চলিতেছে, মানবের অন্তর্জগতেও তেমনি এ দুই-এর সমবায়ে একটা সাহিত্যের গঠন কাজ চলিতেছে। এই সাহিত্যের গঠনকার্যকেই গ্রাম্য কবি ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া, রূপরস দান করিয়া নিত্যকালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। লোক-সাহিত্য সেই নিত্যকালের রচিত কুসুমার্ঘ্য।"

ক. লোকগল্প/কাহিনি

মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্পই লোককাহিনি, এগুলোর ভাষণ মূলত গদ্য হলেও কোন কোন গল্পে গান বা ছড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। এসব কাহিনির বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও পরিধি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষকেও স্পর্শ করেছে। দেব দেবী, জিন-পরি, রাক্ষস খোক্ষস, রাজা-রাণী-প্রজা, পীর-ফকির, কৃষক, কামার, কুমার, ধোপা-নাপিত, পশু-পাখি, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়কে আবর্তন করে লোককাহিনি রচিত হয়েছে। এসব গল্প বলার পেশাদার কথক আজ আর তেমন পাওয়া যায় না। সাধারণ কথকগনই এগুলো এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এ জনপদে সব জাতীয় লোককাহিনিকে কিচ্ছা বলা হয়। তবে কাহিনি ও কিচ্ছার মধ্যে কিছু পার্থক্য করা যায়। কিচ্ছা সাধারণত সম্পূর্ণ রূপকথা আর কাহিনিতে জীবনচেতনা মুখ্য থাকে।

লোককাহিনিকে ক. রূপকথা, খ. ব্রতকথা, গ. রোমাঞ্চকতা, ঘ. বীর কাহিনি, ঙ. পুরাকাহিনি, চ. স্থানিক কাহিনি বা কিংবদন্তি, ছ. পশুকাহিনি, জ. নীতিকথা, ঝ. হাস্য-কৌতুক কাহিনি ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। বাংলাদেশে প্রায় সব ধরনের লোককাহিনি থাকলেও বীরকাহিনি একেবারেই বিরল। বঙ্গদেশে প্রকৃত বীরের বড়ই অভাব। নিম্নে কয়েকটি কাহিনি/কিস্‌সা দেওয়া হলো :

বিনা বাতাসে গাঙের পানি নড়ে না

কথক-জহিরুল হক, কর্মচারী, মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

এ্যাক রাইজ্যের (রাজ্যের) এ্যাক গিরস্তের (গৃহস্তের) ছেলে গেরামের মাতবরের নিকট টাকা জমায়। এই কতা (কথা) আর কেউ জানতো না। জমাইতে জমইতে অনেক টাকা জমে। গিরস্ত ছেলে একদিন তার টাকা আনতে মাতবরের কাছে যায়। কিন্তু মাতবর টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করে। ফিরার সময় পথে এক জাউল্যার

(জেলে) লগে দেখা। ছেলেটি জাউল্যার কাছে সব খুলে কয়। জাউল্যা বলে, তুমি রাজার কাছে বিচার দেও, আমি সাক্ষী দিমু।

ছেলে আবার হাঁটতে থাকে। পথে দেখা হয় এক নাপতার (নাপিতের) লাগে। সব শুনে নাপতা ও রাজার ধারে বিচার দেওনের কথা কয়। আর বলে, তুমি বিচার দেও, আমি সাক্ষী হমু। তারপর দেখা অয় এক ধোপার সংগে। ধোপা ও রাজার কাছে বিচার দেওনের কথা কয় এবং সাক্ষী হবে যা গিরস্ত ছেলেকে আশ্বাস দেয়।

ছেলে রাজার কাছে নালিশ জানায়। সব শুনে রাজা একটা নির্দিষ্ট দিন মাতব্বরকে সংগে নিয়া যাইতে কয়। আর সাক্ষীহগল ও (সব সাক্ষী) নিয়ে আসতে বলে। রাজা প্রথম সাক্ষী জাউল্যাকে জিগায়, তুমি এ বিষয়ে কি জান বল?।

জাউল্যা : হুজুর আমি বেশিকিছু জানি না। আমি জাউল্যা মানুষ। শুধু এইডাই জানি বিনা বাতাসে গাঙ্গে ঢেউ ওডে না।

রাজা এইবার নাপতাকে জিজ্ঞেস করে। নাপতা ও ইঙ্গিতে বলে–

নাপতা : হুজুর আমি নাপতা। রক্ত বাইর না হওয়া পর্যন্ত নখকুনি (নখের কোণা) কাডি। এর বেশি বলার সাধ্য আমার নাই।

রাজা এবার ধোপাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেয়।

ধোপা : হুজুর শক্ত কইরা আছাড় না দিলে মইলা (ময়লা) সাফ অয়না। এর বেশি আমি কিছু জানি না।

তারা তিনজনেই জানায় যে এগুলিই তাদের সাক্ষ্য।

তাদের কথা শুনে রাজা যা বুঝার বুঝে যায়। তারপর রাজা জল্লাদকে হুকুম করেন মাতব্বরকে বেতের বাড়ি মারার জন্য। এরপরই মাতবর টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে।

গল্পটির কাহিনিগত মূল্য মূল্যায়ন

এ গল্পে দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অবিচারের রূপ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় শোষক শ্রেণি হলো মোড়ল মাতবর আর সাধারণ পেশাজীবী ও কৃষক শ্রমিক গোষ্ঠী হলো শোষিত শ্রেণি। গল্পের জেলে, ধোপা এবং নাপিত কথা বলেছে তাদের পেশা ও জীবনাভিজ্ঞতার ভাষায়, কেননা সরাসরি গ্রাম্য মোড়লের বিরুদ্ধে কথা বলার উচ্চকণ্ঠও তাদের নেই। শোষিত বঞ্চিত মানুষই তার শ্রেণিগোষ্ঠীর সমস্যা বুঝতে পারে এক্ষেত্রে তারা সবাই এক। তাই ধোপা, জেলে, নাপিত ছেলেটিকে উদ্ধারে এগিয়ে এসেছে। আবার বিচর কাজে সাক্ষ্য প্রমাণের চেয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার শিক্ষা ও কর্ম নয়। এখানে সেটা কাজে লাগিয়েই রাজা মাতবরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছেন। স্বীকৃতি আদায়ে আজকাল চাপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

টোরার কিচ্ছা

এক কুটনা বুড়ির কয়ডা গরু আছে। গরুগুলা খাওনের লাইগ্যা বাঘ আসে, চোর ও আসে চুরি করতো। বুড়ি গোয়াল ঘরে কিছুর শব্দ আইলেই বলে–চোরা, বাঘ কাউরেই

খাই না, ডরাই শুধু টোরারে। একদিন বাঘ গরু খাইতে এসে একথা শুনে ভাবনায় পড়ে। এদিকে চোর ও বাঘকে গরু মনে করে ঘর হতে ধইরা আইন্যা দেহে (দেখে) বাঘ। তহন সে বুদ্ধি করে বাঘের পিডে উইঠ্যা চড়ে আর বাঘ টোরায় ধরেছে মনে করে দৌড়াতে থাকে। আর চোর আরেক সুযোগ এক গাছের ডাইলা (ডাল) ধরে ঝুলে যায়।

পথের মইধ্যে হিয়াল (শিয়াল) কে দেইখ্যা বাঘ বিত্তান্ত কয়। হিয়াল ব্যপার স্বচউককে দেখার জন্য গাছতলায় আসে। চোরা কায়দা বুঝে হিয়ালের ল্যাজে ধরে ফেলে ঘুরাতে থাকে আর বলে–

লেনজা (লেজ) হচকা
ঘেডি (ঘাড়) মচকা
ডন্নর ডন্নর।

এই বলে সে হিয়ালের মাথা গাছে বাড়ি মারে, এক পর্যায়ে ছেড়ে দেয়। পথে হিয়ালের সানে চিতার সঙ্গে দেখা। চিতা কয়–

চিতা : কিরে কাপস ক্যা? কি আইছে।

শিয়াল : আমারে টোরায় ধইচ্ছে, আমারে টোরায় ধইচ্ছে।

চিতা : কি আমার এইখানে কোন টোরার মাতবরী, আমারে দেখাইয়া দে। এই বলে চিতা গাছের নিচে আসে। আর তখন চোরা বাঁচার জন্য উপরে একটি মরকাইল্যা ডালে ওঠে এবং ভাইঙ্গা চিতার ওপর গিয়া পড়ে। আর চিতা ও বাঘ, হিয়ালের মতো আমারে টোরায় ধইচ্ছে, বলে দৌড়াতে থাকে, দৌড়াতে থাকে।

[কথক : জাকারিয়া, হুরুয়া, বরুড়া, কুমিল্লা]

কাহিনির তাৎপর্য বিশ্লেষণ

এখানে টোরা আসলে একটি কাল্পনিক জীব, এটি এক জাতীয় দ্বিরুক্ত শব্দের অংশবিশেষ। যেমন, টা-টা, গাছ-টাছ, চোরা-টোরা। কুটনা বুড়ি মনের ভয় দূর করতেই টোরার কথা বলতো। রূপকার্থে মনের ভয়ের প্রতীক হিসেবে এই কথাটি গল্পে উপস্থিত। কিন্তু বাঘ, শিয়াল এখানে বোকা হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং চিতার বোকামির জন্য টোরা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে টোরা আসলে চোর বা মানুষেরই প্রতিনিধি। বাঘ, চিতা যত শক্তিশালীই হোক এরাও মানুষকে ভীষণ ভয় পায় এই গল্প থেকে তা অনুধাবনযোগ্য। ভাষা ব্যবহারের বুদ্ধি বুড়িকে রক্ষা করে গরু চুরি হতে, আবার চোর ও বুদ্ধি বলে বাঘের ভয় থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়।

শিয়ালের সাজা

এক বনে থাকতো এক লোভী শিয়াল। একদিন বনের মইধ্যে একটি মোটাতাজা শিয়াল দেইক্কা (দেখে) তার খাওনের লোভ অয়। এজন্য শিয়াল গিয়ে হরিণের সাথে ভাব জমায় ও 'দোস্তালী' (বন্ধুত্ব) পাতে। একদিন শিয়াল হরিণকে পুষকি (ফাকি) দিয় কয়, দোস্ত চলেন, বনের ঐ দিগিল, কচি ঘাস খাইতে পারবেন। হরিণ সরল মনে যায়। হরিণকে ক্ষেত দেখাইতে দিয়া শিয়াল কয়–

শিয়াল : দোস্ত আমানে খাইতে যায়েন, আমি পাশের গিরছের ঘরে
যাইয়া দেহি মুরগি টুরগি খাওন যায় নি।

শিয়ালের মতলব হলো আজ এই বিরাণ পরিবেশের মইধ্যে হরিণকে মজা কইরা খাইবে, কিন্তুক পাশের গিরছ ঘরে যাওয়ার লোভও সে সামলাইতে পারে না। গিরছ বাড়িতে যাইয়া সে একটি মিডাইর (গুড়ের) কলসী পায়। মিডাইর লোভে সে হরিণের কথাও ভুইল্যা যায়। কলসীর মুখ দিয়া শিয়ালের মুখ ঢুকে না, তবু সে জোর কইরা মাথা ঢুকাইয়া দেয়। কিন্তুক পরে আর মাথা বাইর করতো পারে না। তখন সে 'আউলা ছালি' (এলোমেলো দৌড়) দেয়, গাছের মইধ্যে বাড়ি খাইয়া মাডির কলসি ভাইসা যায়। কিন্তুক কলসীর ঘাড়া গলায় আটকাইয়া থাহে। সে ভাবে, একটি আর ভালো।

শিয়াল : মিডাই খাইতে গিয়া গোস্ত আরাইলাম (হারালাম)।

এরপর শিয়াল আবার নতুন বেশ ধরে। ফিরতি পথে দেখে হরিণ গিরছের পাতা ফাঁদে আটকাইয়া আছে। শিয়াল তখন নতুন গান ধরে,

গোস্ত খাই না টোস্ত খাইনা
হইয়াছি ব্রাহ্মণ
কলসীর ঘাড়া গলায় লইয়া
চইলছি বিন্দাবন।

হরিণ শিয়ালকে দেখে দাঁত দিয়া ফাঁদের দড়িকাইট্টা দিতে বলে। শিয়াল দড়িতে ও গোস্তের গন্ধ আছে বলে জানায়। এই বইল্যা শিয়াল পালায়। হরিণ আটকা পইড়া খালি কান্দে। পরে এক কাউয়ার (কাকের) বুদ্ধি কাজে লাগাইয়া হরিণ বাঁচে। কাউয়া বুদ্ধি দেয় হরিণ গিরছ আইলে মরা সাইজ্যা পইড়া থাহে। হরিণ মরার ভান ধইরা থাকে, গিরছ মরা ভাইব্যা ছাইড়া দেয়।

তথ্যসূত্র : গোবিন্দ পাল, বয়স ৫০, শিক্ষা-মাধ্যমিক, গ্রাম+পো : বিজয়পুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

ট্যাটনা ও জুলার কাহিনি

এক গ্রামে বাস করতো দুই বন্ধু। এক বন্ধুর নাম ট্যাটনা ও অপর বন্ধুর নাম জুলা। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ট্যাটনা চালাক চতুর এবং অপর বন্ধু জুলা বোকা। একদিন চালাক বন্ধু ট্যাটনা বোকা ও সহজ সরল বন্ধু জুলাকে প্রস্তাব দিল বন্ধু শীত এসে গেছে চলো দু'জনে মিলে একখানা কম্বল কিনি তবে শর্ত হলো তুমি ব্যবহার করবে দিনে আর আমি ব্যবহার করবো রাতে। জুলা বলল ঠিক আছে তাই হবে। এই বলে তারা কম্বল কিনে নিয়ে এলা। ট্যাটনা রাতে প্রচণ্ড শীতে কম্বল গা দিয়ে ঘুমায় আর নির্বোধ জুলা শীতে কষ্ট পায়। সে গ্রামে থাকতো একজন চাটুকার বা চামচা। সেই চামচা একদিন জুলাকে ডেকে বললো তুমি কম্বলখানা প্রতিদিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবে। জুলা কথামতো তাই করলো। তখন রাতে যখন ট্যাটনা ঘুমাতে যাবে তখন ভেজা কম্বল দেখে ট্যাটনা বোকা হয়ে গেল। ট্যাটনা তাই জুলাকে ডেকে বললো বন্ধু চলো আপোস করি আমরা দু'জনই কম্বল খানা রাতে ব্যবহার করবো। কিন্তু ট্যাটনা মনে মনে জুলাকে চাচ্ছে জব্দ করা যায় কিভাবে। আরেকটা ফন্দি বের করল ট্যাটনা এবং বন্ধু জুলাকে

বলল, বন্ধু এসো আমরা দুজন মিলে একটা গরু কিনি, তবে এই শর্তে যে গরুর সামনের অংশের মালিক হবে তুমি আর আমি থাকব পেছনের অংশের মালিক।

সোজা সরল বন্ধু জুলা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তার বন্ধুর কথায় সম্মত হয়ে গেল। এদিকে বেশ যত্নের সাথে প্রতিদিন গরুকে ঘাস খাওয়াতো জুলা আর অন্য দিকে ট্যাটনা গরুর দুধ দোহন করে পরম তৃপ্তির সাথে তা খেয়ে নিত। একদিন গ্রামের চাটুকার জুলাকে ডেকে প্রস্তাব দিল যে ট্যাটনা যখন দুধ দোহন করবে তখন তুমি গরুর গায়ে লাঠি দিয়ে বাড়ি দেবে। কথামতো জুলা তাই করলো তখন গরু দুধ দেয়া বন্ধ করে দিলো। শেষে ট্যাটনা জুলার সাথে পেরে না উঠে বন্ধুকে প্রস্তাব দিলো এসো আমরা দু'জনে ভাগ কইরা থাকি। একদিন ট্যাটনার মার মৃত্যু হলে ট্যাটনা তার মায়ের লাশ জুলার বাড়ির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। তখন গ্রামের চাটুকার জুলাকে ডেকে বলল ট্যাটনা তার মার লাশ তোমার বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়িকে অপবিত্র করে দিয়েছে তাই তোমার মায়ের মৃত্যু হলে তুমিও তোমার মায়ের লাশ ট্যাটনার বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাবে। তখন জুলা বাড়ি গিয়ে তার মায়ের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ট্যাটনার বাড়ির দিকে। নিতে নিতে জুলার মায়ের মৃত্যু ঘটল। জুলা তার নির্বুদ্ধিতার দণ্ড দিল তার মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

বেজি ও গৃহকর্তার কাহিনি

এক গ্রামে এক গৃহস্থ পরিবার বাস করতো। গৃহকর্তার একটি শিশুকন্যা ছিল। গৃহকর্তা বাড়িতে একটি বেজি পালতেন। একদিন গৃহকর্তা তার শিশু কন্যাটিকে বাড়ির উঠানে বসিয়ে রেখে বাইরে যান এক কাজে। এমন সময় এক বিষধর সাপ শিশু কন্যাটিকে দংশন করে। এ দৃশ্যটি দেখে ফেলে বেজিটি। তখন বেজিটি তার গলায় লাগানো দড়িটি কেটে দৌড়ে এক জঙ্গলের দিকে ছুটে যায়। এমন সময় গৃহকর্তা বাড়িতে ফিরে এসে দেখে তার শিশু কন্যার নিথর দেহটি উঠোনে পড়ে আছে এবং দেখে বেজিটি দড়ি কেটে পালিয়েছে। তখন গৃহকর্তা ধরে নেয় যে, বেজিটি দড়ি কেটে তার কন্যাকে কামড়ে পালিয়েছে এবং এর ফলে তার কন্যার মৃত্যু হয়। গৃহকর্তা এ স্থানে বসে আহাজারি করতে থাকে। কিছু সময় পর জঙ্গল থেকে বেজিটি ফিরে এলে গৃহকর্তা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে একটি লাঠি দিয়ে বেজিটিকে সজোরে আঘাত করে এতে বেজিটি তৎক্ষনাৎ মারা যায়। বেজিটি মারা যাওয়ার পর গৃহকর্তা ভালো করে খেয়াল করে দেখেন বেজির মুখে গাছের শিকড়।

গৃহকর্তা তখন গাছের শিকড়টা এনে তার শিশুকন্যার মুখে দেন এতে তার মেয়েটি বেচে উঠে। গৃহকর্তা তখন তার ভুল বুঝতে পারে এবং তার প্রভুভক্ত বেজিটির জন্য হাহাকার করতে থাকে। গৃহকর্তা প্রচণ্ড অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে।

কানা, কুইড়া ও ল্যাংড়ার কাহিনি

এক গ্রামে বাস করত কানা, কুইড়া ও ল্যাংড়া নামক তিনজন লোক। তাদের এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তারা তিনজন খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। একদিন তিনবন্ধু স্থির করে তারা বিয়ে করবে। যেই ভাবা সেই কাজ, তারা তিনজন বিয়ে করল যথারীতি। বিয়েতে বেশ ভালো অঙ্কের যৌতুকও পেল তারা। তিন বন্ধুর সখ্যতার দরুণ তাদের তিন

স্ত্রীদের মধ্যেও বেশ সখ্যতা গড়ে উঠল। এভাবে তিন বন্ধু একটি বছর অতিক্রম করল তাদের শ্বশুর বাড়ি প্রদত্ত যৌতুকের টাকা দিয়ে। যৌতুকের টাকা শেষ হবার পর তাদের সংসারের পরিস্থিতি হলো ভয়াবহ, অভাব অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী হলো। তাদের তিনজনই ছিল নিষ্কর্মা সুতরাং সংসারের দশা হয়ে উঠল বেহাল।

একদিন তিন স্ত্রী মিলে যুক্তি করে তিন স্বামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করে এই বলে বাড়ি থেকে বের করে দিলো যে তারা যখন বাড়ি ফিরবে তখন অবশ্যই যেন তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে ফিরে। তিন বন্ধুও ভাবলো কথাটা সঠিক স্বামী হিসেবে সঠিক দায়িত্ব তারা পালন করতে পারেনি। তিন বন্ধু তখন ব্যর্থতার ক্ষোভ নিয়ে জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন খুজতে বের হয়ে পড়লো। অন্যদিকে তিন স্ত্রী ফিরে গেল তাদের বাবার বাড়িতে। তিন বন্ধুর মধ্যে কুইড়া ছিল প্রচণ্ড অলস, ল্যাংড়ার হাটা চলা করার ক্ষমতা ছিলনা আর কানার চোখে দেখার ক্ষমতা ছিল না তবে কানার দৈহিক সামর্থ বেশ ভালো ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো কানা ল্যাংড়াকে কাধে তুলে নিবে আর কুইড়া কানার হাত ধরে পথ দেখিয়ে সামনে নিয়ে যাবে। তাদের যাত্রা শুরু হল, তিনজন হাটতে হাটতে তাদের গা পেরিয়ে দূরে পৌছে গেলে পথের ধারে পেল এক গোছা মোটা দড়ি, তারা দড়িটাকে পেচিয়ে সাথে নিল এই ভেবে যে কোন না কোন ভাবে তা তাদের কাজে লাগতে পারে। হাটতে হাটতে সামনের দিকে গেল তারা, পথের ধারে পেল এক হাড়ি চুন গোলা।

চুন গোলাও সাথে নিল। আবার হাটা শুরু করলে একটু সামনে যেতেই পেয়ে গেল বিশাল এক হাতির দাত, প্রয়োজনীয় ভেবে সাথে নিয়ে নিল। আবার হাটা শুরু করলো তিন বন্ধু এবং সামনে পেল একটা ভাঙা ঢোল, তারা তা সঙ্গে নিয়ে নিলো। হাটতে লাগলো তারা, এভাবে প্রায় সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এলো তখন তারা এক গভীর জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করলো। জঙ্গলে এদিক ওদিক ঘুরতেই তারা পেয়ে গেল এক বিশাল সুরম্য অট্টালিকা। তারা এর ভেতর প্রবেশ করলো কিন্তু কোন মানুষ জন পেলনা ভেতরে। বড় একটি খোলামেলা ঘরে প্রচুর ফলমূল মাছ-মাংশ, মণ্ডা-মিঠাইয়ের সন্ধান পেল তারা এবং সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যে প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। তাদের বেশ কিছু ফলমূল ও শাক সবজি খেয়ে তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করলো এবং রাত ঘনিয়ে এলে তারা সকলে ঘুমিয়ে পড়লো। ভোর হতে না হতেই বিকট গর্জন আর মাটি কাপার দরুণ তারা হৈ-চৈ করে ঘুম থেকে উঠে পড়লো।

জানালা দিয়ে তারা দেখতে পেল অতিকায় দানব তাদের অবস্থান নেওয়া বাড়িটির দিকে আসছে। দানব-রাক্ষসগুলো বাড়ির কাছে এসেই বুঝতে পারল বাড়িতে অন্য কোন প্রাণী উপস্থিত আছে। রাক্ষসদের একজন উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলো বাড়ির ভেতর কে? তখন উপস্থিত বুদ্ধিতে কানা উত্তর দিলো আমরা রাক্ষসের ভাই খোক্ষস। রাক্ষসকুল খোক্কসের কথা শুনে আতকে উঠল। তারপর এক রাক্ষস বলল আচ্ছা খোক্কস দাদা আদিল একটু থুথু ফেলে দেখান তো। তখন ল্যাংড়া উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়ে চুনের হাড়িটা ওদের সামনে ছুড়ে মারলো। রাক্ষসকুলের একজন এবার বলল এবার একটু তোমাদের গায়ের লোম দেখাও তো! তখন সাথে সাথে তারা তাদের সাথে বয়ে আনা বিশাল মোটা দড়িটা ওদের সামনে ছুড়ে মারলো, এতো মোটা দড়ি দেখে

রাক্ষসকুল ঘাবড়ে গেল ভীষণ। এবার রাক্ষসকুলের একজন বলল তোমাদের একটা দাঁত দেখাও তো তখন সাথে সাথে বড় হাতির দাতটা বাইরে ছুড়ে মারলো।

রাক্ষসকুল তাদেরই আরেক প্রজাতি খোক্কসদের বিশাল দাত দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। এবার তারা (রাক্ষসকুল) খোক্কসদের লক্ষ করে বলল এবার একটা পাদ (বায়ুত্যাগ) দাও তো! তখন তারা ভাঙা ঢোলে প্রচণ্ড আঘাত করতে ভীষণ শব্দ হলো এবং রাক্ষসকুল খোক্কসদের পাদের তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে সবাই একমতে এলো যে আর এখানে থাকার বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই চলো পালাই। তখন তারা সবাই এই বন ছেড়ে পালিয়ে গেল। বেশ কদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখন আর রাক্ষসকুলের কোন সন্ধান মিললো না তখন তারা স্থির করলো তাদের স্ত্রীদের এখানে নিয়ে আসবে। যেই ভাবনা সেই কাজ তারা তাদের স্ত্রীদের এখানে নিয়ে এলো এবং সুখে শান্তিতে এখানে বসবাস করতে লাগলো।

তিন ছেলে ও মেহমানের গল্প

এক গ্রামে বাস করতো একজন অতিথিপরায়ণ গৃহস্থ। তার তিন ছেলে, তাদের নাম হলো পঁচা, বাসী, মুইত্তা। একদিন গৃহস্থের বাড়িতে এল বেশ ক'জন মেহমান। মেহমানগণ উপস্থিত হয়েছিল দুপুর বেলা তাই বাড়ির গৃহস্থ তাদের হাত মুখ ধুয়ে এসে দুপুরের খাবার গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালেন। মেহমানগণ আনন্দের সাথে হাতমুখ ধুয়ে এসে খাওয়ার জন্য বসলেন। এ সময় বাড়ির গৃহকর্তা অন্দর মহলের দিকে ইঙ্গিত করে উচ্চস্বরে বললেন পঁচা ভাত নিয়ে এসো! মেহমানগণ নিজেদের মধ্যে বলা বলি করতে লাগলো লোকটিকে তো ভালো ভেবেছিলাম কিন্তু তিনি তো দেখছি একজন পিশাচ প্রকৃতির লোক, মেহমানদের জন্য পঁচাভাত আনার কথা বলছে। যাই হোক ভাত এলো। এবার গৃহকর্তা উচ্চস্বরে অন্দর মহলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন বাসী তরকারি নিয়ে আয়! এবার মেহমানগণের চোখে মুখে বিরক্তির প্রচণ্ড ছাপ এবং একে অন্যের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছে এবং চাপা ক্ষোভ প্রকাশের ভঙ্গিমায় নানা ধরনের কথা বলছে। যাই হোক তরকারি তারা খাওয়া শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর গৃহকর্তা অন্দর মহলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন মুইত্তা পানি নিয়ে আয়! একথা শোনার পর মেহমানগণ এতক্ষণ যাবৎ ধৈর্য্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে গৃহকর্তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন এতক্ষণ যাবৎ আপনার নোংরামি আর অত্যাচার সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। গৃহকর্তা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে হাতজোড় করে তাদের প্রতি বিনত চিত্তে জানতে চাইলো মেহমানদারিতে তার কি কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে? তার এ জানতে চাওয়া প্রসঙ্গে মেহমানগণ তীব্র ও সমস্বরে হৈঃ হৈঃ করে বলে উঠলেন আপনার মেহমানদারির সবটুকুই নোংরামি আর ব্যর্থতায় ভরা কেননা আপনি আমাদের পঁচা ভাত, বাসী তরকারি আর মুতের (প্রস্রাব) পানি খাওয়াতে চেয়েছেন। ছিঃ ছিঃ আপনার এরূপ কুরুচি সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা কখনোই আপনার বাড়িতে খেতে আসতাম না। তখন গৃহকর্তা হাসি হাসি মুখ করে তার তিন ছেলের প্রতি ইঙ্গিত করে অন্দর মহলের দিকে উচ্চস্বরে ডাকলেন পঁচা, বাসী, মুইত্তা কে আসার জন্য তার তিন পুত্র মেহমানদের সামনে এলে মেহমানদের সাথে তার তিনপুত্রের পরিচয় করিয়ে দিলে মেহমানদের ভুল

ভাঙে এবং নিছক হাস্য রঙ্গ মুহূর্তের মধ্য দিয়ে সেই মেহমানদারি এবং ভোজসভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইলিশ মাছ ও ভূত

ইলিশ মাছের প্রতি ভূতের ব্যাপক লোভ আছে এমন গল্প জানা যায় লোক, মুখে। যেমন, এক লোক একদিন বাজার থেকে একটি বড় ইলিশ মাছ কিনে বাড়ির দিকে ফিরছিল, ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। গ্রামের নির্জন পথ দিয়ে হাটার সময় সে পায়ের শব্দ শুনতে পায় যেন তার পিছে পিছে কেউ বোধ হয় আসছে। কিন্তু সে পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পায় না। কিছুক্ষণ পর সে শুনতে পায় দু'জন মানুষের নাকি সুরে কথা বলার শব্দ। এদের মধ্যে একজন বলে লোকটাকে মেরে মাছটাকে খেয়ে ফেলি আর একজন বলে না তা হয় না সে আমার গ্রামের লোক তুই তাকে মারতে পারবি না। কিন্তু লোকটি পিছনে ফিরে কাউকে দেখতে পায়না। তারপর তার বোধ হয় যে সে মাচ্ছা ভূতের পাল্লায় পড়েছে তখন সে মন্ত্র পড়ে তার শরীর বন্ধন করে ফেলে একটি বিড়ি জ্বালিয়ে টানতে টানতে বাড়ির দিকে ফিরে যায় এভাবে সে মাচ্ছা ভূতের হাত থেকে রেহাই পায়।

শয়তানের সাজা

ভোলা নামে এক লোক। বিয়া করেছে এক সুন্দরী বউ। সারাক্ষণ বউয়ের সাথে রঙ-রস করে। কিন্তু কাম কাইজ করে না। বিষয়টি দু'জনকেই ভাবিয়ে তোলে।

ভোলার বউ : তুমি কাম কাইজ করনা, আমরা খাইম (খাব) কিভাবে?

ভোলা : ভাত-পানি ঠিকমতো পাইনা। তাইলে আমি বাপের বাড়ি যাইগা।

তুমি যাওনের দরকার নাই। আমিই যাইতাছি। কামকাইজ জানে না বলে ভোলা শয়তানের হাতে পড়ে মরণের কথা ভাবে। যাইতে বহুত (বেশি) রাইত অয়। সেখানে এক বটগাছের তলে শয়তানের সঙ্গে দেখা।

শয়তান : মানুষের জাত পাইলে আমি কল্লা (মাথা) ছিড়িয়া খাই। ভোলা খানিকটা ভয় পেয়ে যায়। তবু মনকে বোঝায় : মন, এট্টু সাবাস রাখ। নইলে শয়তান আমারে মরিয়া হালাইবো। সে শয়তানকে বলে, তুই কে?

শয়তান : আমি শয়তান।

ভোলা : আমি তো তোরেই বিচরাইতাছি (খুঁজিতেছি)। শয়তান মাল্লে (মারলে) অবস্থা ভাল অয়।

শয়তান : খাইছে আমারে (মনে মনে)। (এক পা, এক পা করে পিছাতে থাকে)

ভোলা : তুই যাইতারবি না। আমি মন্ত্র দিয়া আটকামু।

শয়তান : আটকাইস না ভাই। তুই যা চাস তাই দিমু।

ভোলা : আমি চাই দশমন চাউল। প্রত্যেক মাসে দশমন দিবি। নইলে তোর রক্ষা নাই। এহন ক কোন সময় দিবি?

শয়তান : রাইত দুইটার সময়ায় (সময়) চাউল লইয়া আহুম। এমন সময় নৌকা দিয়ে ব্যবসায়ীরা চাউল নিয়ে যাচ্ছিল। শয়তান জোর বাতাস দিয় নাও ডুবাইয়া দেয়। তারপর চাউল এনে ভোলার উঠানে ফেলে। ভোলা তার বউকে জাগায়।

ভোলা : মাগি উইঠ্যা দেখ, কী ব্যবস্থা করছি।

বউ : এত চাউল কই পাইলা?

ভোলা : একজনে দিয়া গ্যাছে। মাঝে মইধ্যে দিব। আর কুনদিন কিনতে অইবো না। এদিকে শয়তান আস্তানায় গিয়ে কাঁদতে থাকে। তার দাদা বুড়া শয়তান দেইখ্যা জিজ্ঞেস করে, কিরে নাতি কান্দোস ক্যা?

ছোট শয়তান : এক আদম জাতের লগে ঠেকছিলাম দাদা। মাসে মাসে তারে দশমন চাউল দেওন লাগে, হেই দুক্কে কান্দি।

বুড়া শয়তান : কী কস! আদমজাত শয়তান দেখলে আইগ্‌গা দেয় (পায়খানা করে)। আর তুই দিয়া আহস চাউল?

ছোট শয়তান : দাদা, এর পাল্লায় পড়লে তুমি দিবা আরও বেশি

বুড়া শয়তান : আমারে দেহাইয়া দে। ওর কল্লাডা ছিড়রা ফালাইতাম।

ছোট শয়তান : শয়তান বেশে ওর কাছে যাইতারবানা। হে পালে এওককা (একটি) খাসী। গেলে বাঘ অইয়া যাও। বুড়া শয়তান বাঘের সুরত ধরে। ভোলা শোনে দেশে বাঘ আইছে। তাই রশি পাকিয়ে সে মজবুত ফাঁদ পেতে রাখে। বাঘ বেশে শয়তান খাসি খেতে খোয়াড়ে মাথা দেয়। ভোলা রশি টেনে বাঘের কল্লা আটকিয়ে ফেলে। তারপর কল্লায় ধরে গাছে আছাড় মারে। বাঘের মাজামুজা ভাইঙ্গা যায়।

বাঘরূপী শয়তান : আমার নাতি দেয় চাওল, আমি দেয়াম ধান, আমারে মারিস না। তোর কয় মন লাগব?

ভোলা : বিশ মন ধান দিবি। নইলে মন্ত্র দিয়া তোদের সব আস্তানা জ্বালাই দিম। বুড়া শয়তান কান্দল দশায় ফিরে যায়। তার নাতি শয়তান দেখে জিজ্ঞেস করে, কী খবর দাদা?

বুড়া শয়তান : আর কইস না নাতি, তুই দিছস্ত দশ মন চাউল, আমারে দেওন লাগাবো বিশ মন ধান। আদম জ্বাতির মতো এমুন 'খারাইপ্যা' (খারাপ স্বভাবের) জাতি আর নাই।

[কথক : মিনু সাংবাদিক, বয়স : ৬০, জংশন এলাকা, লাকসাম]

কাহিনিটির উপযোগিতা যাচাই

এই লোককাহিনিটি সংলাপ নির্ভর। এতে হাস্যরসের প্রাচুর্য আছে। তবে এতে শিক্ষণীয় বিষয়ও যথেষ্ট। এই গল্পে সাধারণ একজন মানুষের হাতে দুই দুইজন শয়তানের পরাজয় লক্ষণীয় যাদেরকে মানুষ ভয় পায় এবং বেশ শক্তিশালী মনে করে। নিজের ভেতরের বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষও যে জীবনে ফিরে আসতে পারে এই গল্পে এই শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। নিজের সাহস ও মনোবলকে কাজে লাগিয়ে ভোলা শয়তান নামক অপশক্তিকে পর্যদুস্ত করে। শয়তান আসলে মানুষেরই কল্পনাজাত। মনের দুর্বলতা থেকেই শয়তান সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই দুর্বলতার সুযোগই অশুভ শক্তি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনকে শক্ত রেখে পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই আসল কৃতিত্ব।

পেঁচা ও চিকার ভালোবাসা

এক রাজা প্রতিদিন বেহানে (সকালে) উঠে কোকিলের ডাক শুনতে পেত। মিষ্টি সুরে রাজার মন ভরে না। রাজা ভাবে পাকিটা যদি খাচাত ভরি রাহন (রাখা) যায়, তয় সব সমায় (সময়) কোকিলের ডাক শোনম যাইব।

রাজা পাখিটা ধরার জন্য লোক পাঠায়। লোকজন তামান (সমস্ত) দিন জঙ্গলে ঘুরে, কিন্তুক পাখির নাগাল পায় না। তারা রাজাকে বলে, রাজা মশায় কোন জাগতি পাখি খুইজ্যা পাইলাম না। বেহানে যে জাগতি পাকিটা ডাকে, হেই জাগাটা দেখাইয়া দিলে আমরা পাখিটা ধরবার পারি। রাজা প্রকাণ্ড একটি আমগাছ দেখিয়ে দেয়।

রাজার লোকজন লোহার জাল নিয়া গাছটি ঘিরে ফেলে। তারা গাছে একটি পেঁচা দেখে। পরে সেটিকেই কোকিল মনে করে রাজার কাছে এনে দেয়। রাজা কোকিলের ডাক শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সকলে রাজাকে বোঝায়, রাজা মশাই গাছ থেকে ধরে আনায় ভয় পাইছে, দুই দিন বাদে ভয় ভাইসা গ্যালে নিজে নিজেই ডাকাডাকি করবো।

রাজা কয়েকদিন পর পাখির ডাক শুনতে পায়। কিন্তু পাখি খাঁচার এক কোনায় ভাব নিয়া বসে থাকে। রাজা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে। তারপর ডাক শুনতে একদিন পেঁচাকে কাঠি দিয়ে খোঁচা খুচি করতে শুরু করে। খোচা খেয়ে বিরক্ত হয়ে পেঁচা বলে : রাজা মশায় আমি তো সুন্দর ডাকবার পারি না, আমারে যদি কনতো ক্যাচক্যাপাইতে পারি। তবু রাজা এটি মুক্ত করে না।

রাতে পেঁচার সঙ্গে দেখা হয় এক চিকার। পেঁচা চিকাকে গনদেসরি (গন্ধেশ্বরী) ও বিদ্যাধরী বলে খুব তারিফ করে। পেঁচার প্রশংসা শুনে চিকা একেবারে গলে যায়। গলে গিয়ে চিকা বলে : ভাই এক রতন আরেক রতনকে চিনে। তুমি যে কী রত্ন রাজা যদি জানতো তাহলে আর তোমাকে আটকাইয়া রাখতো না। কোকিল পাকির (পাখির) মুক (মুখ) আর তোমার মুক রাইত দিন বেশকম। তোমার মুখখান হইলো খুব বড় আর চ্যাপটা। তা হইলে হইবো কি। আমি কিন্তু হগগলের চাইয়া (সকলের চেয়ে) তোমারেই বেশি ভালোবাসি।

[কথক : সফিউল্লাহ, মাদ্রাসা শিক্ষক, জোড়পোল, মৈশান বাড়ি, লাকসাম]

কাহিনির ভাষ্য

এই গল্পটি গ্রাম্য সালিশে মাতবররা মশাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের সমাজ জীবনে যে বিচিত্র স্বভাবের ও খেয়ালের মানুষ আছে তার পরিচায়ক এ কাহিনিটি। শুধু তাই নয়, তাদের খেয়ালের বশে প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব পড়ে তাও বোঝা যায় কোকিল ভেবে পেঁচাকে খাঁচাবন্দী করার মধ্য দিয়ে। কোকিলের গানের প্রতি রাজার অনুরাগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রাজার শাসনদণ্ডের শৃঙ্খলায় চাপা পড়ে গেছে। দুর্দশাগ্রস্থ পেঁচা সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য মূর্খ ও দুর্গন্ধময় চিকাকে বিদ্যাধরী ও গন্ধেশ্বরী হিসেবে প্রশংসা করে। চিকাও খুশি হয়ে পেঁচাকে রত্ন হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ভালোবাসার কথা জানিয়ে পেঁচাকে সান্ত্বনা দেয়। একজনের বিপদে অন্য মানুষ যদি চিকার মতো সহানুভূতি ও সান্ত্বনার মনোবল নিয়ে হাজির হয় তাহলে সমাজটা আরো সুন্দর হবে।

সাধারণ লোককাহিনি

ছড়াগল্প

১. দোষ দিউম কার?
আমি কামার, তুমি কুমার
পোলা পাটকার, মাইয়া চামার
দোষ দিউম কার, সবই তো আমার।

এক কুমারের বউয়ের লগে এক কামারের পুতের খাতির ছিল। কেউ কাউরে না দেহি থাকতো পারে না। কামারের পুত কয় ধরা পড়ি যাইয়ুম। চল দূরদেশে পলাইয়া যাই। কুমারণী তার লেতরা পোলাকেও লগে লয়।

পথে খেয়া পার হতে হয়। খেয়ার নৌকায় আরেকটি লেতরা ছিল। এটি পাটকারের ছেলে। বউ মারা যাওয়ায় সে শিশুটিকে নিজের কাছে রাখে। কুমারণী এই ছেলেটির পাশে তার পোলাকে শোয়াইয়া রাখে।

কিন্তু ফিরার সময় ভুলে কুমারের বউ পাটকারের ছেলেকে খেঁতা পেঁচিয়ে নিয়ে আসে। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে না। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে তারা অন্য রাজার দেশে আসে। রাত পোহালে দেখে তার কোলে পাটকারের ছেলে। কুমারণী মাথা থাপড়িয়ে কাঁদে। কামার এহন আর ফিরিগি লাভ আইতোনো। ধরা খাই যাইউম।

তারা নতুন দেশে নিজেদের বাবনা বাবনী পরিচয় দেয়। লোকজন তাদেরকে থাকার ঘর উঠিয়ে দেয়। যজমানি করে তাদের দিন চলে।

দেখতে দেখতে তাদের পোলা বিয়ার লায়েক অয়। একদিন এক ঘটক আসে। বলে তোমরার পোলার লাই এক বামুনের মাইয়া দেখছি। মাইয়া কিছু কালো অইলেও জাত ভালা। কামার কুমারণী খুশি অই ঘটককে কিছু টাকা দেয়। ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে যায়।

একদিন কুমারণীর সঙ্গে তার পুতের বউ গাঙে গোছল করতো যায়। বউ দেখে গাঙ্গে ভাসছে একটি মরা গরু। মরা গরু দেখে বউ খুশি হয়ে ওঠে। বলে, ইস! আঁর ভাইরা পাইলে কাম অইত। দুইডা পইসা পাইত। শাশুড়ি বউয়ের কথা শুনে ফেলে। ভাবে, ঘাড়ে দু'জন মানুষ নাই, বউ কার লগে কথা কয়। বাইত গ্যালে জিগাইয়ুম।

শাশুড়ি জিগায় : বউ ঘাড়ে মরা গরু দেই কী কথাছিলা। বউ বলতে চায় না। পরে চাপে পড়ে বলে, কইছিলাম আঁর ভাইরা পাইলে কাম অইতো। দুইডা পইসা পাইত। শাশুড়ির আর বুঝতে বাকি থাকে না যে তার পুতের বউ হলো চামারের মেয়ে।

কুমারণী কামারকে গিয়ে ধরে। গজরাতে গজরাতে কয় তুমি আমার পোলারে চামারের মাইয়া বিয়া করাইছ। ঘটক হেতে প্রতারণা করছে। তুমি এর বিচার চাও। তখন কামার বলে, বিচার চাইউম কী, দোষ দিউম কার? সবই তো আমার।

কাহিনির লোক ঐতিহ্যক নান্দনিকতা

এই গল্পে একরাশ সামাজিক বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি লক্ষণীয়। যদিও মানব জীবন এসবের বাইরে নয়। এই গল্পে বেশকিছু প্রতারণা ও অসদাচরণের প্রমাণ মেলে। পরকীয়া বা অবৈধ সম্পর্কের জের ধরে কামারপুত্র ও কুমারণী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। নতুন জায়গায় এসে জাতে ওঠার জন্য তারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হিসেবে পরিচয় দেয়। নিয়তির অনিবার্যতায় তারাও ছেলে এবং ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে নিয়তির কাছে প্রতারিত হয়। কামার শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে যে, জোর করে কেউ জাতে উঠতে পারে না, কর্মফল নিয়তির কাছে তারা বন্দি। এখন তারা সবাই মিলে এক হয়ে গেছে। এখন সবাই এক।

১. স্ত্রী বড় সতী।

হস্ত বাইন্ধা দুধ দেয়
স্ত্রী বড় সতী
চউক্কের মইধ্যে তেলদি কেই (দেখি)
আডার জন পতি।

বিয়ার পর বউ স্বামীরে অতিরিক্ত আদর করে। নানারকম সুখ-সেবা করে। স্বামীর সন্দেহ অয়, তাদের ৬ মাসের একটি পোলা আছে। একদিন স্বামী বাহিরতুন আইসা দেহে বউ পোলার হাত বাইন্ধা দুধ খাওয়াচ্ছে। স্বামী জিগায়, হাত বাইন্ধা দুধ দ্যাও ক্যা? বউ বলে, আমনে ছাড়া জিনিসটা আর কেউ ধরুক এটা আমি চাইনা।

বউকে পরীক্ষা করার জন্য স্বামী একদিন বলে-বিদেশে যাইয়ুম, দেহি চাকরি বাকরি পাওন যায় কিনা? বউ স্বামীকে উজাইয়া দেয়। স্বামী কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসে, কিন্তু বউ জানতে পারে না। স্বামী দুই চারদিন পলাইয়া থাইক্যা দেহে বউয়ের কাছে আডার জন লাইংগা আসে।

তারপর স্বামী প্রকাশ্যেই ফিরে এসে বলে, চাকুরি বাকরি কিছু পাইলাম না। স্বামী বউকে জিগায়, হুনলাম তোয়ার কাছে নাকি অমুকে অমুকে আইয়ে। বউ স্বীকার যায় না। স্বামী শ্বশুর বাড়িতেও জানায়, কিন্তু কোথাও সে বিচার পায় না।

স্বামী আবার একদিন বাহানা দিয়ে বিদেশ যাওনের কথা কয়। কিন্তু কয়দিন পরই সন্ন্যাসীর বেশ লইয়া ফিরা আহে তার বউয়ের কাছে।

সন্ন্যাসী : মা স্বামীর কারণে তোমার অশান্তি অয়। তার লাই নিঃস্বাধীন চইলতে পারো না।

বউ : হ বাবা। আপনি জাইনলেন কীভাবে। আপনারে এর তদবির করতে অইব।

সন্ন্যাসী : বাডিত করি খাডি হউরগার তেল আনো। এই পরাইন্যা তেল দুই ফোডা চউক্কে দিলে হেতে আর কিছু দেইখতন। তেলখানি সারা গায় মাখি দুই ফোডা চউখে দিবা। জোরে একটা চিক্কুর দিব। এরপর রেনি থাইকলেও আর চউখে দেখব না।

একথা বলে সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে ফিরে এসে কয়, বউ, আমার শরীলডা কেমন কেমন লাগতাছে, তাই ফিইরা আইলাম।

বউ : আইয়েন শরীলে হউরগার তেল মাইখ্যা দেই, আরাম লাগব। এই বলে বউ জামইর সারা শরীলে তেল মাইখ্যা যথারীতি শেষে চোখের মইধ্যে দুই ফোডা দেয়। আর স্বামী সাথে সাথে চিক্কুর দিয়া কয়, এইডা তুমি কী করলা, সব কিছু দি আন্ধা-গোন্ধা লাগে। এই বলে স্বামী বেথিতে এখানে ওখানে গিয়ে পড়ার অভিনয় করে। বউ ভাবে কাম হইছে, এ বার যা ইচ্ছা সব করণ যাইব।

বউ একদিন তার সব লাইংগাদের দাওয়াত করে। ভালা খানাপিনার আয়োজন করে স্বামী সব দেখে। তবু ভান করে বলে,

স্বামী : ঘেরাণ পাইতাছি, মেজজ্জন আইব নাকি?

বউ : আমার বাপ-ভাইরা আইবো, তুমি বই থাহ্, আই তোয়ার খানা নিয়া আইতাছি।

স্বামীর খানা দিয়া বউ লাইংগাদের কাছে যায়। স্বামী দেহে আডার জন লাইংগা খাইতো বইছে। বউ তাদের খাদিম করে খাওয়াচ্ছে। একেক সময় একেক লাইংগার মুখে খাবারও তুলে দিচ্ছে বউ।

স্বামীর আর সহ্য অয় না। আগেই সে বেড়ার কানিত লম্বা ছেনি লুকাইয়া রাখছিলো। খাওয়া দাওয়ার আমোদ ফুর্তিতে সবাই মজে ছিল বলে কেউ অন্যদিকে খেয়াল করে নি। এই ফাঁকে সে ছেনি লইয়া লাংদের দিকে আউলা পাথাইল্যা ছেনি ঘুরাতে থাকে। এতে সবাইর নাক, মুখ, হাত-পা কেটে যায়। স্বামী তখন সকলকে খবর দিয়ে বলে,

হস্ত বাইন্ধা দুধ দেয়
স্ত্রী বড় সতী
চউক্কের মইধ্যে তেলদি দেই
আডার জন পতি।

ঘটনা শুনে সকলে অবাক হইয়া যায় এবং বউ ও লাইংগাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে।

কাহিনিটির ভাষ্য ও বিষয় বাস্তবতা

এটি আমাদের লৌকিক জীবনেরই কাহিনি। দাম্পত্য জীবনের প্রেমের বাইরে পরকীয়ার কাহিনি এটি। নিজের গর্ভের শিশুকে মহিলা হাত বেঁধে দুধ খেতে দেয়। তা দেখেই স্বামী শ্লেষভরে উচ্চারণ করেছে স্ত্রী বড় সতী। এটি আসলে অসতী স্ত্রীর গল্প। নিজের অসততা লুকিয়ে রাখতে মহিলা মাত্রাতিরিক্ত সততার অভিনয় করে। আর এ কারণেই স্বামীর সন্দেহ হয় এবং অবশেষে সে স্বামীর কাছে হাতেনাতে লাইঙ্গা বা উপপতিসহ ধরা পড়ে।

এই গল্পটি প্রমাণ করে পরকীয়া শুধু বর্তমান সমাজ জীবনেরই সমস্যা নয়, পরকীয়া আগেও আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। ধনী-গরিব, উন্নত-অনুন্নত সব সমাজেই পরকীয়া ও বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ছিল, আছে এবং থাকবে।

কাহিনি কথক : সিরাজুল ইসলাম রাহী, বয়স : ৬৫, জংশন রোড, লাকসাম

হাস্যরসাত্মক গল্প

মৌ লোভী মৌলবি

এক মোল্লা রাস্তায় একজনকে দেখে উইজ্যা (নিজে থেকে) দাওয়াত চায়। বলে আই আমনের (আপনার) বাড়িতে দাওয়াত খাইয়ুম চলেন। লোকটি না করতে পারে না। হুজুরকে বাড়িতে লইয়া আসে। বাড়িতে আইয়া দেহে খাওনের কিছু নাই। লোকটির বউ বলে "হুজুররে যে লই আইছো, খাওয়াইবা কী? আডে (হাটে) গিয়ে মাছ তরকারি আনো"।

গিরস্থ আডে যায় হুজুর তার সঙ্গে আনা ছেলে সাগরেদকে নিয়ে ঘরে বসে। কিছুক্ষণ পর হুজুর ছেলেকে অন্দরে পাডায় এক গ্লাস পানি আনতে। হুজুরের ছেলে কয় "বাবায় এক গ্লাস পানির লাই পাডাইছে"। গিরস্ত বউ গ্লাস নিয়া পানি ঢালতে যায়। পানি ঢালার সময় মাইজ্জালের (ঘরের মাঝখানের পার্টিশন) বেড়া দিয়া হুইক্কাই (গোপনে দেখা) চায়। বেডি বুঝে হুজুরের চরিত্র খারাপ।

বেডি ছিল খুব চালাক। মহিলা নতুন অভিনয় শুরু করে। সে ঘরের পাডা (পাটা) তে খালি পুতা ঘষতে থাকে। ঘষে আর কান্দে। হুজুর আবার ছেলেকে পান আনতে ভিতরে পাডায়। ছেলে মহিলার কান্দন কর্ম দেখে বলে,

ছেলে : আন্তে (আপনে) কান্দেন কেন? খালি পাডায় পুতা ঘষেন কিল্লাই।

বেডি : কান্দি তোর বাপের লাই। আর জামাই ফিরি আই এই পুতা তোর বাপের পোন্দে (পায়ুপথে) দি বলে ঢুকাইব। আমারে পুতা ধারাইতে কই গ্যাছে। হেই দুক্কে কান্দি।

ছেলে এসে তার বাপেরতুন (বাপের নিকট) পোন্দে পুতা ঢুকানোর কথা কয়। একথা শুনে হুজুর পালাতে শুরু করে। ছেলেও অবস্থা বুঝে বাপের পেছন পেছন যায়। এমন সময় গিরস্ত বেডা বাজার করি আসে। বউয়ের হাতে পুতা, স্বামী হাতে পুতা কেন বউরে জিগায়। বউ বলে হুজুরে পুতাটা চাইছিল, দিতাম আইছি। হুজুরকে পুতা দেওয়ার জন্য স্বামী পুতা নিয়ে হুজুরের পিছন পিছন দৌড়ায়, হুজুর দৌড়ায় আরো জোরে।

কাহিনির ভাষ্য ও উপযোগিতা

মৌ লোভী মৌলবি নামক কাহিনিতে এক নারী লোলুপ হুজুর বা মৌলবির পরিচয় পাই। গ্রামাঞ্চলে এমন হুজুরকে বলে লুচ্চা বা লালুইচ্ছা হুজুর অর্থ দেখলে লালা পড়ে এমন লোভী। আমাদের সমাজে এমন হুজুর বা মৌলবি বিরল নয়। যে কারণে হুজুরের চিনতে গল্পের মহিলাটির বিলম্ব হয়নি। এই লোককাহিনি আমাদেরকে আবুল মনসুর

আহমদের হুজুর কেবলা গল্পটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৌলবি বা হুজুরের নৈতিক স্খলনের দিকটি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের খাবার দাবারের প্রতি লোভের বিষয়টি গল্পে লক্ষণীয়। গ্রামাঞ্চলে একটি কথা চালু আছে যে মোল্লায় খায় কল্লা। তারা দোয়া পড়ার বিনিময়ে ঘরে ঘরে দাওয়াত খায়।

গল্পের মহিলা মোল্লাকে শায়েস্তা করার একটি পদ্ধতি বের করেছে। মহিলাটি কিন্তু সব ঘটনা স্বামীকে খুলে বলেনি। বোঝা যায় বাংরার মহিলারা অনেক ঘটনা এভাবে নিজেরাই সামাল দিয়ে থাকে।

কথক : আলী হোসেন, গ্রাম : নশরতপুর, লাকসমা পৌরসভা, লাকসাম, কুমিল্লা

আদিম কাল থেকেই এদেশে কিচ্ছা কাহিনির প্রচলন রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাঙালি সন্তানই ছোট বেলায় কোন না কোন কিচ্ছা কাহিনি শুনে বড় হয়েছে। কিচ্ছা বলায় আনন্দ আছে, শোনার আনন্দ আরও বেশি। তাই সমবয়সীদের মধ্যে নিজে একটি কাহিনি বলার পর অপরজন থেকে আর একটি কাহিনি শোনার আবদার লক্ষণীয়। একটি কিচ্ছা শেষ করে তাই তারা বলে–

নলের আগায় টুনি
আমার একখান শেষ হইল
এবার তোমার একখান শুনি

এপর্যায়ে আমরাও রূপকথাধর্মী, উপকথাধর্মী, ছড়াগল্প জাতীয় এবং সাধারণ লোককাহিনি পরিবেশন করবো যা বিভিন্ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

রূপকথাধর্মী গল্প

ধনেশপক্ষী ও কাকপক্ষী

এক গিরস্তের 'পইলা' (প্রথম) বউয়ের ঘরে খুব সুন্দর একটি মাইয়া অয়। গিরস্ত খুশি অইয়া মাইয়ার নাম রাখে ধনেশপক্ষী। মাইয়া (মেয়ে) হওয়ার মাস ছয়েক পর গিরস্তের বউ মারা গেলে গিরস্ত আরেক বিয়া করে। হেই ঘরেও কালো একটি মেয়ে জন্মায়। তাই নাম রাখে কাকপক্ষী।

কিছুদিন পর গিরস্ত মারা যায়। গিরস্তের গরু বাছুর ও জাগা-জমিনের আয় দিয়া ছোট বউ সংসার চালায়। কিন্তু বড় মাইয়া ধনেশপক্ষীকে এই সৎমা সহ্য করতে পারে না, মাইর ধইর করে, ঠিকমতো খাওন দেয় না। ধনেশপক্ষী কিছু বড় হয়ে উঠলে সৎমা তাকে গরু রাখতে মাঠে পাঠায়। বাড়িতে ফির‍্যা আইলে তাকে গরুর লগে ফ্যান খাইতে দেয়। ধনেশ খাইতে চায় না, না খাইলেও সৎমা মারে।

একদিন ধনেশপক্ষী মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে মায়ের কবরের কাছে আইয়া কয়,

'মাগো' হতাইমা (সৎমা) আমারে ভাত দেয় না, তুমি আমারে কিছু খাওন দ্যাও, নাইলে আমি মইরা যামু। এ সময় গায়েবি আওয়াজ হয়, "আইজ এনতুন (এখান থেকে) যা। কাইল আইয়া দেখবি তোর মার কবরের মইধ্যে এওগগা (একটি) ফল গাছ। তুই এই গাছের ফল খাইয়া বাঁচবি"।

পরের দিন মাঠে গরু ছাইড়া ধনেশপক্ষী কবরের কাছে যাইয়া অবাক অইয়া যায় একটি ফল গাছে কত ফল ধরে আছে। সে কয়েকটি ফল খাইয়া দেখে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা

চইল্যা গেছে। এভাবে সে প্রতিদিন ফল খাইতে থাকে, আর হতাইমার দেওয়া ফ্যান খায় না। বিষয়টি হতাইমার নজরে পড়ে। সৎমা তার মাইয়া কাকপক্ষীকে বলে, "আইজকা তুই ওর লগে যাইয়া দেখবি ও কি খায়, তারপর আমারে কবি"। আজ ধনেশপক্ষী গরু নিয়ে পথ দিলে কাকপক্ষী গিয়ে ধরে। বলে–

কাক : আমি তর লগে মাঠে যামু।

ধনেশ : না, আমি তরে নিমু না।

কাক : আমি যামুই,

ধনেশ : তয়, আমার কথা মার কাছে কইতারবি না

দোনো বইনে গাছ থাইক্যা ফল পাইড়া খায়া বিকালে বাড়িতে আসে। সৎমা আইজ ধনেশকে 'জোরে - জব্বরে' ফ্যান খাওয়াইতে চায়, কিন্তু ধনেশ খায় না। তখন সৎমা তার মেয়েকে জিগায়, তারা আজ কি খাইছে। কাকপক্ষী কিছুই খায়নি বলে জানায়, তখন একটি 'মুইরা পিছা' (ঠুন্ডা ঝাড়ু) দিয়া কাকপক্ষীকে মারতে থাকে। মাইরের ভয়ে সে ফল খাইছে স্বীকার করে এবং চুলের মধ্যে গুজাইয়া (লুকিয়ে) আনা একটি ফল তার মায়ের হাতে দেয়। ফল খাইয়া ফলের স্বাদে, ঘেরাণে (ঘ্রাণে) মা অবাক হইয়া যায়। পরে ধনেশকে কয়, "তুই মাঠে যাইয়া ফল খাস, আমি জিগাইলে কস না। ল, আজ ফল গাছ আমারে দেহাবি"। ভয়ে ধনেশপক্ষী সৎমারে ফল গাছ দেখায়।

এমন সময় এই পথে যাচ্ছিল গ্রামের এক গিরস্ত ছেলে। সোন্দর মেয়ে দেইখ্যা সে জিগায়–

ছেলে : তোমরার বাড়ি কই?

ধনেশ : আমরার বাড়ি ঐ গেরামে। বাড়িতে আমার হতাইমাও হতাই বোন ছাড়া কেউ নাই।

ছেলে : (মনে মনে) গরিব ঘরের মাইয়া। ওরে আমি বিয়া করুম।

(প্রকাশ্যে) আমার লগে বিয়া বইবা নি?

ধনেশ : যুদি আমনে (আপনে) নেন, তাইলে আমি রাজি।

ছেলে পরদিনই ঘটক পাঠায়। তারা বিয়ে করে সুখে বাস করতে থাকে। এদিকে কালা মাইয়া কাকপক্ষীকে লইয়া হতাইমা চিন্তায় পড়ে, কে নিব তার কালা মাইয়া। একদিন কাকপক্ষীর মা তার এক চাচাতো নানিকে ধরে একটা উপায় খোঁজার জন্য। বুড়ি কাকপক্ষীর মারে কয় "আমার কাছে এ্যাকটা ওষুধ আছে। এই ওষুধ যুদি ধনেশ পক্ষীর চুলে বাইন্ধ্যা দিতি পারস, তাইলে সে ধনেশ পাখি হইয়া উইড়া যাইব। তহন তোর মাইয়া ওর জামাইর লগেই বিয়া দিতি পারবি"।

মা : ঠিক আছে, তুমি তাবিজ আইন্যা দ্যাও। কালকেই আমি ধনেশরে নাইওর আনুম। বুড়ি তাবিজ আইন্যা দেয়। আর হতাইমা ধনেশের মাথায় উকুন তোলা, তেল দেওয়া ও বিলি কাটার উছিলায় চুলে তাবিজ বাইন্ধ্যা দেয়। সঙ্গে সে ধনেশ পাখি হইয়া উইড়া যায়।

রাতে জামাই আইলে কাকপক্ষীকে মা ধনেশপক্ষীর কাপড় পরাইয়া জামাইর কাছে থাকতে দেয়। রাতে জামাই কিছু বুঝতে পারে না। সকালে গোছল করতে গেলে ধনেশ পাখি জামাইর মাথার উপর উড়ে আর কয়–

'কারে মাইরা কে করে
কালিরে লইয়া ঘর করে'

জামাই ভাবে 'এই পাখি এই কথা কয় ক্যা'। খেতে বসে জামাই বলে : "মা ধনেশপক্ষী কই? আইতে কন"।

শাশুড়ি : ওই কাকপক্ষী এইখানে আয়। মা নকল ধনেশপক্ষীকে ডাকতে গিয়ে কাকপক্ষী ডেকে ফেলে। এতে জামাইর মনে খটকা লাগে। জামাই ভাবে, "আমি তো কাকপক্ষীরে বিয়া করি নাই, আমারে কি এহন কালা মাইয়া গচাইতে চায়?" জামাই মনের দুঃখে শ্বশুর বাড়িত্তুন বাইর হইয়া যায়।

পথে জামাইর মাথার ওপর এসে ধনেশপক্ষী উড়তে থাকে। জামাই থাবা দিয়া পাখিটিকে ধরে ফেলে। জামাই আদর করতে গিয়ে পাখির মাথায় তাবিজটি পায় এবং খুলে ফেলে। সাথে সাথে ধনেশ মানুষ হয়ে যায়। তখন ধনেশপক্ষী সৎমার সব কাহিনি জামাইর কাছে কয়। পরে ধনেশপক্ষীকে বাড়িতে রেখে জামাই শ্বশুর বাড়িতে যায়। সেখানে বেড়ায় পরদিন বউ হিসেবে কাকপক্ষীকে শাশুড়িকে জানিয়ে রাতে বাড়ি নিয়ে আসে। গভীর রাতে জামাই কাকপক্ষীকে নিয়া গাঙে ফালাইয়া দেয়।

কয়দিন পর মা জামাইর বাড়িতে বেড়াইতে এসে ধনেশপক্ষীকে দেইখ্যা 'টব্বশ' খাইয়া থাকে। সৎমা কাকপক্ষী কই জিগায়। ধনেশপক্ষী কিছু জানে না বল্লে বলে, "কয়দিন আগে জামাই না লইয়া আইলো",

ধনেশ কার জামাই জিজ্ঞেস করলে বলে,

সৎমা : তোর জামাই, কাকপক্ষীর জামাই এক জামাই

ধনেশ : মা, তুমি পাগলের মতো কী কইতাছ?

শ্বশুর বাড়ির কেউ কাকপক্ষীকে দেখেনি। মা বাড়িতে ফিরে যায়। বাড়িতে গিয়ে এসব বলাতে সবাই পাগল বলে গালি দিতে থাকে। এ কথা কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না। ধনেশপক্ষী জামাইকে নিয়ে সুখে সংসার করতে থাকে।

[কাহিনির কথা : ইসমাইল হোসেন, সহকারী শিক্ষক, মেনাহরগঞ্জ হাইস্কুল, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা]

কাহিনির ভাষ্য : গ্রামে একটি কথা শোনা যায়, 'পাপ বাপেরেও ছাড়ে না'। এই কাহিনিতে এই সত্যই বড় হয়ে উঠেছে সতীনের সন্তান ধনেশপক্ষীকে পথের কাঁটা মনে করেছিলো সে। তাই সব রকমের ষড়যন্ত্রেও আশ্রয় নেয় সৎমা, এমনকি বিয়ের পর স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে সে প্রাথমিকভাবে সফল হয় এবং অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে সে ধনেশের স্বামীর হাতেই নিজ কন্যা কাকপক্ষীকে তুলে দেয়। পরে এসব ষড়যন্ত্র নিজের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে, সে কন্যা হারায়। এ ঘটনায় মানুষের নিকট সে পাগল সাব্যস্ত হয়। মূলত আবহমান বাংলা জুড়ে দুষ্ট সৎমায়ের সতীন সন্তান নির্যাতনের যে কথা শোনা যায়, তাই এ কাহিনিতে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।

বেচারি কাকপক্ষীর দোষ ছিল না, সে পরিস্থিতির বলি হয়েছে। আগেকার সমাজে যে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও সংস্কার চালু ছিল তা এ গল্প থেকে অনুধাবন করা যায়।

শিয়ালের বুদ্ধি

এক গিরস্তের সংসারে দুটি গাই ছাড়া আর কেউ নেই। গিরস্ত সকালে দুধ দোয়াইয়া কিছু দুধ খায়, বাকি দুধ দোহন করে ছিক্কায় তুলে রেখে 'আল চইতো' (হাল চাষ করতে) যায়। একদিন দেখে দুধ এক ফোঁডাও নাই। এরপর প্রতিদিনই বাড়িতে ফিরে সে এই কাণ্ড দেখে।

গিরস্ত একদিন ভাবে :"আউজ্জা (আজ) আলে (হালে) যাইতানড়ব (যাব না), কিয়ে দুধ খায় পরা (পাহারা) দিয়ুম"। গিরস্ত দরজাবাড়ি দিয়া ঘরের 'কারে' (উপরের মাচাঙ / সিলিং) উঠে বসে থাকে। গিরস্ত দেখে একটি শিয়াল বেড়া ফাঁক করে উঠে দুধ খেতে শুরু করে। গিরস্ত এদিন শিয়ালকে 'জোক' (তাড়া) দেয় না। ভাবে ফাঁদ পেতে পরে শিয়াল ধরবে।

পরের দিন ভাংগা বেড়া সোজা গিরস্ত রশি দিয়া ফাঁদ পেতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। শিয়াল বেড়ার ফাঁদে কল্লা (মাথা) দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরস্ত রশিতে কল্লা আটকে ফেলে। বলে, "চুদির ভাই, দুধ খাইয়া যে তেল হইছে শইলে, হেই তেল আইজ লমু"। একথা বলে, শিয়ালকে 'দুনা' (মার) দিতে থাকে। দুনা খাইয়া শিয়ালের শরীর ফুইল্যা মোটা হয়। রাতে গিরস্ত খড়ের গাদার মইয়ের সঙ্গে শিয়াল বাইন্ধ্যা রাখে।

একদিন রাতে এ পথে এক বনের শিয়াল যাচ্ছিল। বান্ধা মোটা শিয়ালকে দেখে এগিয়ে এসে সে মোটা হওয়ার কারণ জিগায়।

বান্ধা শিয়াল : বাড়ির গিরস্ত আমারে পালে। যে খানা দেয় এ খানা তোরা পাবি কোনাই? (কোথায়)। দুই গাইয়ের মইধ্যে এটার দুধ শুধু আমারে খাওয়ায়।

বনের শিয়াল : ভাই, তুই তো অনেকদিন খাইয়া শইল বানাইছত, এখন আমারে তোর জাগাত (জায়গায়) দিয়া যা। আমি মোটাতাজা অইলে তুই তোর জাগাত আই বইস।

এ প্রস্তাবে বান্ধা শিয়াল মনে মনে খুব খুশি অয়। তারা রশি খুলে নিজেদের অবস্থান বদলায়। বান্ধা শিয়াল মুক্ত হয়ে বনে চলে যায়। গিরস্ত ঘরে থেকে শিয়ালদের এই কাণ্ড-কীত্তন দেখে। ভাবে, "মনে অয় দুনোগা মিলেই আমার দুধ খাইতো"। সকালে গিরস্ত নতুন শিয়ালকে তুলা দুনা দেয়। কয়েকদিন দুনা খেয়ে শিয়াল বলে : আমি তোমার দুধ খাই ন, আমারে আর 'মাইরগো না'। আমি তোমার একটা উপকার কইরগুম।

তোমারে এউগগা রাজার মাইয়া বিয়া করাইয়া দিউম।

গিরস্ত : ছাড়ি দিলে পলাই যাওনের বুদ্ধি কইচ্ছত। তোরে ছারতাম ন পরে শিয়াল কসম খেয়ে বললে গিরস্ত তারে ছাড়ে। শিয়াল বলে আমার বুদ্ধি মতোন কাজ করুন লাগবো।

শিয়ালের কথামতো গিরস্ত গাই বিক্রি করে শিয়ালের নাকে কানে সোনার জিনিস পরাইয়া দেয়। যেতে যেতে শিয়াল 'আম্মক ঢকের' (বেকুর টাইপের) এক রাজার

রাজ্যে যায় গিয়ে দরবারে গিয়ে বসে থাকে। রাজা পরিচয় ও মতলব জিজ্ঞেস করলে বলে,

শিয়াল : আমি অইলাম 'জহুরী' রাজার মন্ত্রী। রাজা বিয়াশাদী করে ন। হুনলাম আমনের অপ্পা মাইয়া আছে। আমি নিজেই মোক্তেয়ার (ঘটক) অই আইলাম।

রাজা : তোমার নাক কানে হোনার জিনিস ক্যান?

শিয়াল : আমাগো রাইজ্যে এত হোনারূপা আছে যে বেকতে (সকলে) হোনার জিনিস পিন্দে। রাজার হুকুমে আমিও দিছি।

রাজা : এমন জামাই পাইলে মাইয়া বিয়া দেওন যায়।

শিয়াল : তাইলে বিস্যুদবার (বৃহস্পতিবার) তারিখ কল্লাম (করলাম)। আমি হেইদিন জামাই ও অন্যান্য অতিত (অতিথি) মেমান লই আইয়ুম। এদিন রাজ্যের বেবাক কুত্তা আটকাই রাখন লাগব। শিয়াল এসে গিরস্তকে জানায়, "বিস্যুদবারে বিয়া ঠিক করি আইলাম, এখন আমি যা বলি হেই মতন কাম করেন"। শিয়ালের কথামতো গিরস্ত পুরান বেতমুড়া কেটে ঢার কোনায় চারটি লম্বা কলাগাছ পুঁতে রাখে। পুকুরের ঘাটে মাটির সিড়ি বানায়। বেতমুড়াকে ঘিরে নতুন রাস্তা ও মাটির সিড়ি বানানো হয় এবং কিছু দাউরগা (জ্বালানী কাঠ) রেখে দেয়।

শিয়াল বিয়ার দিন জামাইকে নিয়া ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা দেয়। সঙ্গে আছে তার শিয়ালের দলবল। পথে যুক্তি করে রাজার বাড়িতে একজনকে পাঠায় বরের সাজ পোশাক আনার জন্য। সে গিয়ে বলে, "রাজা মশায়, উঁচানিচা রাস্তার মইধ্যে পেঁকে পিছলাইয়া জামাইর সাজ-নষ্ট হইছে, অন নতুন পোশাক দেন"। এভাবে ভাল জামা গায় দিয়ে জামাই রওয়ানা হয়।

এক কুকুর ছুটে খেউয়ানী দিলে শিয়াল দলের সমস্যা হয়। যথাসময়ে খাওয়া দাওয়ার পর বিয়ে হলে গিরস্ত বাড়িতে চলে আসে। শিয়াল গিরস্তকে জানাইয়া রাখে যে, রাজকন্যা লইয়া রাজা আওনের সময় সে দূর থেকে ডেকে উঠলে যেন গিরস্ত শুকনা বেতমুড়াত আর রাস্তার দাউরগায় আগুন লাগিয়ে দেয়। রাজা মেয়ে নিয়ে গিরস্ত বাড়ির কাছে আসলে শিয়াল 'হুক্কাহুয়া' ডাক দেয়। গিরস্ত আগুন দিলে সব জ্বলতে থাকে। জামাই রাজার কাছে কয় "আমনাগো লাই রান্ধনের সময় রসুই ঘরতুন আগুন লাইগ্যা সব শেষ অইয়া গেছে"। শিয়াল রাজা ও উজিরকে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া চারটি কলাগাছ দেখিয়ে বলে, "ঐ চান, বাড়ি পুড়লেও চারগা থাম খাড়া অই রইছে"।

রাজা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে শিয়ালের ধোঁকায় পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারে এবং শিয়ালের দিকে বন্দুক সই করে। শিয়াল লেজ খাড়া করে দৌড় দেয় এবং মনে মনে বলে "আমার ওয়াদ্দা আমি শেষ কইচ্ছি, অন যাই"। রাজা চিন্তা করে দেখে এখন মাইয়া ফিরিয়ে নিলে কলঙ্ক হইব। তাই উজিরকে নির্দেশ দেয় টাকা-পয়সা নিয়ে এসে জামাইকে একটা দালান বানিয়ে দেওয়ার জন্য। দেশে গিয়ে তারা বাড়ি পোড়া যাওয়ার কথাই বলে।

দালান তৈরির পর রাজা মেয়েকে পাঠায়। শিয়ালের বুদ্ধিতে গিরস্ত রাজার জামাই হয় এবং দালান কোঠা পায়।

[লেখক : শহিদুল ইসলাম, ট্যাক্সি চালক, মনোহরগঞ্জ]

কাহিনির লোকঐতিহ্যিক নান্দনিকতা : বাংলাদেশের কিচ্ছা কাহিনিতে শেয়ালকে পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান পরিচয়ে পরিচয় করানো হয়েছে। এ কাহিনিতে শিয়ালের চমৎকার উপস্থিত

বুদ্ধির পরিচয় পাই। গল্পটি মূলত শিশু কাহিনি হলেও বয়স্করাও এর থেকে আনন্দ পেয়ে থাকে। নাতি নাতনীদের শোনানোর জন্য সাধারণত দাদি-নানিরা এ কাহিনি সৃষ্টি করেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

পশুরা যে মানুষের জীবনসূত্রে নানাভাবে যুক্ত হয়ে আছে এ গল্প থেকে তা বোঝা যায়। এই গল্পের শিয়াল তার মুক্তিদাতা গিরস্তকে যে কথা দিয়েছিল সে কথা পশুটি রেখেছে। মানুষ যদি পশুটির বিশ্বস্ততা থেকে শিক্ষা নেয় তাহলে মানব সমাজ সুন্দর হবে।

সাধারণ লোককাহিনি

দুই বাটপাড়ের গল্প

এক বাটপাড় তিন রাস্তার মাথায় একটি মাটির পাতিলে পানি দিয়ে ফুটাতে চায়। পানি ফুটতে থাকে। সে গিয়ে পাশে বসে থাকে। আরেক পথিক আইয়া কয়, "ভাই, আমি দুই দিনের উপাস। তোমার 'পাইল্লার' (পাতিলে)' চাইরগা চাইল (চাল) দিতাম চাই"। বাটপাড় কয়, "দিতে পার, আমিও দুগ্গা চাইল দিছি"। মনে মনে কয়, "আমি ত চাইল দিই নি, তয় হেতের চাইলেই দুইজনে খাইতে পারুম"। পথিক বাটপাড়কে পিছ দিয়ে পাতিলের ঢাকনা খুলে কোচ্ছা (কোচড়) ঝাড়া দেয়। আসলে কোচ্ছায় কিছুই ছিল না। কতক্ষণ পর পানি শুকিয়ে পাতিল শব্দ করে ফেটে যায়,

বাটপাড় : (পথিককে) তুমি চাইল দেওন।

পথিক : তুমি দেওন?

বাটপার : আমি বুইঝছি তুমি দিছ

পথিক : আমি বুইঝছি তুমি দিছ

বাটপাড় : তুমিও দিলানা, আমিও দিলামনা

পথিক : তোমার নাম কী?

বাটপাড় : আমার নাম বাটপাড় তোমার নাম কী?

পথিক : আমারে 'বাটপাড়ের বাপ' কয়।

এ ঘটনায় দুই বাটপাড়ে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। দুজন একদিকে যেতে থাকে। রাস্তায় দেখে এক হাইল্লাকে। হাইল্লা তার এক গরুকে পিটিয়েও শোয়া থেকে উঠাতে পারছেনা। এই ঘটনায় তারা হাইল্লার কাছে যায় খাওনের ধান্ধায়।

বাটপাড় : তোমার গরু উড়ে না। উঠাই দিতে পারলে আমাগোরে পানিকাঞ্জি খাওয়াইবানি?

হাইল্লা : খাওয়াইমু।

তারা খালের কিনারা থেকে 'দলা' পাঁক মাটি নিয়ে আসে। এই আঠাইল্যা মাটি গরুর গায়ে লেপে দেয়। মাটি শুকিয়ে টানটান হলে গরু লাফ দিয়ে উঠে। হাইল্লা খুশি হয়ে বলে,

হাইল্লা : ঐ তাল গাছ ওয়ালা বাড়ি আমাদের। পশ্চিম ভিডার ঘর আমাগো। মার কাছে যাইয়া কইলে নাস্তা পানি খাওয়াইবো।

বাটপাড়ের বাপ : (হাইল্লাকে) এউগগা বালা গরু কিনতারো না?

হাইল্লা : ষাইট টিয়া (টাকা) জমাইছি। আরো কিছু টিয়া অইলে এগগা ভালা গরু কিনুম।

দুই বাটপাড় কথা বলতে বলতে হাইল্লার বাড়ির দিকে যায়।

বাটপাড়ের বাপ : ভাত পানি খাওনের তুন টিয়াডা পাইলে ভালা অইতো।

বাটপাড় : কেমনে পাওন যায়?

বাটপাড়ের বাপ হাইল্লার মাকে কয়, "খালা আমনের পুতে আমাগোতুন এউগ্‌গা গরু কিনছে। ঐ যে সাদা গরুডা ষাইট টিয়া দি লইছে। ঘরতুন টিয়াডা দিত কইছে। গায়ের কাঁদা শুকিয়ে তখন গরুটা সাদা দেখাচ্ছিল। হাইল্লার মা আশ্চর্য হয়ে মাঠে পুতের দিকে চেয়ে থাকে। বাটপাড়ের বাপ বলে, (হাইল্লাকে) দিতে চায় না, দিতে চায় না"। তখন পুত মাঠ থেকে চিৎকার দিয়ে মাকে বলে, দেও মা দেও। মা ঘর থেকে ৬০ টাকা বের করে দিলে দুই বাটপাড় তাড়াতাড়ি চলে যায়।

হাইল্লা খালে গরু গোসল করিয়ে বাড়িতে আনে। মা বলে ৬০ টাকার কিনা সাদা গরু কোথায়। হাইল্লা কয় গরু কিনলাম কখন? তখন মা ঘটনা বললে হাইল্লা বুঝে যে সে বাটপাড়ের কবলে পড়েছে। আসলে হাইল্লা তার মাকে নাস্তা পানি দিতে বলেছিল।

[কথক : আব্দুল হাই, দিশাবন্দ, মনোহরগঞ্জ]

কাহিনির বর্তমান উপযোগিতা : এই গল্পটিতে দুই প্রতারকের কাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলার তৎকালীন সমাজ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামের সহজ সরল মানুষের পাশাপাশি একটি প্রতারক শ্রেণি সব সময়ই এদেশে ছিল যা তারা যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই গ্রহণ করেছে। এই গল্পের দুই বাটপাড় বা প্রতারক মূলত অভাবের তাড়নায় এবং সামান্য ভাত পানির জন্য প্রতারণা করেছে।

এই গল্পে তথ্যের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। হাইল্লার ৬০ টাকা জমানোর তথ্যটি জেনে তা কৃষকের মায়ের নিকট বলতে পারাতেই তারা টাকাটা হস্তগত করতে সমর্থ হয়।

রাজা ও রাক্ষস

বিশেষ দ্রষ্টব্য : গল্পটি আঞ্চলিক ভাষায় উপস্থাপন করা হলো–

এক দেশে আছিল এক রাজা। তার নাম হীরা লাল। রাজার স্ত্রী ও কন্যা লইয়া সুহে শান্তিতে বাস করতাছিল। হীরা রাজার রাইজ্য জুইড়া কোন অবাব অনটন আছিল না। প্রজারাও বেশ আনন্দে দিন কাটাইতাছিল। এই সময় এই রাইজ্য এক ভয়ানক বিপদ আইয়ে। কয়েকজন কামলা ক্ষেত গেছিল কাম করনের লাইগ্যা। এমুন সময় এক রাইক্কস আইয়া দুই চাইর জন কামলারে ধইরা ঘাড় ভাইঙ্গা খাইয়া লইল। বাকি কয়জন কামলা দৌড়াইয়া পলায়াইয়া বাচ্‌ল কোন মতে।

রাইক্কস উঁচা গলায় চিল্লাইয়া কইল তরার রাজারে গিয়া কইছ্ প্রতিদিন আমার লাইগ্যা একজন কইরা মানুষ পাডাইবি না অইলে রাইজ্যের ভিত্‌রে হানা দিয়া যা মনে দরে তা খাইয়ালামু। কোনমতে জান বাঁচাইয়া যেই কয়জন মানুষ রাইজ্যে ফিরছে, তারাগিয়া রাজারে দুঃসংবাদটা দিলে রাজা বেশ রাগইল।

রাজা বেশ কয়জন সৈইন্য হেই পাহাড়ের উপরে পাডাইলে রাইক্কস বেশ রাগইয়া যায়, আর লগে লগে হগল সৈইন্যরে ধইরা খাইয়া লয়। রাজা খুব চিন্তার ভিত্‌রে পড়ছেন। প্রতিদিন রাজা একজন কইরা মানুষ পাডাইতে লাগল হেই রাইক্কসের কাছে।

রাজা একদিন রাইজ্যে ঢেরা পিইট্টা ঘোষণা কইরা দিল যে এই রাইক্কস রে মাইরা রাজার কাছে আনতে পারব হেয় রাজার অর্ধেক রাজ্য ও রাজ কইন্যারে পাইব। বেশ কয়জন স্বাস্থ্যবান যুবক এক এক কইরা রাজার আদেশে হেই রাইক্কস রে মারণের লাইগ্যা গেল, কিন্তু শেষ মেষ রাইক্কসের প্যাডের ভিত্‌রে গেল খাইদ্য অইয়া।

একদিন এক রাখাল বালক তার কাছে আইয়া কইল রাজা মশাই আমি যায়াম হেই রাইক্কসরে মারতে। রাজা হুইনা কইল তোমার চাইতে কত বাগা বাগা বেডা আইত রাইক্কসরে মারতে গিয়া প্যাডের ভিত্‌রে গেলগা আর তুমি আইচ রাইক্কসরে মারতা। তহন মিনতি করে রাহাল বালক কইল রাজা মশাই আমারে একটা সুযোগ দ্যান। রাজা কইল ঠিক্ আছে যাও তোমাকে দিলাম অনুমতি। রাহাল বালক তহন আটতে আটতে গেল হেই পাহাড়ের দিকে। রাইক্কসদের সামনে গেলে রাইক্কস কইল কীরে এত দেরি কইরা আইলি ক্যান? রাহাল কইল আইতে দেরি অইল কারণ পতে আওনের সময় আপনের মতো একজন আমার পত আটকাইয়া আমাকে খাইয়া লইতে চাইছিল। আমি হের কাছ থেইক্কা অনুমতি লইয়া আপনের লগে দ্যাহা করতাম আইছি। তহন আপনেই কন আমি কোনদিকে যায়াম? কতাটা হুইন্না রাইক্কস চিল্লাইয়া উঠ্‌ল। কইল কার এত বড়ো সাহস তোর পত আটকাইছে, আমার খাওন খাইতে চাইছে? আমারে লইয়া যা হেই রাইক্কসের কাছে। এহন রাহাল রাইক্কসরে লইয়া গেল একটা কুয়ার পাড়ে। কুয়ার দিকে মুখ দিয়া তাকাইতেই রাইক্কস তার অনুরূপ রাইক্কস দেখ্‌ল কুয়ার ভিত্‌রে। রাইক্কস দেখল হেয় যেমন গর্জন করে কুয়ার রাইক্কসও টিক হেই রহম গর্জন কইরা উঠে।

এইভাবে রাইক্কস খেইপ্পা গিয়া লাফ দিয়া জলের ভিত্‌রে গিয়া পড়ছে। পড়ার পর রাইক্কস আর কুয়ার ভিতরের থেইক্কা বাইর অইতে পারল না। রাইক্কস মরল ডুইব্বা। রাহাল আনন্দে রাজার বাড়িত গিয়া কইল হেয় রাক্কসের মাইরা আইছে। হারা রাইজ্য জুইড়া আনন্দের ঢেউ উট্‌ল। বাড়িত বাড়িত খাওয়া দাওয়ার ধুম পড়ে গেল। রাজা রাহাল বালকরে ডাইক্কা অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার লগে তার বিয়া দিয়া দিল। হারা রাইজ্যে আনন্দের বন্যা বইয়া গেল। বর-কনে সুহে শান্তিতে বাস করতে লাগল। আর রাজা-রাণী আনন্দে দিন কাটাইতে লাগল।

আমার গল্প শেষ
গাঙ্গ দিয়া ভাইসা গেল সোনার গেলেস।

খ. কিংবদন্তি

মানুষ অলৌকিক-সংঘটনের প্রতি আদিমকাল থেকেই আস্থাশীল। অলৌকিকতার প্রতি যে আস্থা তা বর্তমানেও মানব সমাজে প্রতিভাত। ফলে কালভেদে সৃষ্টি হয়েছে নানান কিংবদন্তি। পল্লব সেন গুপ্ত যথার্থই বলেছেন যে, "লিজেন্ডও মিথের মতো দেশে-দেশে কালে-কালে একই ধরনের ছকে গড়ে ওঠে।"

বৃহত্তর কুমিল্লায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু কিংবদন্তি তুলে ধরা হলো,

গোমতী নামের কিংবদন্তি : গো-মুত (প্রস্রাব) থেকেই নাকি গোমতী নামের উৎপত্তি বলে কিংবদন্তি রয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম গোমতীর বিদ্রোহী রূপ দেখেন নি,

দেখেছেন আপন বেগে চলার মৃদু ছন্দ ও মন্থরগতি জল-কলতান। সে কলতান তাঁর চোখে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘুমের আবেশ। 'ছায়ানট' কাব্যের 'চৈতি হাওয়া' কবিতার একটি স্তবকে কবি গোমতীর কথা তুলে ধরেছেন—

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুমতী নদীর ঘুঙুর পরা পায়।

লাকসাম নামকরণের কিংবদন্তি : লাকসাম নামকরণের ইতিহাস অনুসন্ধানে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। একটি মতে ধারণা করা হয় যে, লাখ লাখ 'শামছ' এর আবাসস্থল ছিল বলে এর নাম লাকসাম হয়েছে। 'শামছ' আরবি শব্দ এবং এর অর্থ সূর্য। 'সূর্য' বলতে তখন আউলিয়া দরবেশদের বোঝাত। উল্লেখ্য যে, সারা লাকসাম জুড়েই বিখ্যাত পীর ফকির ও অলি আল্লাহর মাজারের সংখ্যাধিক্য এখনও চোখে পড়ে। তাই বহু বিচার বিশ্লেষণ করে রেলওয়ে জংশন এলাকার নাম লাকসাম রাখা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলের অসংখ্য ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যই এমন নাম হয়েছে। অসংখ্য ধনী লোক বোঝাতে লাখ বা লাক কিংবা বেশি টাকা বা লাখ টাকার অধিকারী বোঝাতে লাক কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে। আর কুমিল্লার অঞ্চলকে সাম দিয়ে বোঝানো হয় সঙ্গী, জন, মানুষ। এই অর্থে লাকসাম যুক্তিযুক্ত।

ডাকাতিয়া নামকরণের কিংবদন্তি : ডাকাতিয়া নদীর নামের উৎপত্তি নিয়ে বহু কথা প্রচলিত আছে। বয়স্কদের কাছ থেকে জানা গেছে যে পুরনো দিনে কোন গ্রামীণ কুলবধূ বাপের বাড়ি হতে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছিল। তখন দস্যু হার্মাদ লাজুক গৃহবধূরও হাতের কাঁকন কেড়ে নিয়েছিল। সেজন্য এ জলপথের নাম হয়েছে ডাকাতিয়া।

অপর একটি কিংবদন্তি মতে জানা যায়, রূপসী কোন বধূর প্রেমিক তাকে ভিনগাঁয়ে কারো বউ হয়ে যেতে দেয় নি। নিজ দলবল নিয়ে সখিকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই এ নদীর নাম হয়েছে ডাকাতিয়া। কেউ কেউ বলছেন যে, পূর্বে এ জনপদের লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম । নদী পথে নৌডাকাতগণ সুদূর মেঘনা পাড়ি দিয়ে উজানে আসতো এবং তারা বাণিজ্যবাহী নৌকার পণ্য সামগ্রী ডাকাতি করে নিয়ে যেত। তাই এ নদীপথের নাম হয়ে গেছে ডাকাতিয়া।

গ. লোকছড়া

লোকছড়া সাধারণত শিশুতোষ বলেই গণ্য করা করা হয়। তবে একথা সত্য যে, মনোরঞ্জন ও মানসিক বিকাশের নিমিত্তেই প্রধানত ছড়া রচিত হয়ে থাকে। ছড়ার সুষ্ঠু বিজ্ঞান ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করা দুরূহই বটে। তবু নিম্নোক্ত শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন– ছেলেভুলানো ও শিশুতোষ ছড়া, খেলার ছড়া, পারিবারিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক ছড়া, শ্রম ও পেশাভিত্তিক ছড়া, নীতি ও শিক্ষামূলক ছড়া এবং বিবিধ ছড়া।

ছেলে ভুলানো ছড়া

নাম থেকেই বোঝা যায় ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে রাখতে বা তার মনোযোগ অন্য দিকে ফেরাতে কিংবা তাকে বশে আনতে এ জাতীয় ছড়া ব্যবহৃত হয়। এ ছড়া ওই শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় যে নিজে হয়তো এখনও ছড়া কাটতে পারে না, তবে

বাবা-মা ও বড়দের মুখে শোনা ছড়ার সুর মাধুর্য তার মধ্যে এক ভাল লাগাবোধের জন্ম দেয়। এগুলোকে শিশুতোষ ছড়াও বলা যায়। আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা। চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। এই ছড়াটিকে এ জাতীয় ছড়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। নিম্নে কিছু ছেলে ভুলানো ছড়া দেখানো হল–

আমার নাহিদ বালা
দুধ দিয়া খায় কলা
লাডি দিয়া পলদ দিলে
ভোৎ কইরা দেয় পাদ।

তথ্যসূত্র : সানজিদা আক্তার মনি, গ্রাম : মহেশপুর, থানা : বরুড়া, কুমিল্লা, বয়স-১৪

আয় আয় চান
কলাগাছে বান
কলা অইছে বাতি
আবুর ঘরে নাতি।

তথ্যসূত্র : লাকী বেগম, মহেশপুর, বরুড়া, কুমিল্লা, বয়স-৩৬

ময়নাগো ময়না
পোলা(পুত্র) কিয়ারে (কেন) কান্দে?
শ্বশুর বাড়িত যাইতো
খাট পিড়ি কিন্যা দেয়াম (দেব)
পথে পথে যাইতো
আবের মেঘের ছাতি কিন্যা দেয়াম
ছায়ায় ছায়ায় যাইতো
দুধের বোতাল কিন্যা দেয়াম
পথে পথে খাইতো।
আমরার মনা ভালা
তেনা দিয়া খেলা।
তেনার ভিতরে গু
গাঙ্গ নিয়া ধু।
বাগেরে না ডড়াইয়া
হিয়াল রে না ডরাইয়া।
এক কড়াই তেল
ফাক্কা ভাইঙ্গা গেল।

ব্যাখ্যা : দাদা-দাদি, নানা-নানি নাতি নাতনীদের কোলে নিয়ে আদর করতে করতে এই ছড়া বলতে থাকে। এই ছড়াগুলো একান্তই অর্থহীন, কেবল ছন্দময় এই ছড়া বলে বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

টুনটুনিগো পাখি
নাচ গো দেখি
না বাবা নাচব না

বড় কালে বাঁচব না
বড়াপুর (বড় আপুর) বিয়ে
কচকো সাবান দিয়ে
এ কচকো ভাল না
বড়াপুর বিয়ে হবে না।
মুন্দি (মেহেদী) গাছ উডছিলাম
ডাল ভাইঙ্গা হড়ছিলাম (পড়েছিলাম)
আছমা তোর মা কই?

নদীর কূলে।
রানবে কেডায়?
মইরম বুবু।
খাইব কেডায়?
দুলাভাই শালায়।

বাঁশ কাডে (কাটে) টুনড়বুর টুনড়বুর
ঝিংলা কাডে মদিনা
আমার বোন ছকিনা
নাচতাম জানি না
নাচতাম (নাচতে) গেলে
শরমে ধরে
টাডিং টুডি
লতি লতি বিলাতি
কাপড় একটা দশাতি (দশ হাত পরিমাণের)
টানে টুনে বলে না (বাড়ে না)
পালকি ছাড়া চলে না
পালকি যাবে 'কোনান দি' (কোথা দিয়ে)
ওয়াকসাবের ঘাডা দি
ওয়াকসাবের নাম কি?
দশাত (দশ হাত) খানকি।
যা গো বাড়ি যা
মামুর বাড়িত যা
মামু দিল খই মুড়ি
পেট ভরিয়া খা।
আয় চাঁদ লড়িয়া
কলা দিমু পাড়িয়া
কলার ওপর বাতি
আবুর ঘরে নাতি।

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত ছড়াই ছেলে মেয়েরা কাঁদলে তাদের কেটে শোনানো হয়। দেখা গেছে এ জাতীয় ছড়াগুলো শুনে ছেলে-মেয়েরা তৎক্ষণাৎ হেসে ফেলে। সাধারণত শিশুদের বাবা-মা বা ফুপুরা এ জাতীয় ছড়া বলে, দাদিদেরও একাজে দেখা যায়। তবে শুধু ছড়া বললেই হয় না, শিশুদের কোলে নিয়ে বা শোয়া অবস্থায় পায়ের মধ্যে রেখে অঙ্গভঙ্গি করতে হয়।

ঐ রে ঐ
ভাজ্জা রাখছি খৈ।
আল্লা দুধে চাম্পা কলা
আয়রে মনা ক্ষিধের বেলা।
আয় চান লড়িয়া
ভাত দিমু বাড়িয়া।
চান্দের কপালে চান্দ
টিপ দিয়া যা,
আমডার মনার চোখে
ঘুম দিয়া যা।
তৈ, তৈ, তৈ মামার বাড়িত যাই
মামি দিলো দুধ ভাত
পেট ভইরা খাই
মামা এলো লাঠি নিয়ে
পালাই পালাই।
হাটি হাটি পায় পায়
যেখানে ইচ্ছা সেখানে যা।

দাদা-দাদি, নানা-নানি, নাতি-নাতনীদের কোলে নিয়ে আদর করতে করতে এই ছড়া বলে থাকে। এই ছড়াগুলো বাচ্চাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে রচিত।

আবৃত্তিমূলক ছড়া

অলদি গাছের গোড়াতে
লাল পাখিটা ডেকেছে।
এত ডাকা ডাইকো না
স্বামীর গলা ভাইঙ্গো না।
স্বামী গেছে বিদেশে

লাড়ু কিন্যা পচাইছে।
এই লাড়ু খাব না
মাইয়া বিয়া দেব না।
মাইয়ার নাম দুধের সর
কেমনে যাব পরের ঘর।
পরে যদি মারে
চোখের পানি পড়ে।
চোখের পানি বেইচ্যা
বউ আইন্যাম নাইচ্যা।
বউয়ের নাম খুন্দুনী
ভোৎ ভোৎ পাদুনী।

তথ্যসূত্র : সুমন হোসেন, তালুকপাড়া, বরুড়া

সুমাইয়াগো সুমাইয়া
রাইতে থাকবো ঘুমাইয়া
দিনে থাক চাইয়া
মেম্বারের মাইয়া
আম খাইলে আমেশা
জাম খাইলে জামেশা
বিচি খাইলে পেট ব্যথা
সিগ্রেট খাইলে ক্যান্সার।

আকাশের তারা
ঝিকিমিকি করে
বাবনুর মেয়েরা
ছি-কুতকুত খ্যালে।
ও ডিস্কো ভাবি
পিঠা বানাতে যাবি
পিঠা নিছে চোরে
জামাই আইয়া ঘুরে।
জামাইর নাম জব্বর
আল্লাহু-আকবর।

তথ্যসূত্র : রাণী আক্তার, ছিকুটিপাড়া, বরুড়া

আমার একটি মুরগি ছিল
চিকচিক করে মারা গ্যালো
হায় আল্লাহ কি হলো!
ধান থেকে চাল হলো।

দুধে কি মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি

কোদাল হল বাঁকা
কামারকে ডাকা।

কামার বললো পারবো না
একজনকে সাক্ষী রেখে
বলছি তোমায় আমি
ডিপজল তোমার স্বামী।

টিপ টপ আলুর টপ
লিচু বাগানে
একটা লিচু পড়ে আছে
চা দোকানে।

দোকানদার দোকানদার
দরজা খোল না
ইস্টিশানে বউ আছে
ঘরে তোল না।

কুতকুত আছে কুতকুত নাই
বাঘের দুইটি চোখ নাই
যদি চোখ থাকতো
আরো ভাল লাগতো।

আম পাতা ভাই কুলসি
মাইয়া বিয়া দিবেন নি
দ্যায়াম দ্যায়াম সাজাইয়া
ডেগের ওপর বসাইয়া।

ডেগের ভিতরে দুধ-ভাত
খাইবেন নি গো পরের ভাত
পরে যদি মারে
চোখের পানি পড়ে।

ব্যাখ্যা : ছড়াটির শেষাংশে নারীজীবনবাস্তবতার করুণ চিত্রটি উঠে এসেছে কোন এক কিশোরীরই কণ্ঠে। অধিকাংশ নারীকেই অন্যের অধীনস্থ হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এজন্য অনেক সময় স্বীয় স্বামী কর্তৃক প্রহারের শিকারও হতে হয়, তবু করার কিছু থাকে না।

শীত করে গো সীতার মা
খেতা দেওগো বিন্দার মা।
খেতা নিলো চোরে
কাপতে কাপতে মরে।

ব্যাখ্যা : প্রচণ্ড শীতে গ্রামীণ লোকজনের দুর্দশা প্রসঙ্গে এ ছড়ার উদ্ভব হয়েছে।

কইতর রে কইতর
বাড়া বান
বানতেয়াছি অড়া ধান
অড়া ধান বেইচ্যা
বউ আনলাম নাইচ্যা
বউ গো বউ কি রানবা
ইলিশ মাছের ঝুল
গারোগা আইছে মাইয়া চাইতো
চাইরডা আনে চুল
চুলে করে টেপের টুপুর
কে কর খাইয়া
হড়ি বউয়ে কাইজ্জা লাগছে
মুতের টোহা লইয়া
মাইয়ার মাগো বেতুনি
মাইয়া বিয়া দিবানি
দেয়াম দেয়াম সাজাইয়া
টেহা লয়য়াম বাজাইয়া
টেহার উপর নাইচ্চা
দেশটা দিলাম বেইচ্যা।
যিনি বামপা
গলায় গামছা
হাতে বালতি
কালকির কলসি
পটল কোরী
ভাল ভাল তরকারি
আবে যাবে
বিস্কুট খাবে
এই বিস্কুট না খাইলে
মারা যাবে।

কইতর-কবুতর
বানতাছি-বানছি
নাইচ্যা-নেচে
হড়ি-শ্বাশুড়ি
টোহা-কৌটা

দেয়াম-দেব
টেহা-টাকা
নাইচ্চা-নেচে
বেইচ্যা-বেঁচে

পুতুল খেলার ছড়া/ধুলাবালি দিয়ে ভাত রাঁধার ছড়া

হলদি কুড়ি মরিচ কুড়ি
জোড় পুতুলের বিয়া
মা তুমি কান্দো কেন
দুয়ার বারি দিয়া
যার বউ হেতে নেবে
গয়না-গাড়ি দিয়া।

তথ্যসূত্র : পাপড়ি, ৩য় শ্রেণি, মহেশপুর, বরুড়া

শিক্ষামূলক ছড়া

এই ছড়াগুলোর বক্তব্য বিষয়ে শিক্ষাচেতনার প্রকাশ দেখা যায়। শিশুদের চারপাশের জীবন জগতের বাস্তবতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যের অন্তরস অবলোকনের পাশাপাশি শিক্ষার তাৎপর্যও তারা অনুধাবন করেছে। তাই এ ছড়াগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তাদের ছাত্রজীবন, পড়ালেখা ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ-প্রতিবেশ। বলা প্রয়োজন, এগুলি আধুনিক স্কুল পাঠ্য সচেতন শিশুরা রচনা করেছে। এই ছড়াগুলোর ভাষা তাই মার্জিত, শৃঙ্খলিত। শিক্ষার গুরুত্ব যে কোমলমতি ছেলে-মেয়েরাও উপলব্ধি করতে পেরেছে এ ছড়াগুলো সে কথাই বলে। এ রকম কিছু ছড়া হলো–

ফুলের সাথি প্রজাপতি-
চাঁদের সাথি তারা
আমার সাথি নাইরে কেউ
লেখাপড়া ছাড়া

[জোসনা, রাজামারা, বরুড়া]

আমার এ্যাকটা ছোট ভাই
বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নাই।
খাইতে গেলে খায় খায়
অল্প দিলে নাহি খায়।
ইতিহাস তো দূরের কথা
অঙ্ক দিলে মাথায় ব্যথা।

[শাওন, দরগারনামা, বরুড়া]

লেখা মোদের খেলার সাথি
পড়া মোদের ভাই
করবো মোরা লেখাপড়া
তাই স্কুলে যাই।

এক দুই তিন চারি
করিও না মারামারি
পাঁচ, ছয়, সাত আট
সবাই মিলে শিখি পাঠ।

সংখ্যা সংশ্লিষ্ট ছড়া

গাণিতিক অঙ্ক ও সংখ্যা প্রতীকের উল্লেখ রয়েছে যেসব ছড়ায় সেগুলোকে 'সংখ্যা সংশ্লিষ্ট ছড়া' বলা হয়েছে। মূলত এ বিভাজনের আর কোনো গভীরতর তাৎপর্য নেই। বালক-বালিকারা গণনা শেখার পর থেকেই নিরস গণনার বিষয়টি নিয়ে ছড়া বানিয়ে এতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন খেলায় এক, দুই, ইত্যাদি উচ্চারণের ও নিজস্ব রীতি রয়েছে ছেলে-মেয়েদের। এরকম কিছু ছড়ার পরিচয় তুলে ধরা হল–

যখন ছিল দুই পাত
যেহানে খুশি সেহানে যাও
যখন অইল চাইর পাও
ভাত-কাপড় দিয়া যাও।
যহন অইল ছয় পাও
আব্বা আমারে লইয়া যাও।

তথ্যসূত্র : সুফিয়া বেগম, বয়স ৬০, মহেশপুর, বরুড়া

ব্যাখ্যা : ছড়াটিতে বিবাহপূর্ব এবং বিবাহোত্তর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। বিয়ের পূর্বে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছেমতো চলতে পারলেও বিয়ের পর তাকে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন মেটানো ও দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে হয়।

এক-এ ইন্দুর (ইঁদুর)
দুই-এ বিন্দুর
তিন-এ তেঁতুল
চাইর (চার) এ সাইফুল
পাঁচ এ প্যাঁচা।

প্রশ্ন ও উত্তরমূলক ছড়া

এগুলোকে শিকলি ছড়াও বলা যায়। কারণ প্রশ্ন ও উত্তরের ভেতর দিয়ে এগুলোতে একটি ধারাবাহিক গল্প তৈরি হয় যা একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কযুক্ত। প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেই উত্তরকে ভিত্তি করে পরবর্তী প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এভাবে একটি চেইন বা শিকল তৈরি করে। প্রশ্ন ও উত্তরের ধরন দেখে মনে হয় একজন প্রশ্ন করছে এবং অন্যজন উত্তর দিচ্ছে। আসলে এখানে ছন্দের গতি এত দ্রুত যে আবৃত্তিকারী-ই প্রশ্ন করে এবং উত্তর দেয়। তবে দুজনে মিলে ও এর চর্চা করা যেতে পারে। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো,

ওখানে কে রে?
আমি খোকা
মাথায় কী রে?
আমের ঝাঁকা
খাসনে কেনরে?
দাঁতে পোকা।
বিলোসনি কেন রে?
ওরে বোকা।

তথ্যসূত্র : জান্নাতুল মাওয়া, মহেশপুর, বরুড়া

এখানে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে দিয়ে বোঝা গেল যে, খোকার দাঁতে পোকা থাকলে ও আম দিয়ে দেওয়ার মতো বোকা সে নয়। আসলে কাউকে না দেওয়ার জন্যই তার এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত ছড়া

এসব ছড়া শিশুরা পরিচিত ভাষা হিসেবে ইংরেজির যে প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে গ্রামের অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত ছেলেরাও মুক্ত নয়। বাংলা ইংরেজি এখানে একত্রিত

হয়েছে প্রধানত ছন্দের মাত্রা ও লয় বজায় রাখার জন্য। তবে কিছু ছড়ায় ইংরেজিকে কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতেও দেখা হয়েছে। বরুড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু নমুনা দেখাই,

টম এন্ড জেরি
পিয়া পিয়া বেরি
বাবা ওহ ওহ ওহ!
বাবা ছি ছি ছি!
বাবা ওহ!
বাবা ছি!
অরেঞ্জ কমলা পেপসি। [নীলা, মহেশপুর, বরুড়া]

আকাশ 'তুন' (হতে) নাইম্যা আইলো
ছোট্ট এক প্লেন
সে প্লেনে বসে ছিল
লাল টুকুটুক মেম
মেমকে আমি জিজ্ঞাস করলাম
হোয়াট ইজ ইউর নেম!
মেম আমাকে উত্তর দিল
মাই নেম ইজ সায়মা।

উদ্ভট ছড়া

ছড়া স্বাভাবিক ধর্মেই উদ্ভট। তবে কিছু ছড়া রয়েছে যেগুলিতে উদ্ভটতা মাত্রাতিরিক্ত বা অলৌকিক পর্যায়ের। বাস্তব সত্যের ছিঁটোফোঁটাও এগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলোতে রয়েছে অতি আশ্চর্যের চমৎকৃতি। বরুড়া উপজেলায় এ জাতীয় কিছু ছড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন,

পান খাইতে সুপারি লাগে
আরও লাগে চুন।
হাদা খাইলাম চৌদ্দ পারি
এলাচি তিন মণ।
আপেল শক্ত,
বেদানা রক্ত,
আঙ্গুল ঝরঝর
হ্যালো হ্যালো, কী হলো?
ছেলে হলো!
ছেলের নাম কী?
তেলে ভাজা নিমকি।

বড় ভাইয়ের বউগো
বিছনা পাতি তুলগো
বিছনার তলে ধুরা হাফ
ভাবি কয় আমার ছাও।

সই গো সই
দুঃখের কতা কই
ছোট্টু বেলা মা মরছে
বাপে করছে রিয়া।
সৎ মা ভাত দেয়
তিনগা ঝারা দিয়া।

শীত করে গো সীতার মা
খেতা দেওগো বিন্দার মা।
খেতা নিলো চোরে
কাপঁতে কাঁপতে মরে।

তারা তারা সাত ভাই
তারা মরলে কেউ নাই
গরু মরে ঘাসে
মান মরে ভাতে।
এমুন রইদ উঠবি
বসু মাতা ফাটবি।

বিলাই গেল বাণিজ্যেতে
উত্তম অইল বাড়ি
তারে বিয়া করতে গেল
ভাঙা তেলের গাড়ি
তামুক তিন চোঙ্গ।
ছোট জালে উইঠ্রা বলে
বড় জাল গো দিদি
আজকা ঘর তামুক নাই
কিয়ের রান্ধা বাড়ি
তামুক তিন চোঙ্গা।

এক ঘরে দুই সতীন থাকলে
কথায় কথায় বিবাদ করে
স্বামী পড়ে ভীষণ কেড়ে
রাই বেডি জ্বালায়
কোন একটা অইলে পড়ে
দুই ঘরে দুই বিছনা করে
স্বামী বসে চিন্তা করে
যাইব কার বিছনায়?
কেবলা টিক্কা জ্বালায়, তামুক ভরে
নাইব কলি হুক্কায়।

ধাঁধামূলক ছড়া

এই ছড়াগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ থাকতে হয়। একপক্ষ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় এবং অপরপক্ষকে মাথা খাটিয়ে সন্তোষজনক জবাব দিতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের হিসেবে এগুলোকে প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়াও বলা যায়। তবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করলে প্রতিপক্ষের যে বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এ ক্ষেত্রে এমন আশঙ্কা দেখা যায়। তাই এ জাতীয় ছড়াকে ধাঁধামূলক ছড়া বলা যেতে পারে। বরুড়া থানায় এ জাতীয় ছড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

আকাশেতে তিন তারা
আমার নাম জায়েনারা
আমি কী জানি
ঠাণ্ডা লেবুর পানি।
এসন তো দুলা ভাই
বসেন তো চেয়ারে
কনতো দুলা ভাই
শরবত খাটতে
কী কী লাগে?
দোকানের চিনি লাগে
বাগানের লেবু লাগে
টিউব ওয়েলের পানি লাগে
বড় ভাবির হাত লাগে।

তথ্যসূত্র : রীনা আক্তার, তালুকপাড়া, বরুড়া

একপক্ষ : আলিফ, বে, তে
আমার গামছা নিছে কে?
অপরপক্ষ : জিম, হা, খা
আমার গামছা দিয়া যা।

মন্ত্রাচ্ছন্ন ছড়া

এই ছড়াগুলোতে মন্ত্রের কুহক মিশ্রিত থাকে। মন্ত্রের মায়া ও ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই এদেরকে মন্ত্রাচ্ছন্ন ছড়া বলা হয়েছে। এগুলোকে ঐন্দ্রজালিক ছড়াও বলা যায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা নাগালের বাইরের বিষয়কে অনায়ত্ত করতে ছড়াগুলোতে মন্ত্রের ধর্ম আরোপ করেছে। এ জাতীয় ছড়াও বরুড়াতে দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন—

জাগরে পোন জাগ
রাইত পোরাইলে আগ
জাগরে পোন জাগ
রাইত পোয়াইলে আগ।

তথ্যসূত্র : মাজেদ, মহেশপুর, বরুড়া

শীত আমার ভাই
শীতের কাছে কইও আমার
খ্যাঁতে (কাঁথা) কাপড় নাই।
পাঁচ পইসা দি কিনলাম সুই
খ্যাঁতা (কাঁথা) সিলাইলাম বছর দুই
আমার খ্যাঁতায় এমনি ওম
শুইতে শুইতে আসে ঘুম।

ব্যাখ্যা : এই ছড়া কেটে মূলত কাঁথায় ওম আনার চেষ্টা করা হয়।

আতি ঝাড়া কাতি ঝাড়া
কাউয়ায় (কাকে) হাগে (মলত্যাগ করে) ছড়া ছড়া
হাইলকায় (শালিকে) হাগে দই
এমন ঝাড়া ঝাড়াইলাম
হিয়ালের (শিয়ালের) পুটকি (মল্লার) সহ সই।

ব্যাখ্যা : কোন ছেলে-মেয়ে পায়খানা করতে থাকলে ঝাড়ফুঁকে তা বন্ধ করতে দুষ্টুমি করে এমন মন্ত্রাচ্ছন্ন ছড়া ব্যবহৃত হয়।

আঙ্গো (আমাদের) বুড়ি বাইন্যা
মাছ ধইরমু টাইন্যা।

ব্যাখ্যা : কয়েকজন মিলে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গেলে এ ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া

লোকজীবন আচার-অনুষ্ঠান ঘনিষ্ঠ। আর এসব আচার অনুষ্ঠানাদি পালনের বিশেষ কিছু রীতি পদ্ধতি থেকেই লোকছড়ার একটি বড় অংশ উদ্ভুত হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ব্রতাচারে ছড়ার ব্যবহার রয়েছে। বিবাহ রীতি, মেঘ-মাগনের উৎসব, পূণ্যাহ-পার্বণ ইত্যাদি নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে এসব ছড়া প্রযুক্ত হয়। নিম্নে দু'একটি ছড়ার নমুনা দেখানো হল,

অলিফ বা তা
দুলা আইছে, রিয়া করতো
তোমরা আইছো কা?
আইন, গাইন, পেশ
দুলা আমরার খেশ।

তথ্যসূত্র : খাদিজা, ৭ম শ্রেণি, মহেশপুর, আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মহেশপুর, বরুড়া

ব্যাখ্যা : বিবাহের অনুষ্ঠানে পাত্রিপক্ষের কিশোরীরা এ জাতীয় ধাঁধামূলক প্রশ্ন করে বরপক্ষকে বেকায়দায় ফেলতে চায়।

কনেপক্ষ : আসসালামু আলাইকুম এন
দুলা আইছে বিয়া করতো
আপনারা আইছেন ক্যান?

বরপক্ষ : ওয়ালাইকুম ওবা

দুলা আইছে বিয়া করতো
আমরা আইছি শোভা।

নানা প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শেষে হিন্দু নর-নারীরা এ জাতীয় ছড়া বলে থাকে। এ ছড়াগুলোই আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া বলে পরিচিত।

গড়াই পূজার ছড়া

আমপাতা চালিতাপাতা
ঘর নুয়াই আড়াই পাত।
যদি ঘর গঙ্গায় যায়,
বান্দির পাত বইয়া খায়।
আমিনা রে কু।

ব্যাখ্যা : গড়াই পূজার দিন হিন্দু বিধবা রমণীরা ঝড় তুফান থেকে তাদের বাড়ি ঘর রক্ষার জন্য এই ছড়া বলে থাকে।

ক্ষেত্রপাইলের ব্রতের ছড়া

ওঠ ওঠ সূর্য ঠাহুর
ঝিকি মিকি দিয়া।
উঠতে যদি না পারো
বিমলারে লইয়া।
বিমলা গো পঞ্চ কইন্যা
দানে দিল বিয়া।
খাওয়াইলা লওয়াইলা
কেমনে দিলা বিয়া?

ব্যাখ্যা : ক্ষেত্রপাইলের ব্রতে হিন্দু রমণীরা ক্ষেত্রে গিয়ে পূজা দেয় ক্ষেত্রের ফসল বাড়ার জন্য পাশাপাশি তারা এই ছড়া বলে থাকে।

জীবন দর্শনমূলক ছড়া

ছিঁড়া কাপড় টাইন্যা পরে
সেই বাপের বেটি
চুল ফুলাইয়া চুল বান্দে
সেই আস্ত নটি।

আমতলার ঝাম্মুর ঝুম্মুর
জাম তলায় বিয়া
ওই আসছে বাইন্যার (বনিকের) ছেলে
গামছা মুড়ি দিয়া (গামচা পেঁচিয়ে)
এই গামছা নেব না

মাইয়া বিয়া দেব না
কাঁচা মাইয়া দুধের সর
ক্যামনে করবে পরের ঘর

তোমার খাতার প্রথম পাতায়
এঁকে দিলাম আলপনা
আমার ছবি কইবে কথা
যখন আমি থাকব না।

মেয়েলি ছড়া

এই জাতীয় ছড়াগুলোতে মেয়েমনের সুখ দুঃখ ও জীবন কথা বিধৃত থাকে। বিশেষত বিবাহ উত্তর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, নানা নির্যাতনের বিপরীত প্রান্তে বাপের বাড়ির প্রিয় বাবা-মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে এসব ছড়া রচিত হয়েছে। এগুলোতে নারীমনের নানামুখি পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,

চিড়া কুটলাম মিড়া কুটলাম
দাদার কাছে যাই
দাদা দিল ক্যাৎকুৎ (কাতুকুতু)
মার কাছে যাই।
মা দিল তেল সিন্ধুর
বাপের কাছে যাই
বাপ দিল বিয়া
কোন শালারা নিয়া গেল
ঢোলে বাড়ি দিয়া।

বাঁশ পাতা লড়ে চড়ে
স্বামীর কথা মনে পড়ে
যদি সীমা যেতে চাও
এখন চিঠি পাঠাইয়া দাও
চিঠির ওপর বাংলাদেশ
আম্মু আমাদের খেলা শেষ।

আইচো বেয়াইন বইসা যাও
দুঃখের কথা হুইন্যা যাও
তোমার মাইয়া পাড়া বেড়ায়
লোকের সাথে কথা কয়
তা কী আমার পরাণে যায়?

আইল জামাই নিব ঝি
মার পরাণে করব কী?
মাগো মা কাইন্দো না,

সামের গলা ভাইঙ্গো না।
সাম রইছে নদীর কূল
ছিইট্টা পড়ে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইয়ে আনন্দে।

ব্যাখ্যা : আদরে পালিত মেয়েকে বিদায় জানানো স্নেহাতুর মার জন্য যে ভীষণ বেদনাদায়ক এই ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে
দেখরে মায়ের হাসি
মা থাকে ফুলের মাঝে
তাইতো ফুল ভালবাসি!
রাগ করো না বৌদি ওগো,
বলি দুটো কথা।
মোদের যেন পর ভেবোনা,
দিয়া প্রাণে ব্যথা।
কলি কালের এমনি ধারা
বলে রাখি তাই।
পরের মেয়ে ঘরে আনলে
পর কইরা দেয় ভাই।

পান খাওনি, চুন খাওনি
কবিরাজের বউ
কবিরাজ মইরা গেলে
পান পাইবা কই?

ফুল ফুটে বাগানে
প্রেম করে গোপনে।
প্রথম প্রেম ভেঙে গেলে
সুখ হয় না জীবনে।

রাজা রাইজ্যত নাই
পসারীর দোকানে নাই।
হায় প্রবু কল্লেন কী?
প্রভু খুঁজলে দিব কী?

ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ছড়া

এ জাতীয় ছড়াতে ইতিহাস আছে, ক্ষেত্র বিশেষে ইতিহাস আশ্রিত কিংবদন্তিতেও এসব ছড়া ভরপুর থাকে। তবে সেই ছড়াকে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক সত্য ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। তাই এসব ছড়াকে শুধু ঐতিহাসিক না বলে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ছড়া বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পর্বকে

নিয়ে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ছড়া সৃষ্টি হয়। বরুড়া উপজেলার মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মচারী জহিরুল হকের নিকট দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ছড়া পাওয়া যায়। প্রথম ছড়াটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক,

শোন গো বন্ধু শোন
বঙ্গবন্ধুর গুণ
রাশিয়ার প্যাঁচের হুক্কা
ভারতের আগুন। [জহিরুল হক, বয়স ৪০, গ্রাম-মহেশপুর]

এখানে মুক্তিযুদ্ধ পর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফল নেতৃত্বদানের কথা বলা হয়েছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নানামুখি অসহযোগিতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু ভারত ও রাশিয়ার সহযোগিতায় বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন।

আউলা ঝাউলা পাকিস্তান
দেশে আইলো ইরিধান
ইরি ধানের গন্ধে
নয়া বধু কান্দে।

'কচাইন বলে' ছড়া / হার-জিতের ছড়া

একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে
পঞ্চাশে পঞ্চাশে কত?
একশ
তুই আমার পাদের বাক্স।
কচাইন বলে-গোস্ত
তুই কী আমার দোস্ত?
কচাইন বলে-আব্বাস
তুই আস্তা গাবগাছ।
কচাইন বলে-চর
তোকে নিয়ে করব না ঘর।
কচাইন বলে পাগলি
ভয় পাইয়া তুই আগলি (পায়খানা করলি)
কচাইন বলে-'ছাগল'
তুই একটা পাগল।
কচাইন বলে-ডালি
তুই কি আমার শালি ?
কচাইন বলে-শালা
তোর বইনের গলায় দেব মালা।
লক্ষ্মী পক্ষী গাদা ভরা ঘি
লক্ষ্মীরে বিয়া দিয়া কল্লাম কী?
আগে যদি জানতাম
পথ বইয়া কানতাম।

পাদে পাদন্তি, শুন ভাগ্যমতি
পাদ নাই যার
পুড়া কপালে তার।
যে করে পাদ লইয়া ওনা-পেনা
তে খায় পাদের ততা কনো।

জলির মিয়া ব্যাপারী
ভাত খায় ছয় পাড়ি
কলা খায় তিনডা
আগতে লাগে দিনডা
আগদে আগদে জীবন যায়
লল্লাড়িডা দেহা যায়।

গাচ্ছারে ভাই গাচ্ছা?
কিরে ভাই গাচ্চা?
গাছে উচ্ছত করে?
বাগের ডরে।
বাগ কই?
ছালি মাডির তলে।
ছালিরতলে কিতা করে?
বইদা পারে।
ক'কুড়ি ক'ডা বৈদা?
ছ'কুড়ি ছ'ডা বৈদা।
আমারে একটা দিবি!
ছুইতাল্লে পাবি।
আৎকা আৎক ডুলের বাড়ি
মাইনসে কইব কী?
আরাইন্যায় বিয়া করে
মদইন্যার ঝি!

চিহা আইয়ে চিক চিহাইয়া
ব্রাহ্মণ আইয়ে লাডি লইয়া
দর চিহা মার চিহা
চিহার দাম পাঁচ সিহা।

সামাজিক ছড়া

সমাজ জীবনের নানান প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান জনিত হাহাকার, নানান বৈষম্য, হাস্য কৌতুক ও বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ছড়াগুলো উৎপত্তি হয়েছে। এই ছড়াগুলোকে গূঢ় অর্ন্তদৃষ্টিতে বিচার করলে গূঢ় অর্থ বের হয়ে আসবে,

কলি কাইল্যা পুলা পানে
মারে কয় কুটনা বুড়ি
বাপেরে কয় শালা
বুড়া বুড়ি মইরা গেলে
যায় গো ঘরের জ্বালা।

আইন্ধার বেলা কত নারী
চাল বাজা খায়।
লক্ষ্মীর মা উইট্টা কয়
মুরালী চাচায়।
সই গো সই
দুককের কতা কই।
ছোট বেলা মা মরছে
বাপে করছে বিয়া
সৎমা ভাত দেয়
তিনডা ঝাড়া দিয়া।
মামা আইছে ঘামাইয়া
ছাতি ধর টানাইয়া।
ছাতির উপড়ে গামছা
দেহ মাঝির তামশা
বড় মামি রান্ধে বাড়ে
ছোট মামি খায়।
মেজ মামি গাল ফুলাইয়া
বাপের বাড়িত যায়।
বাবা দিল লাল শাড়ি
মা দিল খোপা।
এমুন খোপা বাইন্ধা দিলা
হাজার টাকা তুলা!
বড় বউ বরের ঝি
তানরে বা কইব কী?
মাইজম বউ আইট্টা
না কইতে উডে ফাইট্টা।
পাশের বাড়ির সেলিনা,
তার লগে খেলিনা
তার লগে আড়ি,
যাইনা তাদের বাড়ি।
তাদের বাড়ি দোতলা

কাকে ডাকে কা! কা!
কানে পরি দুল,
খোপায় পরি ফুল!

সুর নাই বেডার, গান গায়
মনের বিলাসে!
মাগ নাই বেডার
শ্বশুর বাইত যায়
পুরাণ লেশে বেশে।

আদর করে রুমাল দিলাম
যতন করে রেখো!
আমর কথা মনে হলে
রুমাল খুলে দেখো।

কলি থাইক্কা ফুল অয়
ফুল থাইক্কা মালা
মন দিয়া প্রেম অয়
প্রেম থেইক্কা জ্বালা।

শীত করে গো সীতার মা
খেতা দওগো বিন্দার মা।
খেতা নিল চোরে
কাঁপতে কাপঁতে মরে।

যদু মধু দুই ভাই
রাস্তাত একটা মরা গাই!
যদু কয় খাইয়া যাই
মধু কয় লইয়া যাই।

ওরে বেটা নাছির মাউথ
ভাইরে ছুরুদ্দিন (ছদরুদ্দিনের আঞ্চলিক ব্যবহার)
খেতের বাইগন (বেগন) বেইচ্যা খাইলি
খাজনার উপায় কী?
মাতিছনাগো ভাতিজি
মরিছ লাগাইছি
মরিছ বেইচ্যা লাভ করিয়া
খাজনা চালাইছি

এক মুঠ নাইল্যার (নালিতা বা পাটের শাক) হাগে (শাকে) আড়াই ছডাক ঘি।

ওরে বেটা চিনলি নারে গুমতি নদীর মূল
শাসনগাছার উত্তর দিয়ো বানাসুয়ার পুল
চীন শহরের লোক আসিয়া করল কারিকরি
তার উপর হামলা (আমলা) বেটায় চালায় রেলগাড়ি।

ব্যাখ্যা : গোমতী নদীর উপর প্রথম রেলের পুল হবার পর স্থানীয় কবিওয়াল এ গানটি তৈরি করেছিল যা এখনো মানুষের মুখে মুখে ফিরে।

তথ্যসূত্র : শামসুল হক, ইছাপুরা বুড়িচং, কুমিল্লা

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন মেটাতেই মানব সমাজে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি এবং তা আজ শিল্পকলার সম্পদে পরিণত হয়েছে। কালক্রমে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহে নান্দনিকতার প্রয়োগ ঘটে। বস্তুগত লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে লোকশিল্প। মোট কথা জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত মানুষের হস্ত এবং মস্তিস্কের শ্রম এবং কৌশলের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিই বস্তুগত শিল্প।

লোকশিল্প

বস্তুগতভাবে উৎপাদনশীল এমন কিছু শিল্প আছে, যাদের সৃষ্টি ঐতিহ্যগত এবং চারু ও কারুকলার ধারা প্রবহমান সেসব শিল্পকে লোকশিল্প বলা হয়ে থাকে। খগেশ কিরণ তালুকদার যথার্থই বলেছেন, "আদিম সমাজের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যবাহী শ্রমজীবী জনতার শিল্পকলা লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত।"

১. মৃৎশিল্প

কুমাররা হিন্দু নবশাখ গোত্রের সদস্য। তারা বিষ্ণুর উপাসক। বরুড়ায় কুমারদের পাল বলা হয়। তবে পালদেরও চারটি ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে রুদ্র পাল মাটির জিনিস বানায়। পালদের সম্পর্কে বরুড়ায় একটি লোকগল্প চালু আছে। গল্পটি বলেছেন মহেশপুর আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মচারী জহিরুল হক। গল্পটি নিম্নরুপ,

স্রষ্টা নাকি সব হিন্দুদের বর্ণ পরিচয় বন্টন করে দিচ্ছে। অর্থাৎ কেউ রায়, কেউ দাস, কেউ শীল কেউ দে ইত্যাদি উপাধি পাচ্ছে। এভাবে বংশ উপাধি ও গোষ্ঠী পরিচয় দিতে দিতে ঈশ্বরের ঝুলিও বোধহয় প্রায় শূন্য হয়ে আসছিলো। এমন সময় পালরা গেল ঈশ্বরের নিকট। বলল আমাদেরকে কী উপাধি দেবেন? তখন ঈশ্বর বলল—তাদেরকে দিব আর বাল, তখন তারা বলল, আমরা হলাম পাল।

বরুড়ার ঝিকুটিয়া, কোমারখলাতে পাল সম্প্রদায় নিত্য প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র বানিয়ে থাকে। কুমার থেকেই কোমারখলা গ্রামের নাম হয়েছে। তাদের কাজের প্রধান হাতিয়ার হলো চাকা, চুল্লি, ছাঁচ, ইত্যাদি। অধিকাংশ আধার তারা চাকার সাহায্যেই বানায়। তারপর রোদে শুকাতে হয়, চুল্লিতে পোড়াতে হয়। তবে পোড়ানোর আগেই তারা নকশার কাজটি শেষ করে থাকে এবং রঙ লাগায় পোড়ানোর পরে। এ কাজে অনেক ধৈর্য্য ও দক্ষতা প্রয়োজন। ঝিকুটিয়া ও কোমারখলার কুমারগণ কলস, হাঁড়ি, পাতিল, খোরা, মাটির ব্যাংক, সরা, বিভিন্ন প্রাণীর পুতুল, তাওয়া, ফুলের টব ইত্যাদি তৈরি করে থাকে।

ব্রাহ্মণ পাড়া উপজেলা : মৃৎশিল্প

ব্রাহ্মণ পাড়া উপজেলায় মৃৎশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ গ্রাম ষাইট শালা। এ গ্রামের ৪০টি পরিবার মৃৎশিল্পের কাজের সাথে জড়িত। পূর্ব পুরুষ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এ শিল্পের

সাথে তারা নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন আজও। প্রায় সব ধরনের তৈজসপত্র তারা তৈরি করে থাকেন যেমন, মাটির পাতিল, কলসি, ব্যাংক, মাটির পুতুল, ঢাকনা, দইয়ের পাতিল, মাটির তৈরি নানা প্রকার খেলনা। সব দেব-দেবীর মূর্তি। লক্ষ্মীর সরা, শখের হাড়ি, কলসিতে নকশা ইত্যাদি।

বিজয়পুরের মৃৎশিল্পী

রৌদ্রতাপে তৈরি হচ্ছে মৃৎপাত্র (ফুলদানি)

নির্মাণ প্রক্রিয়া

নদী বা বড় খাল থেকে এটেল মাটি তুলে এনে এর সাথে ভালভাবে বালু মেশানো হয় তারপর এর সাথে পানি মিশিয়ে কিছুটা নরম করা হয়। তারপর বেশ কিছু মাটির দলা তৈরি করা হয়। এ মাটির দলাগুলো নানা প্রকার ছাঁচে ফেলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দেয়া হয়। কোনটি দিয়ে কলসি, কোনটি থেকে পাতিল, কোন ছাঁচ থেকে বাচ্চাদের নানা প্রকার খেলনার পুতুল তৈরি করা হয়। তারপর প্রতিটি তৈজসপত্র রোদে শুকানো হয়। পুইন নামক বিশেষ এক ধরনের চুলা আছে যার উপর রোদে শুকানো প্রত্যেকটি তৈজসপত্র পোড়ানো হয়। পোড়ানোর পর তৈজসপত্রগুলো লাল রঙ ধারণ করে। লাল রঙ ধারণ করা এই পাত্রগুলোকে নানান রঙ দিয়ে নকশা তৈরি করা হলে কাজ সম্পন্ন হয়।

নির্মাণ প্রযুক্তি

মাটির তৈরি নানান ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করতে মৃৎশিল্পীরা নানা ধরনের লোক প্রযুক্তি বা Folk Technology ব্যবহার করে থাকে। মৃৎশিল্পীরা একধরনের বিশেষ ছাঁচ তৈরি করে সেই ছাঁচে নরম মাটি ফেলে সেই ছাঁচের আকৃতি দেয়া হয়। তারা এক ধরনের বিশেষ চুলা তৈরি করে থাকে স্থানীয়ভাবে পুইন বলে। এই পুইনে রোদে শুকানো সবগুলো পাত্রকে থরে থরে সাজানো হয়। সাজানোর পর পুইনের তলদেশ দিয়ে খড়, শোলা, কাঠ, ধানের তুষ, কাঠের কুড়া সব কিছু দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং প্রচণ্ড তাপের ফলে নরম পাত্রগুলো শক্ত হতে থাকে। এভাবে নিজস্ব ভাবনা পরিকল্পনায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হাতিয়ার

মৃৎশিল্পীরা তাদের কাজ সম্পন্ন করতে নিম্নোক্ত যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে– পিতনা, লোহার চ্যাপ্টা হাতুড়ি, কাঠের হাতুড়ি, মসৃণ করার নেকড়া, হস্তচালিত চাকা, বিদ্যুৎ চালিত চাকা।

বিজয়পুরের মৃৎশিল্প

বিজয়পুরের মৃৎশিল্প কুমিল্লাবাসীর অহঙ্কারের বস্তু। কুমিল্লার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে বিজয়পুর বাজার। বিজয়পুর বাজারের পশ্চিমে উত্তর বর্গারে এক কিলোমিটার দূরে রেললাইনের পশ্চিম পার্শ্বে এর অবস্থান। এর নাম বিজয়পুর মৃৎশিল্প কেন্দ্র। এর পাশেই রয়েছে বিজয়পুর মহিলা কলেজ। কেন্দ্রটি ২৭/০৪/১৯৬১ তারিখে স্থাপিত হয়। ২৯/০৮/১৯৬২ এ প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয় (নং-৩৯)। কেন্দ্রটির ম্যানেজার হলেন গোবিন্দ পাল (বয়স ৬০)।

চার শ্রেণির পাল পদবীধারি লোক রয়েছে। বারুই (পান চাষ করে) তৈপাল (মুড়ি ভাজে) কায়স্থ পাল ও রুদ্র পাল। রুদ্র পাল শ্রেণির মানুষই মৃৎশিল্পের কাজ করে। এজন্য কেন্দ্রটির পরিচালনা সমিতির নাম দেওয়া হয়েছে, রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।

২. খাদিশিল্প

খাদিশিল্প কুমিল্লার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সম্পদ। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা পর্বে বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্যে প্রথম স্থানে ছিল মিলে তৈরি কাপড় বর্জন করে স্বদেশের কাপড় পরিধানে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। লাকসাম রোডের অভয় আশ্রম ছিল স্বদেশি কাপড় তৈরির একটা প্রধান কেন্দ্র। আশির দশকেও অভয় আশ্রমে ৭০/৮০টি তাঁত ছিল। মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধীর স্মৃতিবহ এ প্রতিষ্ঠানটি ৯০ সালের পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়। তখন জনমনে একটি কথা চালু হয়েছিল মূলত এ আগুন জ্বালিয়েছিল কেউ সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্য। মহাত্মা মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহেশাঙ্গন ঈশ্বর পাঠশালা, রামমালা ছাত্রাবাস, নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস, ঠাকুরপাড়া সংলগ্ন দত্ত ছাত্রী নিবাস শতাব্দীকাল ধরে লোকসমাজের যে সেবা করে আসছে তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। একটা চক্র দীর্ঘদিন যাবৎ এ সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। খাদিশিল্পের সূতিকাগার অভয় আশ্রমকে পুড়িয়ে মূলত ঐ কাজটিই করা হয়েছে। তবু কুমিল্লাতে খাদিশিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়নি। অভয় আশ্রমসহ চান্দিনাস্থ দেবিদ্বার, মুরাদনগর প্রভৃতি অঞ্চলের চরকার কাটা সূতায় যে সুতি বস্ত্র মটকা তৈরি হত তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিল। খাদি, আদি, বাটিক এ কাপড়গুলো সারাদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কুমিল্লাকে কেন্দ্র করেই। পরে এ শিল্পটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লা শহরের রাজগঞ্জ থেকে কান্দিরপাড় হয়ে লাকসাম রোড পর্যন্ত ৫ শতাধিক দোকান রয়েছে খাদি বা খদ্দরের। খাদিঘর, বিশুদ্ধ খদ্দর ভাণ্ডার, খাদির কুটির, খাদি কুটির শিল্প, আবরণী, খাদি বিতান এমন প্রায় কাছাকাছি নামে প্রতিষ্ঠিত এসব দোকানে নানা বয়সের নানা রং মানের পোশাক তৈরি হয়। বাহির থেকে কেউ কুমিল্লায় বেড়াতে এলে যে তিনটি উপকরণ তারা স্মৃতি হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার বায়না অবশ্যই ধরবে, এর মধ্যে খাদি, রসমালাই ও স্পঞ্জ অন্যতম।

খাদির উপকরণগুলোর মধ্যে আছে– মটকির পাজামা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, জামা, চাঁদর, বিছানার চাঁদর, আদি পাঞ্জাবি, আদি ফতুয়া, লিনেন এর নানান ধাঁচের ফতুয়া, নকশি জামা, নকশি চাঁদর, নকশি রুমাল, নকশি পাঞ্জাবি, বুটিক, বাটিকের লুঙ্গি, তোয়ালে, সালোয়ার, কামিজ, তাঁতের থ্রিপিসসহ আরো শতশত রকমের কাপড়। কুমিল্লার খাদিকে ঘিরে ঢাকা চট্টগ্রাম বাইপাসের আশেপাশেও গড়ে উঠেছে অনেক দোকান। অনেক কিছুই আমরা আমাদের ইতিহাস ও স্মৃতি থেকে হারিয়েছি। কিন্তু যে ইতিহাসটি কুমিল্লাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে খাদিশিল্প এর মধ্যে প্রধান। দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে পরাধীন ভারতীয়দের অনেকে স্বদেশি খাদির কাপড় তৈরি পোশাক পরতে শুরু করেন। কুমিল্লায় এখন হাতে চালিত যন্ত্রের মাধ্যমে সুতা কাটা হতো। বিদেশি বস্ত্র বর্জনে গান্ধীজীর আহ্বানে সে সময় কুমিল্লায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। এর প্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে নিখিল ভারত তন্তবায় সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লা শহরের অভয়াশ্রমে। অভয়াশ্রমের কর্মীদের প্রচেষ্টায় কুমিল্লার আশপাশে এলাকায় সুতাকাটা ও হস্তচালিত তাঁতের ব্যবহার শুরু হয়। কুমিল্লার চান্দিনা সদর উপজেলা, মাঠাইয়া, কলাগাঁও, বেলাশ্বর, সাইতলা, বাখরাবাদ, পিইর, গোবিন্দপুর এবং

দেবীদ্বারের বড়কামতা ও ভানী গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন খাদি কাপড় তৈরি করেছেন। চান্দিনা অঞ্চলের তাঁতের তৈরি কাপড় বিখ্যাত। মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই অঞ্চলের খাদির চাহিদা বেড়ে যায়।

চান্দিনার গ্রামীণ খাদি : চান্দিনা বাজারের সাহাপাড়ায় এই গ্রামীণ খাদি অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাতা শৈলন্দ্রনাথ গুহ। শৈলন্দ্রনাথ গুহ শৈশব থেকেই ব্রিটিশবিরোধী ছিল। সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালেই খদ্দর কাপড় পড়তো। ১৯৩১ সালে তিনি গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তখন থেকেই খদ্দর কাজ শেখেন। তিনি বড়কামতা নিখিল ভারত কাটুনী সংঘে কাজ করতেন। এটি গান্ধীজীর অভয় আশ্রম দ্বারা পরিচালিত। শৈলন গুহ সে সময় বড়কামতা খাদি সেন্টারের ডাইং মাস্টার ও খাদি কর্মী ছিলেন। তারপর তার ছেলেদের তিনি এই পেশায় নিয়ে আসেন।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চান্দিনার খদ্দর : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে চান্দিনার খদ্দর ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। গান্ধীজী কুমিল্লায় যেই অভয় আশ্রম বলেছিলেন, চান্দিনায়ও তার শাখা তৈরি তখন থেকেই চান্দিনার খাদি কাপড় দেশ বিখ্যাত।

খাদির নামকরণ : হাতের বদলে পায়ে চালিত প্যাডেলের নিচে মাটিতে গর্ত বা খাঁদ করা হতো। এই গর্ত বা খাদ থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হতো তাকেই খাদি কাপড় বলা হতো।

তাঁতি সম্প্রদায় : এই খাদি তাঁত শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদেরকে দেবনাথ বলা হয়। তারা কুমিল্লায় প্রথম এই খাদি কাপড়ের বুনন শুরু করে।

ঐতিহ্যবাহী খাদির বয়নে ব্যস্ত জনৈক খাদিশিল্পী

তাঁতিদের অবস্থান : চান্দিনার খাদি তাঁতের কাপড়ের সুতা কাটার পেশায় কাজ করেন চান্দিনায় বারেরা। রামচন্দ্রপুর, জাফরাবাদ, সাইকট, বাবিরবড়, কুটুম্বপুর, কলাগাঁও, সোনাপুর, সাইতলা, ভানী, ফুলতলী, দোবাইরা, গণিপুর, প্রভৃতি গ্রামের লোকজন চরকায় হাতে সুতা কাটা পেশায় নিয়োজিত। এছাড়া বারেরা, মাঠাইয়া, নূবীতলা ও কলাগাঁওয়ের কিছু পরিবার তুলা থেকে সুতা বানানোর কাজ করে।

খাদি কাপড় : সুতা কাটার পর কাপড় বুনতে হয়। প্রতিদিন একজন তাঁতি দেড় থান কাপড় বুনতে পারে। আর একজন কাপড় বুনোনকারী কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দৈনিক ১২০ টাকা পান গ্রামীণ খদ্দর ভাড়ার থেকে। সেটা থেকে শ্রমিকের মজুরি দিয়ে প্রতিটি তাঁত থেকে আয় হয় ২০ টাকা।

ডায়িং তাঁতিরা কাপড় দিয়ে গেলে সেগুলো পরে ভেজিটেবল রঙে ডায়িং করা হয়। প্রথম কাপড়টি মেডিসিন দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। তারপর কস্টিক সোডা দিয়ে সিদ্ধ। তারপর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধোলাই করা হয়। তারপর ওয়াস করে শুকানোর পর যে রঙ দেয়া হবে তাতে ভিজিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তারপর আবার ওয়াস করে রোদে শুকাতে হবে।

বাজারজাতকরণ : তারপর এই কাপড় ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্রি হয়।

বিলুপ্তির পথে খাদিশিল্প : এই খাদিশিল্পের সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এই শিল্পটি হুমকির মুখে। রাঙামাটির কার্পাস তুলা আর পাওয়া যায় না। তাই পাওয়ার লুমের সুতায় খাদি কাপড় তৈরি হচ্ছে। যেগুলো আসলে খাদি নয়।

৩. ঘটচিত্র, উঠুনচিত্র বা আল্পনা

হিন্দু সমাজের লোকাচার এর অন্তর্ভুক্ত। 'ঘট' শব্দের লৌকিক অর্থ মাটির তৈরি কলস বা ছোট পাত্র। এসব ঘট বিভিন্ন আকারের হয়। সাধারণ হিন্দু সমাজে দৈনিক পূজার্চনায়, কাঁসা বা পিতলের পাত্রের ব্যবহার বেশি হয়। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে যে কলস ব্যবহার করা হয় তাতে নানা রকম নকশার ব্যবহার থাকে। এ নকশা আঁকা হয় নিজস্ব রঙের ব্যবহারে সাধারণত মাটির তৈরি ঘটে চালের গুড়াঁ, চুন বা তেল সিন্দুর দিয়ে এসব নকঁশি আঁকা হয়। এসব নকশার অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে সরল ফুল ও লতাপাতা বা মঙ্গল চিহ্ন। মনসার ঘট, লক্ষ্মীর ঘট, বিপদনাশিনীর ঘট বাঙালি হিন্দু সমাজে বহুল প্রচলিত। গ্রামীণ বা নাগরিক সমাজ নয়, সকল সমাজেই পূজার্চনা ছিল, আছে। বহু মধ্যবিত্ত ঘরে লক্ষ্মীর সরা পেলাম আর যে বিষয়টি আমাকে অবাক করল, সামর্থ থাক বা না থাক সব হিন্দুর ঘরেই অনেক দামি একটি নকশি করা সিংহাসন ব্যবহার করা হচ্ছে যা গৃহের অভ্যন্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের কাজ করছে। বিবাহ জন্মদিন, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি সব হিন্দুর ঘরেই কমবেশি উঠুন চিত্রের ব্যবহার হয়। গোবরগোলা জল দিয়ে বাড়ি শুদ্ধ করে তুলসীজল ছিটানো এবং এরপর মেঝে, উঠোন বা পথের উপর চালের গুঁড়ির আল্পনা তাদের এখনো করতে হয়। বিশেষ করে প্রাচীনপন্থিরা এ নিয়ম অবশ্যই মানেন। বর্তমান সময়ে আধুনিক বাড়িগুলোতে সকল বিবাহ বা সামাজিক উৎসবে পেশাদার নকশি আঁকিয়ে দিয়ে নকশা আঁকা হয়। গায়ে হলুদে লেখা হয় অমুকের বিয়ে, অমুকের গায়ে হলুদ ইত্যাদি।

বাঙালি নারীরা আল্পনা আঁকতে পছন্দ করে। ঘটচিত্র হিন্দু সমাজ ব্যবহার করলেও মুসলিম সমাজ বিবাহ বা গায়ে হলুদে বাড়িতে আল্পনা আঁকে। কুমিল্লার সর্বত্রই এর ব্যবহার আছে।

৪. কাঠ খোদাই বা দারুচিত্র

এটা বাংলার এক প্রাচীন শিল্প। গ্রামের জুতার মিস্ত্রিরা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই হাতুড়ি, বাটালির সাহায্যে কাঠের উপর ছবি তুলত। গৃহকর্মে ব্যবহৃত হয় এমন উপকরণ যেমন, খাট বা পালংক, আলমারি, সিন্ধুক, বাদ্য যন্ত্রের বাক্স, দরজা, জানালা টিনের ঘরের খিলান ইত্যাদি ছিল লোকজীবনের বহুল ব্যবহৃত পণ্য। আধুনিক যুগে দালান বাড়ি নির্মাণের সূচনা হলে এসব কাঠ খোদাই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বছর কুড়ি আগেও কাঠ দিয়ে অনেক কুটির শিল্পের উপকরণ যেমন– কলমদানি, মোমদানি, এসট্রে, মানুষের কাঠামো, পুতুল, পালতোলা নৌকা, গরুর গাড়ি, লাঙল হাতে চাষী, ইত্যাদি বানানো হত কাঠ দিয়ে। এসব পণ্যের ব্যবহার লোকজ জনগোষ্ঠী এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পেত এবং ঘরের শোকেসে এসব পণ্য বা উপকরণ সাজিয়ে রাখা হত। হঠাৎ করেই মানুষের ঘর সাজানোর অভিরুচিতে পরিবর্তন আসে। এমন কি কারুকাজ করা উপকরণ ব্যবহারের বদলে মানুষ সমতল কাঠের পণ্য ও উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গত দশকের গোঁড়ার দিকে নকশা আঁকা কাঠের পণ্য ব্যবহারে একটা নতুনত্ব আসে। বিশেষ করে ঘরের ড্রইংরুম সাজানোর জন্য ব্যবহার হতে শুরু করে অত্যাধুনিক কারুকাজ করা কাঠের উপকরণ। আধুনিক বাড়িগুলোতে যোগ হতে থাকে নতুন ঘরানার চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, শোকেস, দরজা, জানালা, শো পিস। ফলে কাঠ খোদাই নতুন করে ফিরে আসে নকশা আকারে। কুমিল্লার প্রতিটি গলিতেই এখন ২/১০টি ফার্নিচারের দোকান পাওয়া যাবে যেখানে নকশা করা উপকরণ পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অত্যাধুনিক কাঠের উপকরণ তৈরি করা হয়। মোগলটুলি, গাংচর কাঠের গোলায় গোয়ালপট্টিতে এরূপ দোকানের সংখ্যা ৫শ'র নিচে না। এ পেশায় এখন প্রচুর লোকের সমাগম ঘটছে। গোয়ালপট্টি নকশার জন্য এক বিখ্যাত স্থান। সকাল হতে গভীর রাত পর্যন্ত এখানে কাঠের তৈরি পণ্যের উপর নকশার কাজ চলে। ২/১ নকশাকর্মী এবং ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা জানালেন, কুটির শিল্প আকারে কাঠ খোদাই এর অবসান হলেও তা যে পদ্ধতিতে ফিরে এসেছে এতে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এ পেশার প্রতি আগ্রহ দেখাবে। গোয়ালপট্টিতে ১০/১২টি নকশার দোকানে কাজ করে দেড় শতাধিক খোদাই মিস্ত্রি। তাদের বক্তব্য এত বেশি পরিমাণ কাজ এখন এখানে হয়, বর্তমান শ্রমিকের তিনগুণ হলেও এ কাজের চাহিদা মিটবে না। নিম্নে তারা কি কি কাজ করে এর একটি তালিকা তুলে ধরা হল–

১. ঘরের দেয়ালের সাথে ফিটিংকরা আলমারির জন্য আকর্ষণীয় ডিজাইনের দরজা।
২. আধুনিক নকশা করা সোফা, টেবিল, চেয়ার।
৩. সিংহাসন। এটা মূলত পূজার উপকারণ যা হিন্দু সমাজই ব্যবহার করে। এখন বহু সৌখিন পরিবার মন্দিরের জন্য ও গৃহে ব্যবহারের জন্য ছোট বড় ও মাঝারি সিংহাসন তৈরি করে।
৪. ঘরের দরজা, জানালা, রেলিং ডিজাইন করা রিডিং, ডাইনিং ও টি টেবিল।

৫. ড্রইং রুমের জন্য চমৎকার ডিজাইনের ফুলের ছোট বড় টব।
৬. ত্রিকোণাকার কর্ণার শোপিস।
৭. চারকোনাকৃতির সিঙ্গল শোপিস।
৮. বইয়ের সেলফ।
৯. ডাইনিং রুমের জন্য ডিজাইন করা মিটসেলফ ইত্যাদি গোয়ালপট্টি ও গাংচরে ডিজাইন হয় এমন কয়েকটি নকশার দোকানের পরিচয় নিচে তুলে ধরা হল–

১. নকশা ঘর, গোয়ালপট্টি, কুমিল্লা
স্বত্বাধিকারী-মফিজুর রহমান
২. বিস্‌মিল্লাহ্ নকশাঘর
স্বত্বাধিকারী- হাবিবুর রহমান।
৩. মোবারক ফার্নিচারও ডিজাইন ঘর-গোয়ালপট্টি।
৪. সাকিব নকশা ঘর
৫. মদিনা নকশা ঘর
৬. ছোয়া নকশা ঘর
৭. ভাই ভাই নকশা ঘর
৮. তাজ নকশা ঘর
৯. ইত্যাদি নকশা ঘর
১০. সাজ নকশা ঘর
১১. মেহেদী নকশা ঘর, স্বত্বাধিকারী খান জাহান আলী।

ব্রাহ্মণপাড়া : দারুচিত্র

কাঠের উপর নকশা খোদাই করে নানান আকৃতির আসবাবপত্র তৈরি করাই দারুশিল্প। ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় দারুশিল্প তেমন বিশেষ চোখে পড়ে না। চান্দলা, ব্রাহ্মণপাড়া থানা সদর এলাকায় দারুশিল্পের কিছু কাজ চোখে পড়ে। দরজার নকশা, খাটের নকশা, আলমারি, সিন্দুকের গায়ে চোখে পড়ে বাহারি নকশা।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

কাঠ কেটে প্রথমে টুম করা হয়। টুমগুলোকে মোটা ফালি করা হয় যেগুলো স্থানীয়ভাবে তক্তা নামে পরিচিত। এগুলো রোদে শুকোতে হয়। তারপর তক্তাগুলোকে রামদা করা হয়। কাঠের সাথে কাঠ জুড়ে আকার দেয়া হয় নানা ধরনের আসবাবপত্র। কাঠের গায়ে ছাঁচ ফেলে দাগ কেটে বাটাল দিয়ে কেটে নানা প্রকার নকশা আঁকা হয় কাঠের গায়ে। তারপর সিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে নকশার পৃষ্ঠদেশাকে মসৃণ করা হয়। তারপর মসৃণ করা নকশার পৃষ্ঠদেশে বার্ণিশ দেয়া হয়। এভাবে তৈরি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ আসবাব।

নির্মাণ প্রযুক্তি

দারুশিল্পীরা কাঠের নকশা করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের ছাঁচ বা আল্পনা ব্যবহার করে। এই আল্পনার ছাঁচ কাঠের পাটাতনের উপর ফেলে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে নেয়। তারপর দাগ কাটা নকশার উপর তারা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে খাজ কেটে নকশা করে থাকে। কাঠের ফালির মাঝে অনেক সময় ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রগুলোকে

কাঠের গুড়া এবং আইকা মিশিয়ে তারা বন্ধ করে দেন। কাঠের ফালির সাথে ফালি যুক্ত করার সময় তারা ব্যবহার করেন আইকা।

ব্যবহৃত হাতিয়ার

দারুশিল্পীরা তাদের কর্ম প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এগুলো হলো– কোন্দল বাটাল, সোজা বাটাল, রাউন্ড বাটাল, গোল বাটাল, রেক বাটাল, কাঠের শক্ত মুগুর, হাতুড়ি, ছেনী, রামদা, সিরিস কাগজ, বার্ণিশ ইত্যাদি।

৫. নকশি কাঁথা

নকশি কাঁথা গ্রামীণ হস্তশিল্পের এক অনন্য উপাদান। ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলার প্রায় সর্বত্রই নকঁশি কাঁথা তৈরির কাজ চোখে পড়বে। এক্ষেত্রে বেশ ক'জন আছেন যারা নকঁশিকাঁথা তৈরিকে তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদের ক'জন হলেন–

পপি আক্তার-মাধবপুর গ্রাম
নিলু রাণী শীল-মাধবপুর গ্রাম
ভজন রাণী শীল-তেতাভুমি গ্রাম
আকলিমা আক্তার-সিদলাই গ্রাম

নির্মাণ প্রক্রিয়া

কাঁথাগুলোকে প্রথমে সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে কাঁথার চারপাশ সেলাই করা হয়। তারপর কাঁথার জমিনে ফুল, পাখি, হাতি, মোরগ, আরো নানা জাতের পশু ও ফল ফুলের ছবি আঁকা হয়। তারপর আঁকা ছবিগুলোর উপর দিয়ে সুই সূতার সেলাই দেওয়া হয়। সেলাই করার মধ্য দিয়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

মোটা সুতা, বড় সুই, সাদা কাপড়।

৬. লক্ষ্মীর সরা

দেবী লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি সম্বলিত সরাকেই বলা হয় লক্ষ্মীর সরা। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন ধন রত্নের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করবার জন্য লক্ষ্মীর সরা বাজার থেকে বা প্রতিমা শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসে। লক্ষ্মীর সরা লোকজ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লক্ষ্মীর সরায় একজন শিল্পীর শিল্পীমনের ছাপ পাওয়া যায়।

সখের হাঁড়ি

হাঁড়ির গাত্রে বহু রঙের ব্যবহারে ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির নকশা অঙ্কণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়ে থাকে সখের হাঁড়ি। সখের হাঁড়ি বাংলা লোকজ সংস্কৃতির একটি অনন্য উপকরণ একে নকশি হাঁড়িও বলে থাকে। এতে যে সুনিপুন দক্ষতার ছাপ পাওয়া যায় তার সাথে চোখে পড়ে পেশা হিসেবে শিল্পীর পারদর্শীতা এবং শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্যের বহিপ্রকাশ।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রথমে মাটির হাঁড়ি সংগ্রহ করা হয়, এর উপর রঙ তুলি দিয়ে ফুল, ফল, পশু পাখির ছবি আঁকা হয়। মাটির হাঁড়িগুলো কুমোর পাড়া থেকে সংগ্রহ করা হয়, তারপর চিত্র শিল্পীরা হাঁড়িগুলোর গায়ে বাহারি রঙের নানান নকশা অঙ্কন করে।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

লম্বা থালার মতো কিছু মৃৎপাত্র কুমোররা তৈরি করে থাকে যেগুলোকে বলে থাকে সরা। প্রতিমা শিল্পীরাই সাধারণত লক্ষ্মীর সরা এঁকে থাকে, কিন্তু পটুয়ারা ও কুমোরদের কাছ থেকে সরা কিনে নিয়ে এতে বাহারি রঙের প্রয়োগে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি আঁকা হয় .

৭. বাঁশ বেত শিল্প

মুরাদনগর উপজেলায় বেশ কিছু গ্রামে বাঁশ বেতের কাজ চোখে পড়ে, এ সব গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–কোরবানপুর, রাজা চাপিতলা, বাংগরা, ছালিয়া কান্দি, রামচন্দ্রপুর। এসব গ্রামের বেশ কিছু পরিবার বাঁশ বেত শিল্পের সাথে জড়িত। বাঁশ বেত দিয়ে তারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে থাকে যেমন, কুলা, চালুনি, ডোলা, ওড়া, খাড়ি, পুরা, কাপাইর, জাবার, হাত পাখা, আনতা, খাঁচা, পলো ইত্যাদি।

নির্মাণ উপকরণ

এসব তৈরি করতে নানা ধরনের বাঁশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন– রফাইমূলী, ডুলু মূলী, মৃত্তিঙ্গা মূলী, টেট্টা বাঁশ, বাজালী/চিকন মূলী, বরাক, শিল বরাক, জাই বরাক, বাঁরী বাঁশ, মহাল, হুনাপতি, টেংরা, বুন বাঁশ ইত্যাদি।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

বাঁশগুলোকে প্রথমে চেছে-ছিলে পরিষ্কার করা হয়। বাশেঁর এই ডালগুলোকে লোকজন আইক্কা বা ওডা বলে ডাকে। পরিষ্কার বাঁশগুলোকে প্রায় ৪-৫ ফুট আকারে টুকরা করা হয়। পরে এগুলোকে কেটে পাতলা ফালি বা কাইমে পরিণত করা হয় এই কাইম–গুলোকে আবার অনেক পাতলা করে ফালি করা হয়, যাকে বলা হয় বেত। তারপর এই বেতগুলোকে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিলে হালকা হয়ে যায়। এই বেতগুলোকে একের পর এক পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় এসব বাঁশ বেতের নানান প্রয়োজনীয় পাত্র।

নির্মান প্রযুক্তি

নোয়াখালী অঞ্চলে বেশ উৎকৃষ্টমানের মূলী বাঁশ পাওয়া যায়। এছাড়াও পার্বত্য বান্দরবান, খাগড়াছড়িতে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও প্রচুর বাঁশ এদেশে আসে। বাঁশ বেতের কারিগররা নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ত্রিপুরা হতে এসব বাঁশ কিনে ভালভাবে বেঁধে ভেলা তৈরি করে নদী পথে ভাসিয়ে এগুলো এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে নিয়ে আসে।

তৈরি হচ্ছে শীতলপাটি

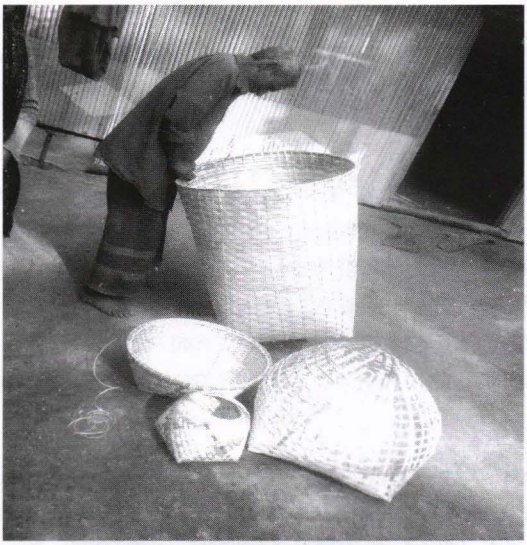

গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত নানা বাঁশজাত উপকরণ তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী

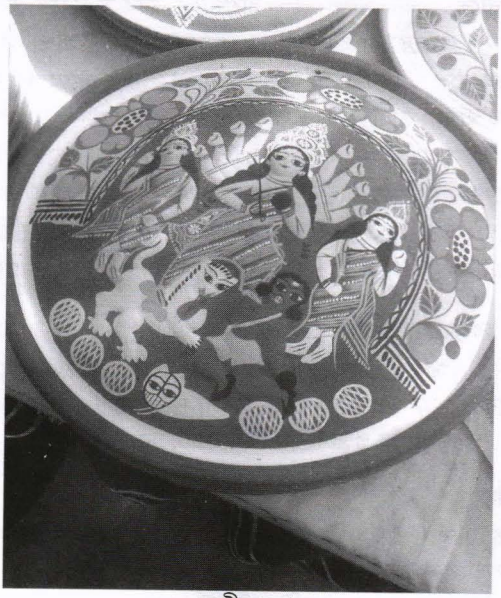

লক্ষ্মীর সরা

শখের হাড়ি

তারপর বাড়ির পাশে কোন খালে এই বাঁশগুলো ডুবিয়ে রেখে বেশ কয়েক মাস সংরক্ষণ করে তারা এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাদের হাতের দক্ষতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কুলা তৈরি, চালুন তৈরি করার সময় তারা এক প্রকার বিশেষ কাইম ব্যবহার করে থাকে। লম্বা কাইমটাকে গোল করে মাটির সাথে বাঁশের গাইট দিয়ে শক্ত করে গেথে কয়েক ঘন্টা রাখলেই কাইমগুলো বাঁকা হয়ে চালুন ও কুলার মূল কাঠামোর জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। এসব অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চোখে পড়বে বাঁশ বেতের শৈল্পিক কারুকার্যময় শিলিং বা কার। এই কার তৈরিতে বিশেষ কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হাতিয়ার

বাঁশ বেতের শিল্পীরা বাঁশ বেতের নানা পণ্য সামগ্রী প্রস্তুত করতে নিম্নলিখিত হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। যেমন–রাম দা (বড় কোপা দা), ছোট কোপা দা, পাতলা ছেনি, শক্ত কাঠের মুগুর, শক্ত গাছের গুড়া দিয়ে তৈরি পাটাতন।

আড্ডার কুটির শিল্প

কুমিল্লা অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হয়। বেত গাছ, মূর্তা বা মোতা গাছও কম বেশি রয়েছে। কিন্তু সেভাবে কুটির শিল্পের কাজে এসবের ব্যবহার হয়নি। আজ্হা গ্রামে জাহানারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি কুটির শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে। মূলত কুমিল্লা শহরের জাহানারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এর সার্বিক সহযোগিতা নিয়েই এটি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে মূলত বাঁশ, বেত ও কাপড়ের কাঁচামাল দিয়েই শিল্পপণ্য উৎপাদিত হয়। এখানে পাটের শিকা, কাপড়ের পুতুল দোলনা, বেতের চেয়ার, পাখা, পানদানি ইত্যাদি নির্মিত হয়। ফলে লোককর্মসংস্থানের একটি ব্যবস্থাও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮. প্রতিমা শিল্প

হিন্দুদের নানা দেব দেবীর প্রতিমা বা মূর্তি তৈরি করাই প্রতিমা শিল্প। প্রতিমা তৈরির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ মহান কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর গ্রাম। এ গ্রামের প্রায় ৫টি পরিবার এ শিল্পের সাথে জড়িত। দূর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষীর মূর্তি প্রতিবছরই রামচন্দ্রপুরের পাল পাড়ার লোকজন তৈরি করে থাকে। প্রতিবছর পাল পাড়ার প্রতিমা শিল্পীরা বেশ কিছু বায়না পেয়ে থাকে এবং বায়না অনুসারে তারা বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে থাকে। মূর্তির মধ্যে দূর্গা মূর্তি সবচেয়ে বেশি দাম হয়ে থাকে। এক একটি দূর্গা মূর্তি প্রায় ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। রামচন্দ্রপুরে অনেক আগে থেকেই প্রতিমা শিল্পীরা এখানে প্রতিমা তৈরি করে আসছে এবং লোকজ সংস্কৃতির এই ধারাটিকে আজও তারা সজীব রেখেছে।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রথমে বাঁশ দিয়ে একটি কাঠমো তৈরি করা হয় তারপর সেই কাঠামোতে প্রতিটি দেব-দেবীর জন্য আলাদা আলাদা কাঠামো বসানো হয়। প্রতিটি দেব দেবীর আদলে খড়

দিয়ে পেঁচিয়ে বেনা প্রস্তুত করা হয় এই বেনা বসানো হয় মূল কাঠামোতে। তারপর এই খড়ের বেনায় এঁটেল মাটির প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা হয়। এর উপর পাতলা সুতি কাপড় পেচিয়ে দেয়া হয়। তারপর আবার মাটির প্রলেপ দিয়ে জল মেশানো পাতলা কাঁদার প্রলেপ দিয়ে মূর্তির কাঠামোটিকে ক্রমশ মসৃণ করা হয়। অন্যদিকে নরম এঁটেল মাটি বিভিন্ন দেবদেবীর মুখাকৃতির ছাঁচে ফেলে আকৃতি দেয়া হয় এবং কাঁদা মেশানো জল দিয়ে ক্রমশ মসৃণ করে মূল কাঠামোর সাথে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। এভাবে একটি প্রতিমার মৌলিক কাঠামো প্রস্তুত হয়ে গেলে একে রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকানোর পর একে প্রথমে সাদা রঙ করা হয় তারপর এর চোখের মুখের উপর নানা প্রকার বাহারি রঙের কারুকাজ করা হয়। মূর্তিকে শাড়ি পরানো, তারপর মাথায় চূড়া পরানো হলে একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিমা তৈরি হয়ে যায়।

নির্মাণ প্রযুক্তি

প্রতিমা শিল্পীরা প্রতিমা তৈরির সময় বিভিন্ন দেব দেবীর মুখাকৃতির ছাঁচ ব্যবহার করে তাকে। যাঁতে নরম মাটি ফেলে সেই ছাঁচের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। প্রতিমা তৈরির পর এক পর্যায়ে এর উপর সাদা সুতি কাপড়ের একটি প্রলেপ দেয়া হয়। এ কাজটি করা হয়ে থাকে যেন মাটির মূর্তি শুকিয়ে যাওয়ার পর ফেটে না যায়। রঙ করার সময়ও একটি বিশেষ প্রযুক্তি চোখে পড়ে আর তা হলো, গুড়া রঙের সাথে ডিমের কুসুম মেশানো হয় যাতে করে প্রতিমার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বাঁশ, সাদা সুতি কাপড়, খড়, এঁটেল মাটি, গুড়া রঙ, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

৯. নৌ শিল্প

নৌকা তৈরির কাজ তেমন বিশেষভাবে চোখে পড়েনা মুরাদনগর উপজেলায়। তবে বর্ষাকালে কোরবান পুর, ছালিয়া কান্দি, জাহাপুর প্রভৃতি গ্রামের কিছু নৌ শিল্পী নৌকা তৈরির সাথে জড়িত। মূলত তারা প্রতিবছর নৌকা বায়না পেয়ে থাকে এবং নৌকা তৈরি করে। তারা প্রধানত কোশা নৌকা তৈরি করে থাকে।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

কাঠের তক্তাগুলোকে তারা বিশেষ উপায়ে একটির সাথে আরেকটি জোড়া দিয়ে থাকে। এই জোড়া দেওয়ার সময় তারা এক ধরনের ক্লিপ ব্যবহার করে থাকে। ক্লিপগুলো দিয়ে একের পর এক কাঠের তক্তা জুড়ে তৈরি করা হয় নৌকা। নৌকার চার পাশে ভালভাবে আলকাতরা গরম করে, তরল করে মেখে দিয়ে ছোট ছোট কাঠের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া হয়। ক'দিন ভালোভাবে রোদে শুকানোর পর নৌকাটি প্রস্তুত হয়ে যায় ব্যবহারের জন্য।

নির্মাণ প্রযুক্তি

নৌ শিল্পীরা নৌকা তৈরি করার সময় কাঠের তক্তাকে বাকানোর জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। একে বলা হয় কাইন দেওয়া। বাইন দেওয়ার জন্য কাঠের

তক্তাকে হালকাভাবে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয় তারপর কাঠের তক্তার মাঝ বরাবর লোহার শিক দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে গেঁথে কাঠের তক্তাটির দুই প্রান্তকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানা দেয়া হয়। এভাবে কয়েকদিন রেখে দেয়ার পর কাঠের তক্তাটি বাঁকা হয়ে যায় এবং নৌকা তৈরিতে এটি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে পড়ে। কাঠের তক্তা জোড়া দেওয়ার পরও দেখা যায় কাঠের গায়ের ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছিদ্র থাকে যা বিশেষ কৌশলের সাহায্যে কারিগরেরা আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

ব্যবহৃত হাতিয়ার

কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কাজে যে সকল হাতিয়ার প্রয়োজন হয় তার প্রায় সবগুলোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে নৌকা তৈরিতে। হাতুড়ি, বাটাল, করাত, রাঁদা, ক্লিপ, গ্লাস সহ যাবতীয় হাতিয়ার।

নৌকা তৈরির কাঠ : নৌকা তৈরির উৎকৃষ্ঠ কাঠ হলো জারুল এবং শাম কাঠ।

মনোহরগঞ্জের নৌকা নির্মাণ

মনোহরগঞ্জ উপজেলার আশির পাড়, খিলা, ও মনোহরগঞ্জ বাজারে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে নৌকা তৈরি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, মনোহরগঞ্জ হলো ডাকাতিয়া তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল। কাজেই এখানের অনেক জায়গায়ই বর্ষাকালে নৌকার সাহায্যে চলাচল করতে হয়। তাই এলাকায় বাংলার এই ঐতিহ্যগত লোকশিল্পটির এখনো অস্তিত্ব রয়েছে। দীনবন্ধু মিস্ত্রী (৫৫) মনোহরগঞ্জ বাজার ও তার আশপাশের এলাকায় বহু বছর ধরে কোষা নৌকা, ডিঙ্গা নৌকা, জাউল্যা নৌকা, চান্দি নৌকা, মাটিকাটা নৌকা বানিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে নৌকা তৈরির খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানা যায়। জারুল ও শাল কাঠের নৌকা টেকসই হয়, ২০ বছর টিকে। মনোহরগঞ্জ এলাকায় সৃষ্টি কড়ই, রঙিন হোয়া, লোয়া কাঠ, ধুন্দল কাঠের নৌকা তৈরি হয়ে থাকে। কাঠই নৌকা তৈরির মূল উপকরণ। সঙ্গে লাগে ৩-২০ কেজি (নৌকা অনুসারে) পাতাম লোহা। আর লাগে তারকাটা (২-১০ কেজি), গজাল, পাটের রশি।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

আগে কাঠের তক্তা ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে 'সিজন' করতে হয়। তারপর তক্তাগুলোকে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে বিন্যাস করে নৌকার আকৃতি দেওয়া হয়। জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয় লোহার কাটা বা পেরেক। নৌকার পিঠ বা তলার বক্র কাঠের নাম 'দাঁড়া'। 'দাঁড়া' দিয়ে নির্মাণ শুরু হয়। এর দু'পাশে তক্তা দিয়ে নৌকার খোল তৈরি হয়। খোল বাঁকার বলে কাঠ আগুনে সেঁকে পরিমাণমতো বাঁকা করতে হয়।

মূল কাঠামোর সাথে হাল, পাল, মাস্তুল, বৈঠা, লগি, সেওতি, ছই ইত্যাদির সমন্বয়েই নৌকার রূপ পূর্ণাঙ্গ হয়। নৌকার খোলের পাশে খাড়াভাবে যে কাঠ লাগানো হয়, তাকে 'গোছা' বলে। খোলের একেবারে শীর্ষে দু'পাশ দিয়ে যে লম্বা শক্ত কাঠ দুই মাথায় গিয়ে পরস্পরের সাথে মেশে তার নাম 'ডলি'। নৌকার দুই পাশের খাড়া অংশকে আটকানোর জন্য ডালির ওপর আড়াআড়িভাবে যেসব মজবুত তক্তা বসানো হয়, সেগুলির নাম 'গুড়া'। নৌকার খোলের ওপর গুড়ার সঙ্গে মিলিয়ে যে ছাদ তৈরি

করা হয় তার নাম 'পাটাতন'। পাটাতনের তক্তাগুলি আলগা রাখা হয় মালপত্র রাখা ও পানি সেঁচের সুবিধার জন্য।

নৌকার সামনের দিককে 'গলুই' এবং পিছনের দিককে বলে 'পাছা'। গলুইয়ের দু'পাশে কাছি বাঁধার জন্য ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু খুঁটি দুটির নাম 'যুগো'। নোঙর ফেলা বা তীরে কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধতে তা ব্যবহৃত হয়। রোদ বৃষ্টির ছাউনিকে 'ছই' বলা হয়। নৌকার মাঝামাঝি পালগুড়ার ছিদ্রের মধ্যে যে দীর্ঘ শক্ত দণ্ড বসানো হয় তার নাম 'মাস্তুল'। এতে পাল বা বাদাম বেঁধে দেওয়া হয়। কাপড়ের তৈরি বাদামে বাতাস লেগে নৌকা গতিশীল হয়। স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালিয়ে নিতে অনেক সময় দড়ি বেঁধে টানতে হয়। টানার কাজে ব্যবহৃত এই দড়িকে বলে 'গুণ'। বানানোর পর নৌকায় আলকাতরার প্রলেপ দিতে হয়। আলকাতরার পরিবর্তে কেউ কেউ গাবের রসও দিয়ে থাকে। বছরের অন্যান্য সময় পানির নিচেই থাকে অধিকাংশ নৌকা। বৈশাখ এলে নৌকা তুলে আলকাতরা দিয়ে চালানো হয়।

১০. কাইল-ছিয়া

কাইল-ছিয়া গ্রামীণ লোকজ ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গ্রামের মহিলারা চিড়া কুটা, চালের গুড়া তৈরি করা সহ আরো অনেক কাজে কাইল ছিয়া ব্যবহার করে থাকে। কাইল-ছিয়া আঞ্চলিক ভাবে কোথাও গাইল ছিয়াইট বা গাইল-ছেহাইট নামেও পরিচিত। মুরাদনগর উপজেলার কোরবানপুর ইউনিয়নভুক্ত খোশঘর গ্রামে কাইল ছিয়া তৈরি হয়। এ গ্রামে প্রায় ১৫টি পরিবারের এ লোকশিল্পের কাজের সাথে জড়িত।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

আম গাছ, গাব গাছ, শাল এবং জারুল গাছের শক্ত গোড়া দিয়ে বেশ শক্ত ও উৎকৃষ্ট মানের কাইল ছিয়া তৈরি করা হয়ে থাকে। গাছের গোড়ার ছাল চেঁছে ছুলে ফেলে দেয়ার পর ছোট ছাঁচা কুড়াল দিয়ে চেঁছে মূল গাছের ফালিটাকে ফাপা করে দেয়া হয়। ফালিটার দুই প্রান্ত থেকে মাঝ বরাবর ক্রমশ কিছুটা সরু করে দেয়া হয় বাটাল দিয়ে। এভাবে কুড়াল দিয়ে চেঁছে মূল গাছের ফালিটাকে ফাপা করে দেয়া হয়। এভাবে তৈরি হয়ে যায় একটি কাইল। ছিয়া তৈরির জন্য ইউক্যালিপটাস গাছের শক্ত, সোজা ও সরু ডাল ব্যবহার করা হয়। ডালগুলোকে ভালভাবে চেঁছে ছুলে নিলেই তৈরি হয়ে যায় ছিয়া। ছিয়ার দৈর্ঘ্য হয় চার-পাঁচ ফুট, ব্যসে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার, এবং এর ওজন হয়ে থাকে আড়াই সাড়ে তিন কেজি।

নির্মাণ প্রযুক্তি

কাইল তৈরির সময় গাছের শক্ত গুড়িটাকে ফাপা করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় চার্চা কুড়াল। চাঁছা কুড়াল দিয়ে ক্রমে ক্রমে চাঁছতে চাঁছতে গাছের গুড়িটাকে ফাপা করে দেয়া হয়।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

হাতুড়ি, বাটাল, পাতলা ছেনি, চাঁচা কুড়াল, ধারালো কোপা দা ইত্যাদি।

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

সাধারণত কুমিল্লা জেলায় পোশাক পরিচ্ছদের মাঝে এমন কোন বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে লোকজন কিছু বিশেষ পোশাক পরিধান করে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোতে পায়জামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরিধান করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোতে ধূতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকে। পহেলা বৈশাখের মতো সর্বজনীন উৎসবগুলোতে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে লোকজন পায়জামা-পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে বৈশাখী মেলায় যায়। অনুষ্ঠান ছাড়া পোশাক পরিচ্ছেদের তেমন বিশেষ কোন বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য চোখে পড়েনা।

অঙ্গচিত্র

বাংলার রমণীরা চিরকাল সাজগোজ প্রিয়। হিন্দু ধর্মের নারীদের এমনিতেই বিবাহের পর সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে ফোটা পরতে হয়। এটা ধর্মীয়ভাবে প্রথাসিদ্ধ অর্থাৎ বিবাহিত রমণীমাত্রই সিঁদুর পরতে হবে। বিশেষ করে সিথিঁর মধ্যে আঁকা সীমান্ত রেখাকে হিন্দু রমণীরা সৌভাগ্য হিসাবে গণ্য করে। যেসব নারী সিঁদুর পরেনা বা নামমাত্র নিয়ম মেনে চলে তাদেরকে ভাগ্যহীনা ও স্বামীদ্রোহী হিসাবে গণ্য করা হয়। ভাই ফোটার সময় বোন ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোটা দেয়। এটা স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার প্রতীক। তাছাড়া বৈষ্ণব সমাজে তিল রেখা পবিত্রতার প্রতীক। যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তিলকের ফোটা বা যজ্ঞ পীতের প্রতীক ধারণ করে থাকে। সন্তান কোন শুভ কাজে যাত্রা করলে মা তার পায়ের ধুলিতে জলফেলে কপালে ফোটা দেয়। বাধ্যগত ও সুসন্তানরা মায়ের এ আশীর্বাদ হাসিমুখে গ্রহণ করে থাকে।

আবহমান কাল থেকে বাংলার তরুণ তরুণীদের অঙ্গে অলংকারের পাশাপাশি টিপ কাজল আলতা মেহেদীর রং ব্যবহার করত। অবশ্য মেহেদী ব্যবহারের প্রচলনটা মুসলিম সমাজেই ছিল। একে সুন্নত হিসাবে গণ্য করা হত। এখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে নকশা মেহেদীর ব্যবহার হয়। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান জন্মদিন, গায়ে হলুদ, বিবাহ, পূজা পার্বন, শবে বরাত, ঈদ, বিবাহ বার্ষিকীতে মেহেদী নখ পালিশের ব্যবহার হয়। বিশেষত আজকের তরুণীরা, অত্যন্ত রূপবিলাসী। এরা মাথায় লম্বা চুল রাখাও পছন্দ করেনা তাদের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি এমনকি শরীরের বিশেষ অঙ্গের রং পরিবর্তনের জন্যও চেষ্টার অন্ত নেই। বিউটি পার্লার সে কাজটাই করে থাকে। পুরুষরা বামন চুল বা দাঁড়িকামানোর জন্য যায় নাপিত বা সেলুনে আর মেয়েরা যায় বিউটি পার্লারে। বিউটি পার্লার অঙ্গের রঙ্গ পাল্টানো থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় অঙ্গচিত্র এঁকে সাদামাটা রূপটিকেও আকর্ষণীয় করে তোলে। আগে শুধু বর বা কন্যাকেই সাজানো হত। এখন বিবাহ ও অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে দৈহিক

আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য মেয়ের মা ভাবিরাও বিউটি পার্লারে যান। সংস্কৃতির গতানুগতিকতা পরিহার করে একে নিয়ে আসছেন আধুনিক ঘরানায়। এর প্রতিই এখন আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিবন্ধিত। অবশ্য অনেক নারী মনে করে লম্বা চুল লক্ষ্মী নারীর প্রতীক। এরা চুলের যত্নই করে একে বড় করো বেণী করার জন্য। এমন চুলের খোঁপা পরা নারী খুঁজে পাওয়া এখন সুলভ না হলে ও দুর্লভ নয়।

তথ্যসূত্র : বিজয় মজুমদার, কাঠেরপুল, রেইসকোর্স কুমিল্লা

লোকসংগীত

বাঙালির সংগীত প্রিয়তা আজ সকলের নিকটই স্বীকৃত। বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মুখে বিচিত্র বাণী ও সুরের গান এবং বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে সংগীতপ্রিয় বাঙালির রূপটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীতগুলোকে যদি নামের দিক বিবেচনা করা হয় তাহলে অন্তত হাজার রকম লোকসংগীতের নাম পাওয়া যায়।

লোকসংগীতের বৈচিত্র্য এত ব্যাপক যে এদের সাধারণ শ্রেণিবিন্যাস খুবই কঠিন কাজ। ধর্মদর্শন, আচার-সংস্কার, প্রেম, পেশা, শ্রম, বৃত্তি, হাস্যরস ইত্যাদির নিরিখে শ্রেণিকরণ করলে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। যেমন,

ক. ধর্মতত্ত্ব, ভক্তি, আচার ও সংস্কারমূলক সংগীত-কীর্তন, জারি, বাউল, ভাটিয়ালি। মাইজভাণ্ডারি, মুর্শিদি, মারফতি, বিচার, মনসা ভাসান, ধামইল, ধুয়া, হুদমার গীত ইত্যাদি।

খ. প্রেম ও বিনোদনধর্মী : আলকাপ, খোসা, ঘাটু, বারমাসী, বিচ্ছেদি, ভাওয়াইয়া, সারি ইত্যাদি।

গ. কর্ম ও শ্রম সংশ্লিষ্ট : ক্ষেত নিড়ানি, ধান কাটা, পাট কাটা, ছাদ পিটানো, ধান ভানা, হাতি খেদা।

ঘ. পেশা ও বৃত্তিমূলক : খেমটা, পটুয়া, পালকি, ফেরিওয়ালা, বেদে, সাপুড়ে, বাওয়ালি, হিজড়া, নটী।

ঙ. হাস্য কৌতুকমূলক : গম্ভীরা, চটকা, পালকি, হাবু ইত্যাদি।

চ. মিশ্র ভাব বিষয়ক : কবিগান, নাটুয়া, মেয়েলি গান ইত্যাদি।

বরুড়া এলাকায় জারি, কীর্তন, মুর্শিদি, বাউল, শ্রম সংগীত, মাগন গান, পল্লীগীতি, বিয়ের গান, মাইজভাণ্ডারি গান, ঘুমপড়ানি গান, উল্টাগীত, গাজীর পটের গান, হাস্য রসাত্মক গান ইত্যাদির প্রচলন আছে। নিম্নে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সহ সেসব গান সন্নিবেশিত হলো।

১. মুর্শিদি গান

অধ্যাত্ম সাধনপথের নির্দেশককেই মুর্শিদ বলে। সুতারাং অধ্যাত্ম সাধনার নির্দেশমূলক গানই মুর্শিদি গান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হলেন মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক। এদেশে মুসলিম বিজয়ের পর পীর দরবেশেগণ ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইসলামের সুফি ভাবধারার সঙ্গে পীর মুর্শিদের যোগ রয়েছে। সুফি মতবাদে মুর্শিদকে অতি উচ্চে স্থান দেয়া হয়েছে। একজন মুর্শিদের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে তারা মুর্শিদের মাহাত্ম ও গুণগান গায় এবং চরণাশ্রয় কামনা করে।

কুমিল্লা অঞ্চলে পীর সাধকদের আনাগোনা বেশি। মৃত বিখ্যাত পীরদের মাজার এবং জীবিত পীরদের খানকাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লায় মুর্শিদি গানের চর্চা গড়ে উঠেছে। তেমনি একটি মুর্শিদি গান নিম্নে দেওয়া হলো ,

১. প্রাণের মুর্শিদ আমরারে
পাগলও বানাইয়া গেলরে।
পাগলও বানাইলরে বাবায়
দেওয়ানা বানাইল
কী না মন্ত্র দিয়া মুর্শিদ
ঘরের বাহির করলোরে। [তারপর আবার ১ম কলি]

উঠিল গোলাপের চারা
বাইরা পড়ে ফুলরে মুর্শিদ
বাইরা পড়ে ফুল
তোমার সনে প্রেম করিয়া
দয়াল গেল জাতি কুলরে।

আগে ত না জানি বাবা
প্রেমের এত জ্বালারে দয়াল
প্রেমের এত জ্বালা
না করিতাম প্রেমরে মুর্শিদ
আমি থাকিতাম একেলারে। [আবার প্রথম কলির পুনরাবৃত্তি]

রেজভী মাওলায় আমরারে
পাগল ও বানাইয়া গ্যালরে
একদিন গ্যাল, দুই দিন গ্যালো
বইসারে দিন গুণি রেজভী
বইসারে দিন গুণি
কোনদিন জানি আসব আমার
মুর্শির্দ গুণমণিরে
প্রাণের মুর্শিদ আমরারে
পাগলও বানাইয়া গ্যালরে
অলি আল্লাহ আমরারে
পাগল ও বানাইয়া গ্যালরে।

আর কোনো ধন চাই না মুর্শিদ
যাইবার কালে সঙ্গে নিও
ওই বাজারের মার্কিন কাপড়
আমার অঙ্গে না লাগাইও
মুর্শিদের ছিড়া ত্যানা দিয়া
আমারে কাফন দিও।

আর কিছু ধন চাই না মুর্শিদ
যাইবার কালে সঙ্গে নিও।
ঐ বাজারের আতর গোলাপ
আমার অঙ্গে না ছিটাইও
মুর্শিদেরও পায়ের ধুলা
আমর গায়ে ছিটাইয়া দিও
যাইবার কালে মুর্শিদ তুমি
এই আমারে সঙ্গে নিও।

আমারও মরণের কালে
তুমি মুর্শিদ সামনে থাইক ও
মুনকির নাকিরের সোয়ালের জওয়ার
তুমি নিজে দিয়া দিও। ঐ

মুর্শিদের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া
আমার কবরের অ ঘর বানাই অ
মুর্শিদের মতো ভাবক পাইলে
আমার জয়নাম করিয়া দিও
আর কোনো ধন চাই না মুর্শিদ
যাইবার কালে সঙ্গে নিও।

তথ্যসূত্র : আবদুল হক, খাদেম, অলহর দিঘি মাজার, মুগুজী, বরুড়া, কুমিল্লা

ব্যাখ্যা : এই গানে ভক্তের পারলৌকিক চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে। ভক্তিমূলক গানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুর্শিদি গান। এই গানগুলোতে পরকালের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য ভক্তের আকুতি লক্ষণীয়। তবে এই যাত্রায় ভক্ত একমাত্র মুর্শিদকেই ভরসা করে থাকে। গানটিতে দেখা যায় মৃত ভক্তের দাফনের উপকরণগুলোর জন্যও ভক্ত মুর্শিদের ওপর নির্ভরতার ইচ্ছা পোষণ করছে। দোকানের মার্কিন কাপড়ের বদলে মুর্শিদের ব্যবহৃত পোশাকের ছেঁড়া অংশ, আতর-গোলাপের পরিবর্তে মুর্শিদের পায়ের ধুলা এমনকি কবরের বাঁশটিও যেন মুর্শিদের ঝাড়ের হয় এটি ভক্তের আবেদন। নিজেকে সমর্পণের এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোন লোকসংগীতে দেখা যায় না।

২. আমি গাউছে পাকের নাম ধরিয়া
দিয়াছি সাঁতার
আমি অলি আল্লাহর নাম ধরিয়া
দিয়াছি সাঁতার (চরণগুলোর পুনরাবৃত্তি)

নবি আমরার জানেরই জান
নবি আমরার পায়ের কাণ্ডার
হাসরে তরাইয়া নিবে।
উম্মত গুনাহগার।
দয়াল নবির নাম ধরিয়া
দিয়াছি সাঁতার।

আমি গাউছে পাকের নাম ধরিয়া দিয়াছি সাঁতার
আমি অলি আল্লাহর নাম ধরিয়া দিয়াছি সাঁতার
পার কর ডুবাইয়া মার
মাইমা তোমার
গাউছে পাকের নাম ধরিয়া দিয়াছি সাঁতার।

উদয় হইলা বোগদাদ ভূমি
মাপ করিয়া কবর আজাব
মুর্দা মানুষ জিন্দা করে
দেখাইলা প্রমাণ (ঐ)

মাইয়া মানুষ পুরুষ বানাও
বোগাদাদের মাজার
আমরা অলি আল্লার নাম ধরিয়া দিয়াছি সাঁতার।
মুর্শিদ মাওলার নাম ধরিয়া দিয়াছি সাঁতার।

ব্যাখ্যা : এই গানটি ভক্তদের নিকট খুবই প্রিয়। যারা মুর্শিদকে ভালবাসে এবং মুর্শিদি গান গায় তারা সচরাচর শুরুতেই গায় এ গানটি।

কেমনে যাব প্রেমের মদিনায় নবিজী
কেমনে যাব সোনার মদিনায় (২বার)
নবি আপনার প্রেমের পরশ পাইয়া
কত লোক যায় আউলিয়া হইয়া
কেমনে যাব প্রেমের মদিনায় ওগো নবিজী
কেমনে যাব সোনার মদিনায়।
গ্যালে মুর্শিদের দরবারে
আল্লাহ নবির দিদার মিলে (২বার)
কেমনে যাব সতরশ্রীর দরবারে গো নবিজী
কেমনে যাব রেজভীয়া দরবার। (২বার)
গ্যালে সতরশ্রীর দরবারে
আল্লাহ নবির দিদার মিলে গো
গ্যালে রেজভী বাবার দরবারে
আল্লাহ নবির দিদার মিলে গো
কমনে যাব মুর্শিদের দরবারে গো নবিজী
কেমনে যাব সতরশ্রীর দরবার।
নবি আপনার প্রেমের পরশ পাইয়া
আমার মুর্শিদ যায় আউলিয়া হইয়া
কেমনে যাব মুর্শিদের দরবারে গো নবিজী
কেমনে যাব রেজভীয়া দরবার।

ব্যাখ্যা : এই গানটিতে নবিজীর কথা থাকলেও এটি নাতে রাসুল নয়। মুর্শিদকে পাওয়ার আকুল বাসনা, মুর্শিদের দরবারে যাবার উপায় খুঁজতে ভক্তগণ নবিজীকে স্মরণে নিচ্ছে।

২. জারিগান

জারি সমষ্টিবাচক গান। কারবালার বিষাদ কাহিনিকে নিয়ে মহররম উপলক্ষে পরিবেশিত করুণ ও বীর রসের গানকে জারি গান বলা হয়। ১০-১২ জনের একটি দল গঠন করে জারিগান পাওয়া হয়। দলনেতাকে সরকার এবং অন্যদের দোহার বলা হয়। দোহাররা তল্লা বাঁশের তৈরি ঝাণ্ডি হাতে নিয়ে চক্রাকারে নাচে এবং ঝাণ্ডি পরস্পরায় আঘাত করে ঝনঝন আওয়াজ তোলে। কারবালার কাহিনিকে ছোট ছোট ঘটনার ভিত্তিতে গানে তুলে ধরা হয়। সরকার দিশা গেয়ে দোহারদের ধুয়া ধরিয়ে দেয় এবং তারা সকলে তা পুনারাবৃত্তি করে থাকে।

১. জয়নাল পত্র লেখরে মাহুদ হানিফারও ঠাই
বান্দির পুত এজিদে বইদাছে প্রাণের ভাই
মাহুদ পত্র লেখরে হানিফার ও ঠাই

২. মোসলেম কাইন্দা কয়
কুফায় যাইতে লয় না আমার মন
না জানি কুফাতে গ্যালে হইবে ক্যামন
নিশ্চয় এ জানিয়াছি ভাই কুফাতে মরণ
মোসলেম কাইন্দা কয়---।

৩. কার জাদুয়ায় কান্দেরে বসিয়া মদিনায়
সোনার চাদর গায়েরে শোমাইয়া ঘোম যায়।
উঠরে জাদুয়ার মনি ডাকছারে তোর মায়
আল্লাহ! কার জাদুয়ায় কান্দেরে বসিয়া মদিনায়।

৪. ইমাম কে বইদাছরে নানাজীরও প্রাণ
আবে ঘিরিয়া আছে আকাশেরি চান
ইমাম কে বইদাছরে---

৫. আল্লাহ কররে আছান
একদিন ফাতেমা জান কারবালা ময়দান
আল্লাহ কররে আছান।
হায় হায় হায়রে অ!
কাশেম যায়রে রণে কান্দে সখিনায়
বিয়ার রাত হইল বাড়ি বিবি ছখিনায়
মা ও বাড়ি, ঝি ও বাড়ি
বাড়ি বিবি ছখিনায়

এক ঘরেতে তিন জন বাড়ি
খালি সোনার মদিনায়।

তথসূত্র : অবসর প্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক মো. আবুল কাশেম মাস্টার, বয়স ৮০, মহেশপুর, বরুড়া

মহররমের জারিগান

১. গুনের ভাই ভাইরে আমার সোনার চান মনি
আঁখি মেইল্যা কও বাছা, বচন কও শুনি
কে তোরে খাওয়াইল জহর আমরা ত না জানি
গুণের ভাই, ভাইরে আমার সোনার চান মনি।

২. হোসেন আলী কান্দিয়া বলে হাসান আলী ভাই
তুমি যে ছাড়িয়া যাইবা আমার কী উপায়।
ছা-রদ নাহি হবে হুকুম কখনো আল্লার। ঐ

৩. আল্লাহ আছিলাম দুই ভাই জোড়ে কবুতর
বাদশাহি করিয়াছি মোরা দুনিয়ার ওপর
এ কারণে কর্ম হবে কিয়ামতের পর। ঐ

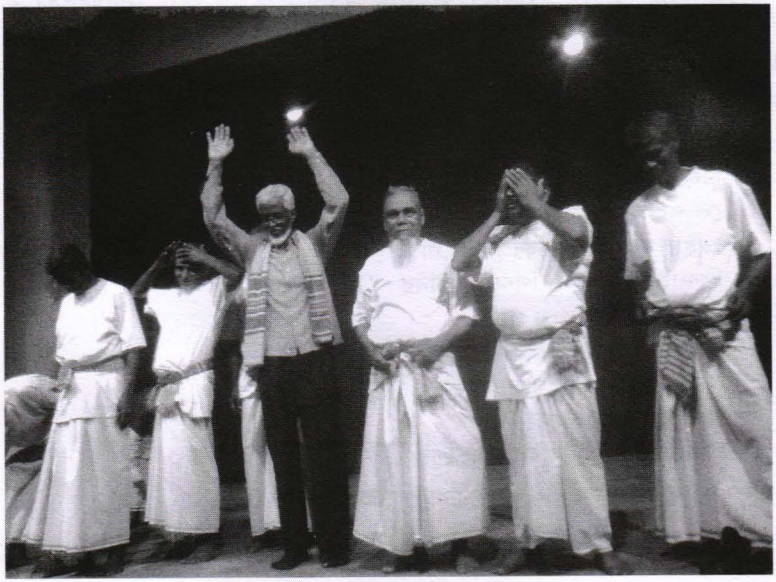

জারিগান পরিবেশন শেষে মানিক সরকার ও তার দল

৩. কীর্তন

ধর্ম সাধনার অঙ্গ হিসেবে হিন্দু সমাজের, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকজন কীর্তন গান গেয়ে থাকে। কীর্তন সম্পর্কে একটি প্রবাদ চালু রয়েছে।

"ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেণ, তবে ঘরে বসেই কীর্তন শুনব।" পুরুষগণ রাতে কীর্তনে মেতে ওঠে। প্রায় সারারাত তারা বাক্যের সুরে তন্ময় থাকে। হরিবোল হরিবোল গাইতে গাইতে কীর্তনীয়ারা ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে যায়। কীর্তনকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র দানের কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্যের। নগরকীর্তন ও নামসংকীর্তন তিনিই প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন গানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা ভিত্তিক পদাবলী কীর্তনই জনমানুষের হাতে লৌকিক কীর্তনে পরিণত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের যশ বা মাহাত্ম গাথা থেকেই কীর্তন গানের উদ্ভব হয়েছে। নামকীর্তন ও পালাকীর্তন কীর্তনের দুটি ধারা। বরুড়া এলাকায় নাম কীর্তনের চর্চাই বেশি চোখে পড়ে। সাধারণ মানুষের নিকট নামকীর্তনই জনপ্রিয়। নাম কীর্তনের মূল রূপটি নিম্নরুপ–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।

একই পঙক্তিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে কীর্তনের ভাবরসকে ঘনিভূত করা হয়। খোল বা মাদল এবং জুড়ি করতাল সহযোগে কীর্তনের আসর বসে। কীর্তনে ছন্দের উঠানামা বেশ চোখে পড়ে। ঢিমে তালের ছন্দ হঠাৎ করে দ্রুত তালে নেয়া হয় আবার হঠাৎ করে ঢিমে তালে ফিরে যাওয়া হয়।

নিচের গানটিতে বিয়ের আন্দময় অনুভূতি ধরা পড়েছে,

আইজ বুঝি টুনি বিবির বিয়া গো
টুনিরে কে পরাইবো অলদি (হলুদ) মেন্দি
কে পরাইব শাড়ি গো
আইজ বুঝি টুনি বিবির বিয়া গো।
পিন্দাইব (পরাইব) পিন্দাইব টুনির
সাত ভাইয়ের বউয়ে গো
আইজ বুঝি টুনি বিবির বিয়াগো
টুনিরে কে দিবগো গাও গোছল
কে পরাইব তেল গো
আইজ বুঝি টুনি বিবির বিয়া গো।

তথ্যসূত্র : লুৎফা বেগম, ৩২ বছর, গামারুয়া, বরুড়া

৪. সারি গান

সারি গান বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। মূলত নৌকার মাঝি মাল্লাদের গান। তবে এর মর্মের বিষয়টি যুক্ত থাকে। মাঝিরা স্রোতের অভিমুখে নৌকার বৈঠা

ধরে আয়েশে যে ভাটিয়ালি গায় তার সাথে সারি গানের পার্থক্য আছে। সারিতে সারিতে নৌকা সাজিয়ে রাখা কিংবা সারি বেঁধে নৌকা দৌড়ে অংশ নেওয়ার জন্য সারি গানের নামকরণ হয়েছে। সারি গান কর্মসংগীতের অর্ন্তভুক্ত। বর্তমানে নৌকাবাইচ ও সারি গানের আনুষ্ঠানিক আয়োজন চোখে পড়ে। ২০-৩০ জন শখের বাইচাল বা দাঁড়ি একত্রে বসে বৈঠা টানে। এসব নৌকা লম্বায় বেশি ও প্রস্থে খুবই কম হয়ে থাকে। মূলত উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব টিকিয়ে রাখার জন্যই এ গানের ব্যবস্থা। দেহতত্ত্ব, নরনারীর লৌকিক প্রেম বিরহ, রাধা-কৃষ্ণ, রঙ্গ-তামাসা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় সারিগানের বিষয়বস্তু। গোমতী, মেঘনা, ডাকাতিয়া, সালদা ইত্যাদি নদীকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে নৌকার সারিগান সৃষ্টি হয়েছে। লোকের মুখে মুখে কিছু গান এখনো টিকে আছে।

ওরে কার ঝিয়ারী নদীর ঘাটে যায়
খাইল্যা কলস কাঙ্কে নিয়া জলেতে ডুবায়
জলেতে ভিজলো কইন্যার হলুদ বরণ পাও
কার বা ঘরের কইন্যা তুমি বারেক ফির‍্যা চাও

লাও দৌড়ানী গানে নৌকা তীব্র গতি লাভ করলে গানের কথা লুপ্ত হয়। তখন সকলে মিলে উচ্চারণ করে,

হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো
আল্লাহ বল হেঁইয়ো
সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।

ধান ভানার গান

কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় একে বারা ভানা বলে। এখন সবাই কলেছাটা চালের ভাত খেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু আগে গ্রামের মহিলারা ঢেঁকিতে চাল তৈরির কষ্টসাধ্য কাজ করতো। তবু তারা গানের মাধ্যমে বিষয়টিকে করে তুলেছে আনন্দময়,

আমরা ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া
ঢেঁকি নাচে আমরা নাচি হেলিয়া দুলিয়া
আমরা ধান ভানি রে!

কর্মসংগীতের কথা উঠলেই মনে পড়ে নজরুলের সর্বহারা কাব্যের কথা। একাব্যে কবি কৃষক, শ্রমিক ও ধীবরদের গান রচনা করেছেন যা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজ উপাদানে ভরপুর। তাদেরকে সংঘচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে নজরুল রচনা করেন অসামান্য শ্রমসংগীত।

পানের সারিগান

পান চাষের একটি প্রধান এলাকা হিসেবে বরুড়া অঞ্চলে পানের সারি গানের অস্তিত্ব এখনো খুঁজে পাওয়া যায় বারুইদের মুখে,

পান খাও পণ্ডিত ভাই কথা কও ধারে
পান গুয়া জর্ম (জন্ম) অইছে কোন আতসারে

যে না জানে পানের মর্মকথা
ছাগলে খায় হাওড়া পাতা
হাঙ্গাঅলনীর পুত বা বিয়াইস্থির পুত
প্রাণের বাডা কোনডাই থুইচে
বান্দির পুত্রের ঘাড় খাও
ঠাকুর সকল পান খাও।

শ্রমসংগীত হিসেবে কুমিল্লা অঞ্চলে পাট কাটার গান, ক্ষেত নিড়ানি গান, গাছের গুঁড়ি ঠিলা বা গাছ কাটার গান (বৃক্ষ কর্তন সংগীত), কোন কিছু মাপ বা ওজন করার সময়ে উচ্চারিত সংগীত প্রচলিত রয়েছে।

ক্ষেত নিড়ানির গান

গৃহস্তের বিশাল ফসলের ক্ষেত্র যখন গজিয়ে ওঠা আগাছায় ভরে যায় তখন অনেক কামলা বা বদলা নিয়োগ করে ক্ষেত নিড়ানির ব্যবস্থা করা হয়। কামলারা অর্থাৎ কৃষি শ্রমিকগণ তখন সবাই মিলে গান ধরে,

চলরে তোরা ক্ষেত নিড়াইতে যাই
ক্ষেত্রের আগাইচ্ছা সব উলডাইয়া হালাই
কামের শ্যাষে গিরস্ত ঘরে খাইব বালাবুরা (ভালমন্দ)
তোরা আয় হগলে (সকলে) কিবা জোয়ান বুড়া (বৃদ্ধ)
খাওয়ার পরে আরও খাইব তামুক বিড়ি পান
সবাই মিথ্যা গারাম তহন, রঙ্গ রসের গান
চলরে তোরা ক্ষেত নিড়াইতে যাই। [আমিন, কৃষক, মহেশপুর]

৫. পটুয়া সংগীত

পটুয়া পেশা ও বৃত্তিমূলক সংগীত। পটুয়ারা কাগজে ও মৃৎভাণ্ডে পট আঁকে, অঙ্কিত চিত্র অনুযায়ী গান বানায় এবং গ্রামে গঞ্জে, বাড়িতে বাড়িতে এ পটচিত্র দেখিয়ে এবং গান শুনিয়ে তারা জীবিকার্জন করে। বর্তমানে তাদের খুব একটা দেখা যায় না। তবে মুখে মুখে কিছু গান এখনো জীবন্ত আছে। পটুয়াকে একই সঙ্গে পালন করতে হয় চিত্রকর, গীতিকার ও গায়কের ভূমিকা। অথচ অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে সমাজে তাদের অবস্থান একেবারে প্রান্ত সীমায়। রাধা কৃষ্ণ, রাম সীতা, গাজীপীর, লৌকিক ধর্ম ইত্যাদি এ সংগীতের বিষয়বস্তু।

যেই বা নারী গোছল করে কেশের আগা (শীর্ষ) চায়
ছয় মাসের আয়ু থাকতে স্বামী মারা যায়।
রাধিয়া বাড়িয়া যে কন্যা স্বামীর আগে খায়
ভরা ঠিল্লার পানি তিরাসে শুকায়।
যেই নারী ঘরের মধ্যে বড় শ্বাস ফালায়
ভরাট কলসের পানি সহজে শুকায়।

উক্ত গানটিতে লোকজনের বিশ্বাসের কথা উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক বিরত্বপনাও এতে লক্ষণীয়।

৬. মারফতি গান

মারফত শব্দের অর্থ মাধ্যম। এই গান আদান প্রদানের মাধ্যম। মুর্শিদি গানে ভক্ত গুরুর কাছে আকুতি করে। আর মারফতি গানে ভক্তের আকুতি হয় সরাসরি আল্লাহর কাছে। মারফতি সুফিপন্থী ভক্তিমূলক গান। পরমাত্মা আল্লাহর প্রতি প্রেম ভক্তি নিবেদন করে মরমি সাধকগণ এই গান করে। তারা আল্লাহ দয়াল, মনুরায়, সোনার পাখি ইত্যকার প্রতীকী ভাষায় অভিহিত করে থাকে। স্রষ্টার গুনকীর্তন, রাসুলের প্রশস্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরকাল ভাবনা এই গানের বিষয়বস্তু। এ গানের সুরে বেদনা ও কান্না আছে। জীবনের অনিত্যতার কথা এবং পরকাল পূর্ণতা এর সুর। এতে ভাটিয়ালি সুরের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন,

১. সামালরে তরী ভাই, ডুবিল রে মনা ভাই
মহাজনের জিনিস লয়ে লাভ করিতে আইলাম ভবে
পড়িয়াছি বর্গের হাতে, বিকিনিকি নাই
আমি কি ধন লইয়া যাব দেশে রে
কী দিয়া মহাজন বুঝাই, ও মনা ভাই।

সেই পারেতে যাওয়া হইল
কুম্ভীরীতে চাইয়া রইল
দাঁড়ি মাঝি সবাই গেল
আমার কোন উপায় নাই
আমি চাইয়া দেহি সব বিদেশিরে
আমার দ্যাশের একজনও নাই
ওরে মনা ভাই . . . ।

ব্যাখ্যা : বাংলা নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এবং বাংলার মানুষ পরকালতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে নদী-নৌকার রূপক-প্রতীকের ব্যবহারই ছিল স্বাভাবিক। ক্ষণস্থায়ী মর্ত্যজীবনে চিরস্থায়ী পরকালের জন্য পূণ্য সঞ্চয় করতে হয়।

২। হিসাব করে দেখলি না মন
এই বয়সে কি লাভ কল্লে (করলে)
ছিলাম যখন মাতৃকুলে
গ্যালরে মন ধুলায় খ্যালে
মায়া রসে ডুইব্যা রইলে
কাল কাটাইলে অজ্ঞান ছলে।

আসল যখন সুখের যৌবন
লাভ হবারই কথা রইলে
কামে রসে কামিনীর কোলে
রঙ্গে রঙ্গে কাল কাটাইলে
আসল যখন বৃদ্ধাবস্থা

সাধন ভজন সবাই গ্যালে
ভক্তি স্তুতি দূরে থাকুক
উঠতে বসতে অক্ষম হইলে
কত আশা কইরাছিলাম
তিন কাল গ্যাল বৃথা চলে
কেবল মাত্র আছে ভরসা
গফুর আমার দয়াল বলে।

৩. দয়াল আমায় পাড়ে নিয়া চল
তুই বিনা অনাথের বন্ধু
কে আছে আর বল
আমায় পাড়ে নিয়া চল।

একে আমার জীন্ন (জীর্ণ) তর
পাপে দেহ বোঝাই ভারী
ভরং সাগরে লইলাম পাড়ি
পাইলাম না তার কোন কূল।
মাঝি নয় সে কাজের কাজী মাল্লা ছয় জন ভীষণ পাজি
ভব সাগরের মাঝা-মাঝি
কোন পাকে যে ঘুরায় হাল
দয়াল আমায় পাড়ে নিয়া চল।

তাদের পরিবেশিত জারিগানের নমুনা :

তা ভাই ইমাম অ
বেঈমান শহরে যাই ও না
সেই শহরে জহর মিলে
পানি মিলে না
সেই শহরে গেলে ইমাম
জানে বাঁচবা না
অ-ভাই ইমাম অ
বেঈমান শহরে যাইও না।

যার যার ভাবনা কর
থাকিতে মম এ সংসারে
তালাশ কর তারে মনরে
তালাশ কর তারে।

করিলে নামাজ বন্দেগি
সর্ব অঙ্গ হবে নেকি
বিনিয়েতে ডাকছে খাকি

আয়রে আমার ঘরে।

খাক যাবে থাকে মিশে
বাদ যাবে গো উড়ে
আতথে আপ মিলাইবে
রুক্ত মিশবে, শূন্য কারে।

যার যার ভাবনা কর
থাকিতে মন এ সংসারে
তালাশ কর তারে মনরে
তালাশ কর তারে মনরে
তালাশ কর তারে।

৭. ভাটিয়ালি

ভাটি শব্দের পর ভাবার্থে আল প্রত্যয় যোগ করে ভাটিয়াল এবং তারপর ভাটিয়ালি শব্দটি গঠিত হয়েছে। নদী-নালার দেশ বাংলাদেশে ভাটিয়ালি গান বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। এটি সারিগানের মত নদী নৌকা মাঝি কেন্দ্রিক গান। উভয় গানের বিষয়বস্তু লৌকিক ও অধ্যাত্মিক প্রেম এবং রাধা কৃষ্ণ লীলা ইত্যাদি। তবে সারি গান শ্রমসংগীত, কিন্তু ভাটিয়ালি মাঝির শ্রমহীন অবসর বিনোদনের গান। বাতাসের অনুকূলে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে আলতো ভাবে হাল ধরে রেখে মাঝি ভাটিয়ালি গেয়ে তার শ্রান্তি নিবারণ করে। ভাটিয়ালি একক কণ্ঠের গান ও প্রলম্বিত লয়ের গান। ভাটিয়ালির ভাব গুরুগম্ভীর ও বেদনাশীল আর সুর করুণ ও উদাসী। গোমতী, মেঘনা, ডাকাতিয়া, সালদা নদী কেন্দ্রিক কুমিল্লার গানগুলোতেও এই সুর লক্ষণীয়। যেমন,

১. উজান দেশের মাঝি ভাই ধন
ভাটির দেশে যাও
বাজানেরে কইও খবর
দেখা যদি পাও।
নন্দের চোখে বিষ হইয়াছি।
শাশুড়ির চোখে শাল (মর্মান্তিক দুঃখ)
ডাইনের কপাল বাঁয়ে গ্যাছে
আমার দুঃখের কাল।
আমার কানতে (কাঁদতে) কানতে জনমগ্যাল
পথের দিগিল (দিকে) চাইয়া
এই না গাঙে দিয়ারে মাঝি
এই না গাঙে দিয়া
কত নাও (নৌকা) আইয়ে ও যায়
আমি থাকি চাইয়া
এবার যদি না নেয় নাইওর

নায়ে ছইয়া দিয়া
কয়দিন বাদে আইবার কইও
বাঁশের পালং লইয়া
আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাব
বিষের বড়ি খাইয়া

তথ্যসূত্র : রফিয়া বেগম, মিজার্নগর, বরুড়া

৮. মাইজভাণ্ডারি গান

উনিশ শতকের শেষদিকে এ গানের উদ্ভব। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার নিবাসী হযরত গাউসুল আজম মাওলনা সৈয়দ আহমেদ উল্লাহ (১৮২৬-১৯০৬) মাইজভাণ্ডারি তরিকা প্রবর্তন করেন। এ তরিকা বা মতবাদের সাধন সংগীত হিসেবে এ গানের জন্ম হয়েছে। এই মতবাদের অনুসারীরা ঢোলের তালে তালে দলবদ্ধভাবে গান গায়। এ সময় তারা নৃত্য বা হাল্কা জিকির করে থাকে। বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারি গানের একজন স্রষ্টা। কুমিল্লা জেলায় মাইজভাণ্ডারি তরিকার লোক রয়েছে বলে তাদের মাধ্যমে এ গান ছড়িয়ে পড়েছে। বরুড়ার ভক্তদের নিকট নিম্নের গানটি খুবই প্রাণপ্রিয়।

তোরা দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে
হইতেছে নুরের খ্যালা।
নুরের মাওলা বসাইয়াছে
প্রেম শিক্ষারই পাঠশালা।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ রবে
নানান বাদ্য শোনা যায়।
গাউসুল আজম শব্দ করে
আশেকানে হুঁশ হারায়।

৯. উল্টাসংগীত

এই গানগুলোতে কোন প্রাণী, মানুষ ও বস্তুর স্বভাবধর্মে সম্পূর্ণ বিপরীত মাত্রা লক্ষ করা যায়। যেমন,

নাও শাতাত দি পাতলা বায়
জাউল্যা দৌড়ায় মাছে
শিশিভরা ধান চাউল
গোলাভরা তেল
কাপড়ের খোঁচা লাইগ্যা
বেড়া ভাইঙ্গা গ্যাল।

তথ্যসূত্র : সুফিয়া বেগম, মহেশপুর, বরুড়া

১০. হাস্য-রসাত্মক গান

বরুড়া এলাকায় রঙ্গ রসাত্মক গানের সন্ধান পাওয়া গেছে। লোকজ জীবন ঘনিষ্ঠ উপকরণ নিয়েই হাস্যরস সঞ্চার করে মানুষের মুখে গানগুলো রচিত হয়েছে। যেমন–

এই বাড়ির কুটনা বুড়ি
হেই বাড়িতে যায়
পথের মধ্যে মরা ইন্দুর
দুই হাতে কিলায়
কিলাইতে কিলাইতে ইন্দুর
করলো থেতা আর ভেতা
আর কাটবি নি শালার ইন্দুর
নাতিন জামইর খেতা (কাঁথা)

তথ্যসূত্র : শওকত আলী মাস্টার, জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা

১১. বারমাসী

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বছরের বার মাসের বিরহ বেদনার বিচিত্র রূপ এতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে এ বিরহ একান্তই নারীর। প্রিয়জন বা প্রাণের পতিকে ছেড়ে বার মাসের বছর পার করতে গিয়ে নারীর অন্তর্জগতে যে বেদনা সঞ্চারিত হয় তা নিয়েই নারীরা মুখে মুখে রচনা করেছে এ বিচ্ছেদি গান। বার মাসের ঋতুবৈচিত্র্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয় সে পরিবর্তিত পরিবেশের পরিচিত উপাদান অনুসারেই এ গান রচিত হয়ে থাকে।

কুমিল্লায় প্রচলিত একটি বারমাসী নিম্নরূপ,

পরথম (প্রথম) অ বৈশাখ মাস
না পুরে রমণীর আল
বন্ধু জানি রইল কোন দ্যাশের (দেশেরে)
তুমি আর না আসিলা দেশে।

আহা বন্ধু পরাণের সখা
জৈষ্ঠ্য মাসে না দিলা দেখা
নানা মিষ্টি ফল বৃক্ষের ডালেরে

তুমি আর না আসিলা দ্যাশে
আমার আদ্দিষ্টে (কপালে) নাই
বন্ধু আমার রইল কোন ডাই (কোথায়)
ফল হাতে আর হৃদয়ে আগুনরে
তুমি আর না আইলা দেশে।

আষাঢ়ে বরর্ষর (বর্ষার) জোর
আকাশে মেঘের ঘোর

প্রাণের ভয়ে কাঁপে থরথররে
তুমি আর না আসিলা দেশে।

ভাদর (ভাদ্র) মাসে তালের পিঠা
আশ্বিনেতে শমা মিঠা
বন্ধু তুমি রইলা কোন দেশেরে
তুমি আর না আসিলা দেশে।

কাতি (কার্তিক) মাসে ধানের ক্ষীর
রমণীর নয়নের নীর
বন্ধু তুমি রইলা দেশান্তরে রে
তুমি আর না আসিলা দেশে।

আগুন (অগ্রহায়ন) মাসে নোয়া খাইলো
পৌষ মাস আন্ধাইরে গেল
নিত-নতুন (টাককা) খায় ঘরে ঘরে রে
তুমি আর না আসিলা দেশে।

মাঘ মাসে শীতের জ্বালা
ঘরে থাকি আমি একেলা
তুলার বালিশ থাকে বুকেরে
তুমি আর না আসিলা দেশে।

১২. টিপরা গান

কুমিল্লা জেলায় বসবাসরত একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায় হলো টিপরা বা ত্রিপুরা। গান-বাদ্য-নৃত্য তাদের জীবন যাপন প্রণালীর অন্যতম অনুষঙ্গ। তাদের গানের ভাষায় পাহাড়ি পরিচিত জগতের বিচিত্র অনুষঙ্গ উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে। তারা ককবরক ভাষায় কথা বলা। লালমাই পাহাড়ের জামমুড়া নিবাসী স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা নিম্নের গানটি পরিবেশন করেন। ককবরক ভাষায় গানের ভাষা নিম্নরূপ–

খুম্বুবার বাদশা
খলনা থামানি
ইয়াগপামানি বুচু
খলমা নিদাই চা
না খৈল যা চা

তথ্যসূত্র : স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা, বয়স ২০ বছর, শিক্ষা ৮ম শ্রেণি, জামমুড়া, লালমাই পাহাড়, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

গানটির বাংলা অনুবাদ

একটি ফুল ছিঁড়তে গিয়েছিলাম
হাতে কাঁটা ফুটেছিল

ফুলটা তোলা কি ভাল হবে?
নাকি না তোলা ভাল হবে।

১৩. মেয়েলি গীত

সাধারণ নারীমনের আবেগানুভূতি তাদের সুখ-স্বপ্ন, কল্পনা, অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার কথা এরা গানের ভাষায় প্রকাশ করেছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ নারীকে বোবা হয়ে জীবন যাপন করতে হয়। তাই নারীর অন্দর-মহলে তারা রচনা করেছেন বেদনার শিল্প ভাষ্য-ঝিনুক যেমন করে তার প্রদাহকে মুক্তোয় পরিণত করে তেমনি ভাবে। গ্রাম্য নারীর অবচেতন মনের ইচ্ছা অনিচ্ছা, উচ্ছ্বাস অবদমন ও দেহধর্মের কথা গানগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। বিয়ের গানও মেয়েলি গীতের অংশ। তবে এখানে বিবাহাচারের বাইরে নারীর একান্ত কণ্ঠের গানগুলো পরিবেশন করা হলো,

বাবার দিন্যার (দিনের) কলসির পানি গো
বাউজানি (বাপজানে) গরছেন, খাইতাম আইছিলাম ওরে
তোমার বাবার দিন্যার কলসির পানি গো (২)
ননগো (ননদ) জালের ঘাটে ভাইঙ্গা লাইছিনা মোরে
কিবা নাইসর আনছিলেন ভাইধনও
ভাইধন আমার জলনী (জননী) নাই ঘরে
ভাইধন আমার পূরণী (বাবা) নাই ঘরে
বাবার দিন্যার বাউন্দার (ভিতর ঘর) খানি গো (২)
বাউজানি গড়ছেন, খাইতাম আইছলাম ওরে
তোমার বাবার দিন্যার 'ডেক ও ডেকচি' (হাড়ি-পাতিল) গো
ননগো চোরে নিচিগ্না মোরে (ঐ 'কিবা নাইসর')
বাবার দিন্যার মাইজ্যাল খানিগো
বাউজানি গড়ছেন, শুইতাম আইছিলাম ওরে
তোমার বাবার দিন্যার মাইজ্যাল খানি গো
ননগো উন্দুরে (ইঁদুরে) খাইয়া লাইছে মোরে (ঐ)
বাবার দিন্যার বাক্স চহি (চৌকি) গো
বাউজানি গড়ছেন, বইতাম আইছিলামরে
তোমার বাবার দিন্যার বাক্স চহি গো
ননগো, উলুয়ে খাইয়া লাইছে মোরে।
কিবা নাইসর আনছিলেন ভাইধনও
ভাইধন আমার জলনী নাই ঘরে
ভাইধন আমার পূরণী নাই ঘরে।

তথ্যসূত্র : মাছুমা বেগম, বয়স ৩৫, মৈশাতুয়া, মনোহরগঞ্জ

ব্যাখ্যা : এই গানটিতে নারী জীবন বাস্তবতার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র ফুটে উঠেছে। বলা হয় নারীরা স্বামীর বাড়ি ও বাপের বাড়ির অস্থায়ী বাসিন্দা। ভাই বোনকে নাইওর এনেছে। কিন্তু ভাবির জন্য তার বাবা মায়ের গড়া সংসারের কোথাও ঠাঁই হচ্ছে না

তার। বাপ মায়ের মৃত্যুর পর বাপের বাড়িতে বেড়াতে এলে মেয়েরা কতটা অযত্ন অবহেলার শিকার হয়ে গানে সে পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪. বিয়ের গীত

১. আজ ছাড়ি ভরণ বুশা
আজ ফুলের মালা
পথ আইযে আইয়েরে কুণা
ময়নারো মিলনে রে...
এতদিন ছিলিরে কুলা বক্সগঞ্জ বাজারে
আজ কেন আইলিরে কুলা
ময়নারো
মিলনেরে...
এতদিন ছিলিরে মেন্দি গাছেরও ডালেতে
আইজ কেন আইলিরে মেন্দি ময়নারো
হাতে রে...
এতদিন ছিলিরে ময়না মায়েরি আঁচলে
আইজ বুঝি যাইবেরি ময়না মদনপুর
গ্রামে রে...।

২. কি না বিয়া দিছেন আম্মা
আঙ্গল জাঙ্গাল চাইয়া
দশ টাকার বাদলি কিনি
হাজার টাকার কোরান
কোরান খুলিয়া দেখেন আম্মাজির পরাণ।
বিয়ার রাত্রি দিছেগো আম্মা
মরিচ বাইড্ডার লাগি
কিনা মরিচ বাড়ুমরে সাধু তোমার লাগিয়া
সর্বাঙ্গ জইলা যায়গই আম্মাজির লাগিয়া (ঐ)

বাড়ির অনা দক্ষিণ পাশে এরি ধানের পারা
অত্ব আইয়ের আমার বাবা আসমানেরি তারা
প্রাণের বাবা ও বাবা গো ঝিরে বুঝি
ফিরগা নাইর দিনা প্রাণের বাবা...(ঐ)
সারাদিন রান্দি বাবা সাত ও ডেক্সি ভাত
খাইতাম গেলে পাইনা বাবা এক পেয়ালা ভাত
প্রাণের বাবা ও বাবাগো ঝিরে বুঝি
ফিরগা নাইর দিলা।
সারাদিন কাজ করি দাস দাসীর মত
তবু বাবা মারে আমায় পথের কুকুরের মত (ঐ)

৩. যেদিন হতে পড়ছি মাগো
পরের হাতের আঙ্কটি
সেদিন থেকে ছাড়ছি মাগো
মা বাপের বাড়ি।
ওমা কাউন্দ নারে...
আমারে লালিতে পালিতে মাগো
করছেন কত দুঃখ
মাপ করি দেন গো মা
যাইতাম শ্বশুর দেশ।
যেদিন হতে পড়ছি মাগো
পরের হাতের স্বর্ণ
সেদিন থেকে ছাড়ছি মাগো
মা বাপের অঙ্গ।
যেদিন থেকে পড়ছি মাগো।
পরের হাতের বেলাউজ
সেদিন থেকে ছাড়ছি মাগো।
মা বাপের লালুচ।

৪. জল কুমার নাতি করি স্বামী তোমার পায়ে ধরি,
ভাত রান্না আমারে শিখাওনারে মাংস রান্না আমারে শিখাও নারে
আগে দিব তেল খানি পাচে দিব মাংস খানি,
মাংস রান্না আমারে শিখাও নারে পোলাও রান্না আমারে শিখাও নারে
আগে দিব তেল ও পেঁয়াজ খানি পাচে দিব চাউলখানি গো
পোলাও রান্না আমারে শিখাও নারে।
বারির হাত দেখি চিরকনা
বারির লাই চুরি আইনছে বরকন্যা
কী দিয়া সাজামু মায়ের অবুঝ মনারে
বারির কোমর দেখি চিরকনা
বারির লাই বিছা আইনছে বরকন্যা (ঐ)
বারির শরীর দেখি চিরকনা
বারির লাই শাড়ি আইনছে বরকন্যা (ঐ)
বারির গলা দেখি চিরকনা
বারির লাই হার আইনছে বরকন্যা।

৫. সাতখান রিক্সা সাজাও গো বালি
যাইতাম বাড়িতে, ওঠনা রিকসার পরে
আমি কেমনে যাইতাম
আমার মায়ের লাই পরাণ পড়ে
আমার বাবার লাই পরাণ পড়ে

আমার ও মা আছে গো
তোমার মারে মা ডাকিলে
বাপ মা ধরি পাইল দিব রে
আমার মারে মা ডাকিলে
টাইনা লইব বুকে রে...
চাইল খাইল চাইলোনি হোকে
মডইল খাইল গুণে
তোমার ভাইরে ভাই ডাকিলে
মাইর বো মন্দার কাটা দিয়া গো।

গীদওয়ালী রফিয়া বেগম

৬. জাইললারে জাতে ছিলাম আমি
ভাবনের মাইয়ারে
তুই জাইললার প্রেমে পড়ি
আমি এখন কাটি জালের সুতারে
কী প্রেম শিখাইলি জাইল্লারে...
জাইল্লার মাথায় জালের বোঝা
আমার মাথায় খারি
চুক চুকাইয়া পড়ে জাইল্লার

পঁচা পুঁটির পানিরে
কী প্রেম শিখাইলিরে জাইল্লারে
দুই, চার কথার বেশকম হইলে
মারে ডালার বাড়ি রে
কী প্রেম শিখাইলি জাইল্লারে।
তথ্যসূত্র : হাছিনা আক্তার, মন্নারা নাঙ্গলকোট

৭. ভাইয়া যার গো আমার টাহনে, তুমি মোর শহরে (২)
সুন্দরী যে করে গোষসা রাইতের গো নিশির কালে।
মায়ের লাগি আনছি দর্জির জোল,
বোনের লাগিয়া আনছি কাকের জল,
সুন্দরীর লাই আনছি মোরে বাইচ্চার গো আবের পাঙ্খা
সুন্দরীয়ে করে গোষসা রাইতের গো নিশির কালে।

৮. কোন বোইনে বানাইছেরে বিছুইন
বিছুইনের মাঝে পুঁটি মাছের ছবি,
সাধু আমারে বিছুইন রে আইন দেয়।
সাধু আমার বিছুইনরে আইনা দেয়।
মাথার উচে থুইলেরে বিছুইন মাথা ফাইঠা যায়ওরে,
সাধু আমায় বিছুইন রে আনাই দেয়।
হৃদয়ের উপর থুইলেরে বিছুইন হৃদয় ফাইট্টা যায়,
সাধু আমায় বিছুইন রে আনাই দেয়।
কোন বোইনে বানাইছেরে বিছুইন।

৯. রঙ্গিলা দেশে, রঙ্গিলা রাতা রঙ্গে ঝিলমিল,
করে রেরাতা তোরে কে দিল ছাড়িয়া রে।
রাতা তোরে কেদিল ছাড়িয়া রে।
বিবির মারে পাইলে রে রাতা ধুইয়াই ডেঙ্গাতে ভরে রে,
রাতা তোরে কেদিল ছাড়িয়া রে।
দুলাল মারে পাইলে রাতা ধুইয়াই ডেঙ্গাতে ভরে রে রাতা
তোরে কে দিল ছাড়িয়া রে।

১০. দুপুরিয়া যায়রে দুলা,
দুপুরিয়া যায় ওরে মিয়া দুলা
লাল টুপিটা লইয়া যায়রে, সাপই আছে মিয়া দুলা,
ধ্বংস করবে সাপরে। দুপুরিয়া যাওরে মিয়া দুলা,
সাতও সালার গুতা না খাইবিরে মিয়া দুলা
দুপুরিয়া যাওরে মিয়া দুলা।
সাত ভাবির গুতা খাইবি রে মিয়া দুলা।
দুপুরিয়া যাওরে মিয়া দুলা।

যে পথও দিয়া যাইবারে মিয়া দুলা।
সেও পথে আছে রে সাপওরে
দুপুরিয়া যাওরে মিয়া দুলা।

১১. ঘুরিয়া ঘুরিয়া কন্যা বানু
বাবার গলায় ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কন্যা বানু
বাবার গলায় ধরি কান্দে। দিন কাটাইলাম সোনার বানু
তোমারও কারণে রে ও...।
রাত কাটাইলাম সোনার বানু
তোমারও কারণে।
বালুয়া যদি না যাইতে পারি
বালুয়া যদি না যাইতে পারি।
যাইবো বানুর আম্মারে...
দিন কাটাইলাম সোনার বানু
তোমারও কারণে,
রাত কাটাইলাম সোনার বানু
তোমারও কারণে।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া কান্দে বানু
ভাইয়ার গলা ধরি রে...
রাত কাটাইলাম সোনার বানু
তোমারও কারণে রে...
বানুও যদি না যাইতে পারে,
যাইবোন বানুর ভাবিরে
দিন কাটাইলাম সোনার বানু তোমারও কারণে,
রাত কাটাইলাম সোনার বানু তোমার কারণে।

১২. ফুলও তুলিতে ফুল ওগো ছিড়িতে
সোনার বিবি কান্দে সুল বিরিন্দা বনে,
বাবা তুমি নয় কইওয়রে গো বেমান দুলা আমার বাবা পশ্চিম গঞ্জের বেটা,
বাবা তুমি নয় ও গো বেমান দুলা,
আমার বাবা পাঠাবি ও গঞ্জের নেতা।
ফুলও তুলিতে ফুলও গো ছিড়িতে।

১৩. ভাইয়ারা মায়ের সামনে হইলোরে খারা (২)
বিদায় দেন বিদায় দেন গো আম্মার জানগো যাইতাম দূরুই শ্বশুর দেশে (২)
শ্বাশুরিয়া রাখবো গো আম্মা জানগো। বেলের সরবত দিয়া গো (২) ঐ

১৪. চিঠি দিবার কথা ছিলো সপ্তাহে এক দিন
৬ মাস পরে দিলা চিঠি তাও বেয়ারিং
এই সব করে হয় না রে তোর ভালবাসার ঋণ।

সেই দুঃখতে চোখের পানি ঝরে প্রতিদিন
লজ্জা দিয়ে কত।
চিঠি লেখি তোমার জন্যে নিজে হাতে কারি
আমি যাই ডাকঘরে তবু কেন দাওনা উত্তর।
লেখা যেন অতি শক্ত প্রেম জ্বালা কেমনে জুড়াই
তোমায় বিহীন সেই দুঃখেতে চোখের পানি ঝরে প্রতিদিন।

১৫. হাঁটু পানিতে যাইয়া গো কন্যা
হাঁটু না মাজন করে।
ঐপারে রহিম দুলা জিংগা সাজন করে।
সে জিংগাতে নিব না কি বানারে
হাটু পানিতে যাইয়াগো কন্যা হাটু না মাজন করে।
কন্যার লাগি না গো রহিম দুলা জিংগা সাজন করে রে।
জিংগাতে না কি রাখবো রে কন্যা রে রহিম দুলা।
হাইরে কন্যার লাগি জিংগা সাজন করে রে করে রহিম দুলা।

১৬. বিয়ার কুলা সাজন করে রে,
নয়া হোলা মাইয়া।
সে কুলাতে কুরির ও না সাজাইবে
বিয়ার কুলা সাজে রে
সে কুলাতে আছে রে সাজন বিবির লাগাই
বিবির মারে হাঙ্গা দিমু ঢাললাই হাটের মুসশারগার কাছে রে।
বিয়ার কুলা সাজন করে রে।
কুলার মাঝে রাখছে রে বিবির মারও হাজানী।
তথ্যসূত্র : হাজেরা আক্তার স্বপ্না, মদনপুর, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে এই গানটি গাওয়া হয়। এই গানটিতে তীব্র আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে গানটি উপস্থাপন করা হলো–

কাঁঠালেরো দুইখান পিড়ি ওঠানে বসাইয়া
যাত্রা করে মায়ের সীতা পূর্ব দিকে হইয়া গো
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিকে হইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে উমা যায় গো মায়ের কাছে
মায়েতো ভবনা করে কী ধন জানি চায় গো
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিকে হইয়া
টাকা নাহি চাইগো মা পয়সা নাহি চাই,
বছরটা ঘুরিয়া আসতে একবার নায়র চাই।
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিক হইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে উমা যায়গো

বাপেতো ভাবনা করে কী ধন জানি জায় গো
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিক হইয়া
টাকা নাহি চাইগো বাবা টাকা নাহি চাই
বছরটা ঘুরিয়া আসতে একবার নায়র চাই।
কান্দিতে কান্দিতে উমা যায়গো জ্যেঠার কাছে
জ্যেঠাতো ভাবনা করে কী ধন জানি চায় গো।
অবলা যাত্রা করে পূর্ব দিকে হইয়া।
টাকা নাহি চাইগো জ্যাঠা পয়সা নাহি চাই
বছরটা ঘুরিয়া আসতে একবার নায়র চাই।
কান্দিতে কান্দিতে উমা যায়গো কাকার কাছে
কাকাতো ভাবনা করে কী ধন জানি চায় গো।
টাকা নাহি চাইগো কাকা টাকা নাহি চাই
বছরটা ঘুরিয়া আসতে একবার নায়র চাই।
কাঁঠালেরো দুইখান পিড়ি উঠানে বসাইয়া
যাত্রা করে মায়ের সীতা পূর্ব দিকে হইয়া।

আরও যেসব গীত পাওয়া যায় তা হলো–

১. উড়ু উড়ু পঙ্খী রে বড় বড় পঙ্খী রে
কওছান পঙ্খী দামালেরও খবর নাই রে।
দামাল গেছে আজারে
দামাল গেছে বাজারে
দামাল গেছে বিবির হলদিরও দোকানে না রে
বিবির হলদি কিনিতে বিবির হলদি মুলাইতে
হইয়া গেছে রাত্র নিশি কালো নারে।
উড়ু উড়ু পঙ্খী রে বড়বড় পঙ্খী রে
কওছান পঙ্খী দামালেরও খবর নাই রে
দামাল গেছে আজারে
দামাল গেছে বাজারে
দামাল গেছে বিবির কুলারও দোকানে না রে
বিবির কুলা কিনিতে বিবির কুলা মুলাইতে
হইয়া গেছে রাত্র নিশি কালো নারে।
উড়ু উড়ু পঙ্খী রে, বড় বড় পঙ্খী রে
কাওছান পঙ্খী দামালেরও খবর নাই রে
দামাল গেছে আজারে
দামাল গেছে বাজারে
দামাল গেছে বিবির শাড়িরও দোকানে
বিবির শাড়ি কিনিতে বিবির শাড়ি মুলাইতে
হইয়া গেছে রাত্র নিশি কালেরে।
উড়ু উড়ু পঙ্খী রে, বড় বড় পঙ্খী রে
কওছান পঙ্খী দামালের খবর নাই রে।

২. সুন্দর সুন্দর কালিয়া রে কালো মাথার কেশ
বাহার দিয়া কান্দো কালিয়া লাবা মাথার কেশ
আগে যদি জানতাম কালিয়া তোরে নিব পারে
তোরে নিয়া লুকাইয়া রাখতাম তোরও চাচার ঘরে
চাচি দো গো তারের ঝি গো তাইন দো দিবো কইরা
চাচায় দো গো সামানেরও লালছে জাইছো দিব বিয়া।

৩. শাইল শুয়া দুইটি পক্ষী মাছ দরিয়া আয় বাসে
কইন্যার মারে সুন্দর দেইখ্যা জামাই গুশ্‌শা করে আইছো
আইছো ঝিয়ের জামাই বইসা নাস্‌তা খাও
তোমার মনে যারে ধরে তারে লইয়া যাও
শাইল শুয়া দুইটি পক্ষী মাছ দড়িয়া আয় বাসে
কইন্যার ভাবিরে সুন্দর দেইখ্যা জামাই গুশ্‌শা করে
আইছো আইছো নন্দাইয়ের জামাই বইসা নাস্‌তা খাও
তোমার মনে যারে ধরে তারে লইয়া যাও।
শাইল শুয়া দুইটি পক্ষী মাছও দরিয়া আয় বাসে
কইন্যার কেইনারে সুন্দর দেইখ্যা জামাই গুশ্‌শা করে
আইছো আইছো বোইনের জামাই বইসা নাস্‌তা খাও
তোমার মনে যারে ধরে তারে লইয়া যাও।

৪. মায়ের কান্দন রিমি না ঝিমি রে
বাপের কান্দন জ্বলে কী তুষের আগুনে রে
আস্তে ধীরে যাইওরে মাঝি ভাইরে
শুইন্যা কী লইতাম জ্বলোনী মায়ের কান্দন রে
শুইন্যা কী লইতাম কাঙ্গাইল্যা বাপের কান্দন রে
মায়ের কান্দন রিমি না ঝিমি রে
বাপের কান্দন জ্বলে কী তুষের আগুনে রে।

৫. জিরারে না দিয়া বিয়া, জিরার বাপ গেল সন্নাসী হইয়া রে।
মার জিরা ধনরে...
মার মনে আছিল্ কী কাছে দিত বিয়া ঝি গো...
আইতো জাইতো চাইত ঝিয়ের চন্দ্রমুখ
মার জিরা ধনরে
বাপের মনে আছিল্ কী, দূরুই দিত বিয়া ঝি গো
তো জাইতে খাইত বাটার পানও কী
মার জিরা ধন গো

বাহক : রমিজা বেগম, স্বামী : মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, দক্ষিণ চর্থা, সদর, কুমিল্লা।
অনুলিখন : আর্শেনূর খন্দকার আলো, পিতা : আবুল আলম খন্দকার, দক্ষিণ চর্থা, কুমিল্লা, হাজেরা বেগম, চান্দপুর, কুমিল্লা

সাজনের গীত ১.

ওগো ঠাকুরঝি, মেঘের সনে ফুল বাগানে,
আমরা এসেছি।
সিঁদুর দিয়ে রাই সাজাবো,
চন্দন তাহার সঙ্গে দিব।
ওগো ঠাকুরঝি, মেঘের সনে ফুল বাগানে,
আমরা এসেছি।
শাড়ি দিয়ে রাই সাজাবো,
ব্লাউজ তাহার সঙ্গে দিব।
ওগো ঠাকুরঝি, মেঘের সনে ফুল বাগান
আমরা এসেছি।

সাজনের গীত ২.

তোমরা রাই সাজাইতে জানো না,
রাইয়ের সাজন ভালো হইল না।
ঐ রূপেতে সিঁদূর দিয়ে,
সাজাইয়া কেন দেখনা।
রাইয়ের সাজন ভালো হইল না।
ঐ রূপেতে শঙ্খ দিয়ে
সাজাইয়া কেন দেখো না।
তোমরা রাই সাজাইতে জানো না।
ঐ রূপেতে কাজল দিয়ে
সাজাইয়া কেন দেখনা।
ঐ রূপেতে পাউডার দিয়ে
সাজাইয়া কেন দেখনা।
রাইয়ের সাজন ভালো হইলো না।
ঐ রূপেতে শাড়ি দিয়ে
সাজাইয়া কেন দেখনা
রাইয়ের সাজন ভালো হইল না।

বিয়ের পরে

১. উড়ালিয়া কইতররেও চৈরগা আধার খায়রে
সেইখান থেকে শুনিলাম ওরে দারুণ মায়ের কান্দন ওরে
চাড়গা দেয়না জাইতাম মায়ের কুলেরে
পারানা ফরসিরে আমার মায়ের বুঝায় ওরে।
ঘড়ে আছে ছোট ভাই বোন দিয়ও মায়ের কুলেতুলে
উড়ালিয়া কইতরে চৈরগা আধার খায়রে
সেইখান থেকে শুনিলাম দারুণ বাবার কান্দনওরে

চাইড়গা দেওনা জাইতাম বাবার কুলেওরে
পারানা ফঁরসিওরে আমার বাবারে ও বুঝায়ওরে
ফুলমাছাঙ্গের কুরআন কিতাব নামাইয়া দিয়ও বাবার সামনেরে
উড়ালিয়া কইতররেও চৈরগা আধার খায়রেও
যায়রে কইতর সোনার ঝিলমিল বাঙ্গারে
সেখান থেকে শুনিলাম দারুণ ভাইয়ের কান্দনওরে
যায়রে কইতর সোনার ফিনঝিল বাঙ্গারে।
কোন কোন দেশে শুনছ গো ময়না
চাচি যাইতে লগে।

২. গোপালিয়া গোপালিয়া আমার কথা শোন, কন্যার মা ঘরের পিছে মইচের বাদাম তোলে
ও রসের গোপালিয়া রে
গোপালিয়া ভাত খায় দই দুধ দিয়া
মাইয়ার মার মনে কইছে থালা লেইত গিয়া
গোপালিয়া ভাত খায় ইলিশ মাছ দিয়া
কন্যার মার মনে কইছে কাটা বাছত যাইয়া
রসের গোপালিয়া রে।

গোপালিয়া গোপালিয়া
আমার কথা শোন
কন্যার জেঠি ঘরের পিছু মইচের বাদাম তোল
ও রসের গোপালিয়া রে।
সুন্দর ময়না কান্দন করে
ধইরা বাবার গলায়
কী সুন্দর ময়না গো
কীসের দুঃখে কান্দ গো ময়না
কওনা বাবার কাছে।
হালও দিবাম, রাক্ষলও দিবাম
যাওনা জামাইয়ের ঘরে
হালও চাইনা রাক্ষলও চাই না
মাও যাইব লগে
চাচি যাইব লগে।

বিয়ের গান : (বৌদ্ধ সম্প্রদায়)

১. সাতাইল পর্বতরে হরিণীয়ে কান্দেরে
বিপাকে হইল হরিণীর মরণরে
না খাইলাম গিরস্থের ধান
না খাইলাম বারুইয়ের পান

বিনা দোষে হইল হরিণীর মরণরে
সংঘের সংগীরা ভাই, কইওরে হরিণার ঠাঁই
বিপাকে হইল হরিণীর মরণ রে
কোন না কামারে রে সে শেল গড়াইলরে
তার বংশ হইল নিপাতরে।

২. বিদেশি গোপাল তোরে মহিষে মরিবার
মইষের বাতান থাক মইসান ভাইরে
মইষের দুগ্ধরে খাও, রাতনি না প্রভাত কালে
কার মুখ চাওরে। ঐ
আমার বাড়ি যাইও মাইসান ভাইরে
খালে হাটুরে পানি জল
গামছা ভিজাইয়া যাইও
ধুতি দিব আমিরে
আমার বাড়ি যাই মইসান ভাইরে
এই বরাবর পথ
তারার ছানি নাড়ার বেড়া
পুব দু'আইরা ঘর।
আমার বাড়ি যাইও মইসান ভাইরে
বসতে দিব পিড়ি।
জলপান করিতে দিবো
শালি ধানের চিড়ি, নও, অরে বিন্নি ধানের খই, বাড়ির গাছের সরপি কলা
গামছা বাঁধা দই অরে।

৩. কলিকালের পোলা পাইনে
কুত কুতাইয়া চায়
সাধের নাতিন লো
হাটিস না তুই আলতা পায়ে দিয়া
সাধের নাতিন লো (ঐ)
মাজার মইধ্যে দিয়া গিট্টা, টেডি জোতা পায় পরিয়া হাটিস না তুই রাস্তার কিনারায় (ঐ)
নাতিনলো
নক পালিশ ঠোঁট পালিশ দিয়া
টেগরা চোখে কাজল দিয়া।
হাটিস না তুই রাস্তার কিনারায়
নাতিন লো
সেমবু (শেম্পু) দিয়া মাথার ধুঁইয়া

বাতাসে চুল উড়াইয়া
তোর বুকের ওড়না বাতাসে উড়ায় (ঐ)
নাতিন লো
পাকা কাঁঠালের গেরান (ঘ্রাণ) পাইয়া
মৌমাছি সব যায় উড়িয়া
উমেশ বলে কী করি উপায়,
সাধের নাতিন লো,
(এটি আধুনিক ব্যান্ড সংগীতের মতো হলেও এরা একে বিবাহের গীত হিসেবে ব্যবহার করে।)

তথ্যসূত্র : উমেশ চন্দ্র সিংহ, মৃত : কামিনী কুমার সিংহ কিং কাসনাই

চিড়ার ব্রতের গান

হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী বিবাহের প্রস্তুতিমূলক এক প্রকার ব্রতের আয়োজন করা হয়ে থাকে যা চিড়ার ব্রত বা আঞ্চলিক ভাবে চিড়ার বর্ত নামে পরিচিত। হিন্দু বর-কনে উভয়েই এদিন উপবাস করে থাকে এবং হিন্দু বয়স্ক রমণীরা একত্র হয়ে উঠানে বসে ব্রতের গান পরিবেশন করে বা গেয়ে থাকে। গানটি নিম্নে তুলে ধরা হলো,

কামিনী ঠাকরাইনের ঘরখানি
ছাটা না ছুটায় গো।
জাগো জাগো কামিনী ঠাকরাইন
কত নিদ্রা যাও।
কইন্যার মা জাগায় মায়েরে
চরণে ধরিয়া গো।
জাগো জাগো কামিনী ঠাকরাইন
কত নিদ্রা যাও।
খইয়ে না দইয়ে, চিনি না সন্দেশ গো
দাও নিয়া কামিনীর কাছে।
কামিনী ঠাকরাইনের ঘর খানি
ছাটা না ছুটায় গো
জাগো জাগো কামিনী ঠাকরাইন
কত নিদ্রা যাও।

দেবী যাইব সইয়ের বাড়িত
সঙ্গে যাইব কে?
গুরু যাইব, পুরুইত যাইব
যাইব দেবীর সনে।
বাইদ্য যাইব, বাজনা যাইব

যাইব দেবীর সনে।
পুষ্প যাইব দূর্বা যাইব
যাইব দেবীর সনে।
শঙ্খ যাইবো, ঘন্টা যাইবো
যাইবো দেবীর সনে।
মিষ্টি যাইবো, সন্দেশ যাইবো
যাইবো দেবীর সনে।
ঘট যাইব, গামছা যাইবো
যাইবো দেবীর সনে।
ঘৃত যাইবো, মধু যাইবো
যাইবো দেবীর সনে।

পান খিলির গান

হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী বিবাহের দু'তিন দিন পূর্বে পান খিলির গান গাওয়া হয়ে থাকে। বর-কনের সামগ্রিক মঙ্গল কামনাই এই মেয়েলি গীতের উদ্দেশ্য। নিম্নে গানটি উপস্থাপন করা হলো,

সোনার কাটাইর হস্তে লইয়া
সুপারি কাটে রইয়া রইয়া।
তোমরা সবে দেওগো জয়ের ধ্বনি
হরষিত হইয়া।
রুপার খইড়কা হস্তে লইয়া
পান খিলাও রইয়া রইয়া।
তোমরা সবে দেওগো জয়ের ধ্বনি
হরষিত হইয়া।

শুভ কাজে যাত্রা করি
জয় দে গো নাগরী।
শীতল কামরাঙার পাটি
উঠানে সাজাও গো রাণী।
আসিল ব্রাহ্মণের নারী,
মসল সবে সারি সারি।
সোনার কাটাইর হস্তে লইয়া,
সুপারী কাটে সুন্দরীয়ে।
সোনার খইড়কা হস্তে লয়ে,
পানখিলি দেয় সুন্দরীয়ে।
আসিল জ্ঞাতির নারী,
বসল সবে সারি সারি।

আসিল কায়েস্তের নারী,
বসল সবে সারি সারি।
সোনার কাটাইর হস্তে লয়ে,
সুপারী কাটে সুন্দরীয়ে।
সোনার খইড়কা হস্তে লয়ে,
পানখিলি দেয় সুন্দরীয়ে।

তেল পানের গান

হিন্দু নারীরা সাধারণত মানত হিসেবে ও বাচ্চার জন্মের পর তার মঙ্গল কামনা করে তেল পানের গান গেয়ে থাকে। গানটি নিম্নরূপ–

জায়গা খানি কিনালাম মাগো
রবি বিশুদ বারে,
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।
আসন খানি পাতলাম মাগো
রবি বিশুদ বারে
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।
ঘট-মুচি আনলাম মাগো
তোমায় পূজিবারে।
দয়া করে আইসেন মাগো
আমারি আসনে।
ফল-ফসারি আনলাম মাগো
তোমায় পূজিবারে
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।
পুষ্প দূর্বা আনলাম মাগো
তোমায় পুজিবারে
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।
ধুপ প্রদীপ আনলাম মাগো
তোমায় পুজিবারে
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।
জায়গা খানি কিনলাম মাগো
রবি বিশুদ বারে।
আইসেন গো মা আকুলানি
আমারি আসনে।

গঙ্গা নিমন্ত্রণের গান

হিন্দু বিবাহরীতিতে গঙ্গা দেবীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয় গান গেয়ে। এই গানের মাধ্যমে দেবীকে নানান প্রকার দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে তুষ্ট কারার কথা জানানো হয়। দেবী যেন একবার কৃপা করে এসে বর কনেকে আর্শীবাদ করে যান। গানটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো,

গঙ্গা দেবী রইল গো কোথায়?
যমুনার জলে গঙ্গা রইল গো পলাই।
পান দিলাম বিরি বিরি, গুয়া উত্তম ফল
গঙ্গা দেওগো দরশন।
তৈল দিলাম ছিটা ছিটা, সিঁদূর দিলাম বিন্দু বিন্দু
গঙ্গা দেওগো দরশান।
গঙ্গা দেবী রইলো গো কোথায়?
যমুনার জলে গঙ্গা রইলো গো পলাই।
ধন্য দিলাম দূবা দিলাম গঙ্গা নিমন্ত্রণ
গঙ্গা দেওগো দরশন।
রাজ হংসের ডিম দিলাম গঙ্গা নিমন্ত্রণ
গঙ্গা দেওগো দরশন।
গঙ্গা দেবী রইলো গো কোথায়?
যমুনার জলে গঙ্গা রইলো গো পলাই।

জলভারার গান

হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী কনেকে ও বরকে বিবাহের দিন গান গাইতে গাইতে নদী বা পুকুর থেকে ৫ কলসি জল এনে স্নান করানো হয়। এ সময় হিন্দু নারীরা সমবেত ভাবে যে গান গেয়ে থাকে তাকেই বলে জল ভরার গান। গানটি নিম্নে তুলে ধরা হলো,

জলের ঘাটে বাঁশি বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই।
কেহ হাটে লারে ধীরে
কেহ হাটে রইয়া,
কইন্যার মা সুন্দরী হাটে
তিভঙ্গ দেখাইয়া গো কমলা
আমরা জলে যাই।
জলের ঘাটে বাঁশি বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই।
কারো হাতে লোটা গাড়ু
কেহর কাঁখে কলসি
কইন্যার মা সুন্দরী মাতে
বীল কুলা খানি গো কমলা

আমরা জলে যাই
জলের ঘাটে বাঁশি বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই।

১৫. পূজার্চনা সংশ্লিষ্ট গীত

এ অঞ্চলে বিভিন্ন পূজার্চনায় বিভিন্ন গীত প্রচলিত আছে। এমন একটি প্রচলিত জনপ্রিয় গীত তুলে ধরা হলো,

পূজা করে রাম, সিদ্ধি হবে কাম
মনের বিলাস হে!
পূজা করে কৈলাস বাসিনী হে
পুষ্প দূর্বা হারে, পূজির মায়েরে
মনের বিলাস হে!
পূজা করে রাম সিদ্ধি হবে কাম
মনের বিলাস হে!
চিনি সন্দেশ হারে পূজিব মায়েরে
মনের বিলাস হে!
ফল-ফসারি হারে পূজির মায়েরে
মনের বিলাস হে!
ধূপ-প্রদীপ হারে পূজিব মায়েরে
মনের বিলাস হে!
পূজা করে রাম, সিদ্ধি হবে কাম
মনের বিলাস হে!

হরিলুটের গান

হরির নাম লইয়া যাই গোলকে
আয়না রে ভাই সকল বালকে।
নাম যে এত মিঠা লাগে
কে আনিল জগতে।
আয়না রে ভাই সকল বালকে।
ভক্ত ছিল রে প্রহলাদ
তাঁর নামের আহ্লাদ।
সেতো অগ্নিকুণ্ডে মুক্তি পেল
না ঘুচল জঞ্জাল।
হরির নাম লইয়া যাই সকলে
আয়না রে ভাই সকল বালকে।
গেল গেলরে বেলা,
কর কিউনের খেলা।
প্রেম ফুলে ভক্তির ডুরে

গাথরে মালা।
মালা পাড়ইব হরির গলে
হেরির দুই নয়ন ভরে।
আয়না রে ভাই সকল বালকে।

১৬. ব্রতের গীত

এ অঞ্চলে বেশ কিছু ব্রতের গান প্রচলিত আছে যা বিভিন্ন ব্রতে গীত হয়ে থাকে। কার্ত্তিক ব্রতের একটি জনপ্রিয় গীত তুলে ধরা হলো,

সেবক সাঁজি হস্তে লইয়া
বাগানেতে চলিল।
বাইচ্ছা বাইচ্ছা বিল্ব পত্র
পূজার জন্য আনিল।
ও বাইচ্ছা বাইচ্ছা পুষ্প দূর্বা
পূজার জন্য আনিল।
সেবক সাঁজি হস্তে লইয়া
বাগানেতে চলিল।
ও বাইচ্ছা বাইচ্ছা তুলসী পাতা
পূজার জন্য আনিল।
ও বাইচ্ছা বাইচ্ছা আম্র পল্লব
পূজার জন্য আনিল।
সেবক সাঁজি হস্তে লইয়া
বাজারেতে চলিল।
বাইচ্ছা বাইচ্ছা মিষ্টি সন্দেশ
পূজার জন্য আনিল।
ও বাইচ্ছা বাইচ্ছা ফল-ফসারি
পূজার জন্য আনিল।
সেবক সাঁজি হস্তে লইয়া
বাজারেতে আসিল।
বাইচ্ছা বাইচ্ছা ঘট-মূচী
পূজার জন্য আনিল।
ও বাইচ্ছা বাইচ্ছা ধূপ-প্রদীপ
পূজার জন্য আনিল।
সেবক সাঁজি হস্তে লইয়া
বাজারেতে আসিল।

১৭. দেহতত্ত্ব

জীবনের নাইরে আশা
কর শ্রী গুরুর ভরসা

দেহের গুমান (গর্ব) কর মিছে
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে
কাল শমনে জাল পেতেছে
ভাঙবেরে তোর সুখের বাসা।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
সকল পথের পরিচিত
যখন প্রাণ তোর হবে হত
কউ না করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে
কেউ সঙ্গে যাবে নারে
গুরু ভজন হইল
কেবল ভবে যাওয়া আসা।

১৮. জলদাসের গান

জলদাস, ধীবর, কৈতর্ব্য যাই বলি না কেন তারা জাল ফেলে টানতে টানতে হাইর (সারি) গান গায়। ডাকাতিয়া তীরবর্তী লাকসামেও আগে এসব জেলেদের গান প্রচলিত ছিল। তাদের গানে অশ্লীলতার প্রসঙ্গটি বেশি রয়েছে নিচের উদাহরণটি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে।

১. হেইয়ো জোরে মারো টান
চুত মারাণির পুত
গাঙ্গের পাড়ের টুনি
হরি (শাশুড়ি) বউয়ে ঝগড়া করে
কার কেমন বুনি (স্তন)।

২. কোমর ভাঙ্গা হাঙ্গা আলীর (হাঙ্গা-২য় বিয়ে) পুত
বেংলা নদীর পানি
কলসি ভরে আনি
পুতের বউয়ে ছুতি বুলায় (এঁটো ধোয়)
জুল জুলাইয়ে বুনি।

সন্তান জন্মের পর তাকে বরণ অনুষ্ঠানের গান

১. মাইজ্জালে (ঘরের প্রধান অংশে) তুষের ধোঁয়া (২)
পোলা (পুত্র) কান্দে ওয়াঁওয়াঁ (২)
ছাওয়া বল, কী হইছে বালি ঘর মোর
বানরা বালক তুলিয়া লও কোলে
ছাওয়াল (বাচ্চা) তুলিয়া লও কোলে
লাইটের বাতি জ্বালাইয়া, মোমের বাতি আঙ্গাইয়া (জ্বালাইয়া)
ছাওয়া বল, কী হইছে বালি ঘর মোর

বানরা বালক তুলিয়া লও কোলে
ছাওয়াল (বাচ্চা) তুলিয়া লও কোলে
পোলার নানায় শুইনারে, ঢোল দমা বাজায় রে
ছাওয়া বল, কী হইছে বালি ঘর মোর
বানরা বালক তুলিয়া লও কোলে
ছাওয়াল তুলিয়া লও কোলে। পোলার নিনা শুইনারে, গীদঅলী (গায়িকা) পাঠায়রে
পোলার মামায় শুইনারে, বাজি-বন্দুক পাঠায় রে
ছাওয়া বল, কী হইছে বালি ঘর মোর
বানরা বালক তুলিয়া লও কোলে
লাইটের বাতি জ্বালাইয়া, মোমের বাতি আঙ্গাইয়া [ঐ]
তথ্যসূত্র : মাছুমা বেগম, বয়স ৩৫, মৈশাতুয়া, মনোহরগঞ্জ

২. সোনারই ঘর খান, রূপালি কেওয়ার খান (দরজা)
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইওনা, জয়ধন কান্দাইওনা।
জয়ধনের দাদারে জিগাইয়া চাও
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইওনা (ঐ)
জয়ধনের দাদিরে জিগাইয়া চাও
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইওনা (ঐ)
ঘরে আছে কলার সের
সের খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইওনা (ঐ)
জয়ধনের বাবারে জিগাইয়া চাও
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
ঘরে আছে মিছরির সের
সের খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইয়া। (ঐ)
জয়ধনের মারে জিগাইয়া চাও
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
ঘরে আছে দুধের সের সের
খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইয়া।
জয়ধনের জেঠারে জিগাইয়া চাও
কী খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
ঘরে আছে চিনির সের

সের খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইওনা। (ঐ)

তথ্যসূত্র : মাছুমা বেগম, বয়স ৩৫, মৈশাতুয়া, মনোহরগঞ্জ

ব্যাখ্যা : নবজাতকের খাদ্য-খাবারের চিন্তাই গানটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে, তবে এতে খাবারের অভাব নেই, এই ভরসাও দেখা যায়।

৩. সোনারগাঁইয়া নাপতারে (নাপিত), রূপার গাইয়া শুর
বালা (ভাল) কইরা কামাইও (কেটো) নাপতা
না লাগাইও শুররে, না লাগাইও ক্ষুর
নাপতা বলে চিয়াচিয়া, কী করিতাম তাইরে
আমার ঘরে আছে আরো আল সুন্দরী
না পিতা নাপতারে
নাপতা আইছে কামাইতো, নাপতি রইছে বইয়া
কতখনে (কতক্ষণে) আইব নাপতি
তেল কালি লইয়ারে
না পিতা নাপতারে। (ঐ)

তথ্যসূত্র : মাছুমা বেগম, বয়স ৩৫, মৈশাতুয়া, মনোহরগঞ্জ

লোকবাদ্যযন্ত্র

লোকবাদ্যযন্ত্র বাংলার লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। লোকসংগীত সহ যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। মুরাদনগর অঞ্চলে বেশ কিছু লোকবাদ্যযন্ত্র চোখে পড়ে। যেগুলোর বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে স্থানীয় লোকসংগীতের আসরে। এ অঞ্চলে প্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্রের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো–

১. করতাল

করতাল বাদ্যযন্ত্রটি পিতলের তৈরি। দেখতে অনেকটা থালার মতো। এদের মধ্য বিন্দু দিয়ে ছিদ্র করে তৈরি করা হয় একটি সরু নালী। এই নালী দিয়ে প্রবেশ করানো হয় মোটা সুতার নেতি। এই নেতির ভেতর দুই হাতের আঙ্গুল পেচিয়ে একটির সাথে অপরটিকে আঘাত করা হয়, এতে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় বা বাদ্যকর তার হস্তের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে এর ধ্বনি, তাল, লয় ঠিক রাখে। লোকসংগীত পরিবেশন করার সময় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যখন করতাল বাজানো হয় তখন খুব সহজেই করতালের সুরকে চিহ্নিত করা যায়। প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবার তাদের প্রত্যাহিক পূর্জাচনা করার সময় এ যন্ত্রটি বাজিয়ে থাকে। করতালকে কখনও ষটতাল, ঘটতাল, করতালি ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

২. মৃদঙ্গ

এটা একটা প্রাচীন লোকবাদ্যযন্ত্র। মৃদঙ্গ নামটির উৎপত্তি হয়েছে মৃত্তিকা নির্মিত অঙ্গ থেকে বা মৃৎ+অঙ্গ=মৃদঙ্গ। পূর্বে এর মূল কাঠামোটি তৈরি করা হতো মাটি দিয়ে কিন্তু এখন আমকাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। বাদিকের আয়তন ডানের আয়তনের দ্বিগুন। ডান দিকে ক্রমশ সরু হতে থাকে, ভেতরের অংশ ফাপা। নলাকৃতির দৈহিক কাঠামোর দু'পাশে চামড়া লাগানো থাকে। চামড়ার দুই প্রান্তের সাথে লাগানো থাকে ফিতা জাতীয় কতগুলো সরু চামড়া যেগুলোকে টেনে সুর নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

৩. কাসা

এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি একটি ধাতব বাদ্যযন্ত্র। এ যন্ত্রটির একটি অংশ থাকে ধাতব থালার মতো অন্য অংশটি ভেতরের দিকে বাকানো থাকে। একটি মোটা সুতার নেতি দিয়ে একে বেধে রাখা হয়। এর সাথে থাকে একটি স্ফীত মাথাওলা ছোটা কাঠের দণ্ড এটি দিয়ে আঘাত করা হয় যন্ত্রটির পৃষ্ঠদেশে। আঘাত ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে থাকে। গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে কাসার বাদ্যযন্ত্র বা কাসার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

৪. কড়া

শক্তদুটি কাঠের ফালি দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। দুটি কাঠের শক্ত ফালি দুই হাতে নিয়ে একটির সাথে অপরটি আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয়। যদিও এ বাদ্যযন্ত্রটির শব্দ তেমন শ্রুতিমধুর নয় তবুও গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে এর গুরুত্ব চোখে পড়ে যথেষ্ট।

কড়ার নির্মাণ প্রক্রিয়া : প্রথমে শক্ত কাঠ নির্বাচন করা হয়। কাঠের দুটো সরু কালি তৈরি করে সিরিস কাগজ দিয়ে ঘসে এর গায়ে বার্নিশ করা হলে তৈরি হয়ে যায় কড়া। নির্মাণ প্রক্রিয়া সহজতর এবং নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতার জন্য এটি গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিচিত।

৫. ঝুর্ণঝুনি

কাঠের তৈরি একটি বাদ্যযন্ত্র যা ২ ইঞ্চি প্রস্থ ও ৬-৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট। এই বাদ্যযন্ত্রটির ভেতর প্রায় এক ইঞ্চি করে দুই-তিনটি খাঁজ কাটা থাকে। খাঁজের ভেতর দিয়ে কতগুলো পাতলা টিনের পয়সা ঢুকিয়ে মাঝ বরাবর একটি লোহার শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যন্ত্রটির প্রস্থ্য বরাবর ডান হাতের চারটি আঙুলের মাপে চারটি ছিদ্র করা থাকে এবং অন্য একটির গায়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের মাপে একটি ছিদ্র করা থাকে। এভাবে ডান হাতের চার আঙুলের একটি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে একটি নিয়ে একটির সাথে অপরটিকে আঘাত করে যন্ত্রটি বাজানো হয়।

৬. আঁড়বাঁশি

এটি বহুল পরিচিত এবং প্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি তৈরি হয় বাঁশ থেকে। কয়লার আগুনে লোহার শিক পুড়িয়ে তৈরি করা হয় বাশের গায়ে ছিদ্র। তারপর গায়ে নানা প্রকার কাপড়ের নেকড়া পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় আঁড়বাঁশি। নকশা আকার পর এর গায়ে বার্নিশ করা হয়। বার্নিশ করার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাঁশি তৈরি হয়। আঁড়বাঁশিকে অনেক স্থানে মূলী বাঁশিও বলে থাকে।

স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি লোকবাদ্যযন্ত্রের একাংশ

৭. ঢোল

বহুল ব্যবহৃত ও সুপ্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্র। কাঠের গোলক আকৃতির ফাঁপা বাদ্যযন্ত্র। এর দু'পাশে চামড়া লাগানো থাকে। ঢোলের বেশ কয়েক প্রকার জাত লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ঢোলেরই নব্য সংস্করণ বাংলা ঢোল। এটি কাঠের ফাঁপা আবেস্টনির দু'পাশে চামড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলা ঢোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি সমদ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। অর্থাৎ এর মূল দৈহিক কাঠামোর ব্যস প্রায় ১৮ ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং প্রস্থ্যে (বেড়) ৫৫ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে ২৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

৮. নাল

প্রাচীনতম লোকবাদ্যযন্ত্র ঢোলের নব্য সংস্করণ নাল। ফাঁপা কাঠের গোলকের দু'পাশে চামড়া বাঁধাই থাকে। যেখানে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয়। বাংলা ঢোল থেকে এই ঢোলের একটা আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নালের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, এর বেড় ৩৫ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও নালে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ্য ও বেড়ের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

৯. ঢাক

গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্র এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র হল ঢাক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পূজা পার্বন বিশেষ করে দূর্গা পূজা, মনসা পূজা, কালী পূজা প্রভৃতি পূজায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢাকের ব্যবহার চোখে পড়ে, মুলত ঢাক ব্যতীত এসব লোকউৎসবগুলো নিতান্ত সাদামাটা উৎসবে পরিণত হয়। মুরাদনগর এলাকায় খুব বিখ্যাত ঢাকী ও ঢুলী (বাদ্যকর) আছে। খোশঘর ও পাণ্ডুঘরের বাদ্যকরদের দেশব্যাপী সুনাম লক্ষ করা যায়।

১০. খমক

বাউল সংগীতের একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খমক বেশ সুপরিচিত। বাউল/বয়াতি নিজেই এই যন্ত্রটি বহন করে থাকেন। এবং সংগীত পরিবেশনের সময় নিজেই এই যন্ত্রটি বাজিয়ে থাকেন। কাঠের তৈরি ফাপা একটি কৌটার মতো আকার তৈরি করা হয় তারপর এক পাশে চামড়া লাগিয়ে এর মাঝখান থেকে সুতা বেধে সুতায় আঙুল দিয়ে নেড়ে শব্দ তৈরি করে।

লোকউৎসব

বৃহত্তর কুমিল্লায় বেশ কিছু অসাম্প্রদায়িক লোকউৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি পেশা নির্বিশেষে এসব উৎসব পালন করে থাকে স্থানীয় লোকজন। এ জাতীয় উৎসবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকউৎসব হলো, নবান্ন, বৈশাখী উৎসব, হালখাতা ইত্যাদি। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো–

১. নবান্ন

এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন লোকউৎসব। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ লোকউৎসবটি উদযাপিত হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর ঘরে ঘরে নানা ধরনের পিঠা পায়েস তৈরির ঐতিহ্য চোখে পড়ে। নতুন ধানের গন্ধে বাড়ি মৌ মৌ করে, লোকজন পিঠা পায়েস রাধে এবং পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যেও তা বিতরণ করে থাকে।

কুমিল্লায় হিন্দু জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২ ভাগ। এখানে সারা বছর একটার পর একটা ধর্মীয় উৎসব লেগেই থাকে। প্রধান যে পূজাগুলো এখানে মহাধুমধামে পালিত হয় সেগুলো হলো দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, স্বরস্বতী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, গণেশ পূজা, বাসন্তী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা ইত্যাদি।

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে শহরের হিন্দু জনসমাজ হোলি উৎসবে মেতে ওঠে। লক্ষ্মী পূজা ও কালীপূজায় আতশবাজির আওয়াজ আর দিপাবলীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সমস্ত শহর। মহাধুমধামে পালিত হয় মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা, নারায়ণ পূজা, শ্রী শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধা অষ্টমী, রথযাত্রা, মনসা পূজা ইত্যাদি।

অন্যান্য ব্রতের মধ্যে লক্ষ্মীর ব্রত, বিপদনাশিনী ব্রত (এ ব্রত মেয়েরা করতে পারেনা) ত্রিনাথের মেলা, হরিসেবা, মনসা পাঠের আসর, বৈষ্ণব সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, নিত্য পূজা, নাম সংকীর্তন, একাদশী, শিব চতুর্দশী।

কুমিল্লা প্রাচীন জনপদ তাই এখানকার অনেক মন্দিরের বয়স তিনশ বছর বা এর অধিক। উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলোর মধ্যে আছে শ্রী শ্রী রাজ রাজেশ্বরী কালীবাড়ি, কাত্যায়নী কালী বাড়ি, চানমনি কালীবাড়ি, রক্ষাকালী বাড়ি, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বাড়ি, গুপ্ত জগন্নাথ বাড়ি, গুণ্ডিচা জগন্নাথ মন্দির, শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ আখড়া, করুণাময়ী কালীবাড়ি, ঠাকুরপাড়াস্থ কালীতলা কালীবাড়ি, মদিনা মসজিদ সংলগ্ন কালীবাড়ি, নতুন চৌধুরী পাড়া কালীবাড়ি। অশোকতলা লক্ষ্মী গোবিন্দ মন্দির, স্টেডিয়াম সংলগ্ন কালী বাড়ি। সংরাইশ দুর্গা বাড়ি, সাহা পাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, শ্রী শ্রী রাসস্থলি, মহেষাঙ্গঁণ নাট মন্দির, শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন, বাগিচা গাঁও শিব মন্দির, ল'কলেজ সংলগ্ন শিব মন্দির প্রভৃতি। আরো অনেক ধর্মীয় স্থান আছে কুমিল্লায়। আখড়া আছে ২টি।

কুমিল্লার প্রতিটি মন্দিরই সারা বৎসর পূজার আয়োজনে মগ্ন থাকে। এর মধ্যে যেসব স্থান যেকোন ধর্মীয় পার্বণে উৎসব মুখর হয় সেগুলো হলো ঈশ্বর পাঠশালা, রামকৃষ্ণ মিশন, রাসস্থলি, কাত্যায়ণী কালীবাড়ি, রাজেশ্বরী কালীবাড়ি।

২. বৈশাখী উৎসব

বৈশাখ মাসে এ উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ লোক-উৎসবটি সমারোহে পরিণত হয়ে থাকে। বাড়ি বাড়ি মজার খাবার তৈরি হয়। নতুন পোশাক পরে লোকজন বৈশাখী উৎসব পালন করে থাকে।

ব্যবসায়ীরা এই উৎসবে আয়োজন করে থাকে হালখাতা। বাংলা নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীগণ বছরের পুরনো যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে আগামী বছরের জন্য তাদের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য লাল পেড়ে কাপড়ে বাঁধানো মলাটে তৈরি খাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে রাখে। মিষ্টি মুখ করায় তার নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের। অতিথিবৃন্দও অনেক সময় তার জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে আসে। এভাবে ক্রেতারা বিক্রেতাদের সাথে তাদের পুরনো যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে নতুন সর্ম্পকের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মুরাদনগর উপজেলায় হালখাতার বেশ প্রচলন লক্ষ করা যায়-রামচন্দ্র পুর, কোম্পানীগঞ্জ, বাংগরা, প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে।

রথযাত্রায় ব্যবহৃত রথ, বরুড়া, কুমিল্লা

৩. রথযাত্রা

গঞ্জের রথযাত্রা : মুরাদনগর উপজেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র কোম্পানীগঞ্জের নিকটবর্তী গ্রাম গঞ্জর। এ গ্রামে আছে জমিদার ডেঙ্গুনাথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের আশ্রম। প্রতিবছর আষাঢ় মাসে এখানে বড় রথযাত্রা হয়ে থাকে। আনুমানিক ৫,০০০ লোকের জমায়েত হয়ে থাকে এ রথযাত্রায়।

জাহাপুর রথযাত্রা : জাহাপুর রথযাত্রা মুরাদনগরই নয় কুমিল্লা জেলার একটি বিশেষ ও প্রাচীনতম লোকউৎসব। জাহাপুর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কমলাকান্ত রায় চৌধুরী। জাহাপুরের রথ বেশ বড় এবং ঐতিহ্যবাহী রথ। প্রতিবছর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা হয়ে থাকে। এ রথ যাত্রায় দূর দুরান্ত থেকে প্রায় ২০,০০০ লোকের জমায়েত হয়ে থাকে প্রতিবছর।

হিন্দু পর্বের এসব মহোৎসবের মধ্যে লোক সমাগম, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আয়োজনের আড়ম্বর পূর্ণতার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি লোকউৎসব প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

৪. আন্দিকূট সিদ্ধেশ্বরী মন্দির মহোৎসব

মুরাদনগর উপজেলার আকুবপুর ইউনিয়নের আন্দিকূট গ্রামের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন দেব মন্দির আয়োজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব। প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব হয়ে থাকে এখানে। ৭ দিনে আনুমানিক ১লক্ষ লোকের সমাগম হয় প্রতিবছর। বিশিষ্ট শিল্পপতি বাবু সঞ্চীত কুমার সাহা বহু অর্থ ব্যয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অপরূপ স্থাপতশৈলী বেশ বড় প্রার্থনালয় সব দিক থেকে বিচার করলে আন্দিকূট সিদ্ধেশ্বরী মন্দির অসাধারণ। ৭ দিন ব্যাপী একনাম কীর্তন, হরিনাম, মহাপ্রসাদ বিতরণসহ যাবতীয় আচার আয়োজনে এ মহোৎসব অনন্য।

৫. শ্রীকাইল কালী বাড়ি মহোৎসব

শ্রীকাইল বরদেশ্বরী কালী মন্দির প্রায় পাঁচ শত বছরের পুরনো লোকঐতিহ্য। প্রতিবছর কার্তিক মাসে মহাসমারোহে শ্রীকাইলের বরদেশ্বরী কালী মন্দিরে কালী পূজা হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে বেশ কয়েক হাজার পূণ্যার্থী কালী পূজায় এসে থাকে। পশু বলী দেওয়ার রীতিও এখানে প্রচলিত আছে। মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্যামা সংগীত পরিবেশন সহ যাবতীয় ধর্মাচার শ্রীকাইল কালী বাড়ি মহোৎসব অনন্য।

৬. ছালিয়া কান্দির মহোৎসব

ছালিয়া কান্দি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিরঞ্জন বাবু, তাঁর পৈর্তৃক ভিটায় রয়েছে এক সুদৃশ্য মন্দির। প্রতিবছর পৌষ মাসের ২২ তারিখ থেকে এখানে ৭ দিন ব্যাপী মহোৎসব হয়ে থাকে। প্রায় ২০,০০০ লোকের জমায়েত হয়ে থাকে এ মহোৎসবে। ৭ দিন ব্যাপী ৭টি কীর্তনের দল এখানে গান পরিবেশন করে। ৭ দিন ব্যাপী দূর দুরান্ত থেকে হাজারো ভক্তবৃন্দ এখানে সমবেত হয়ে থাকে, তাদের মাঝে পরিবেশিত হয় কৃষ্ণ নাম সুধা। মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে এই মহোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের এক পবিত্র ধর্মীয় উৎসব হিসেবে বরুড়ায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বরুড়া উপজেলায় দুটি রথ রয়েছে। বরুড়া উপজেলা শহরের জগন্নাথ কালীবাড়ির রথ ও লক্ষ্মীপুর গ্রামের রথ। তবে জগন্নাথ বাড়ির কালী মন্দির রথযাত্রাই বেশি বিখ্যাত। এখানে সর্বশেষ রথযাত্রা হয় গত ০৩/০৭/২০১১ তারিখে। এই রথ টানা উৎসবের দিন এখানে রথ দেখা ও কলা বেচা এই মানসে মেলাও বসে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও আষাঢ় মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব ও মেলা হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিশ্বাস রয়েছে যে, রথে জগন্নাথ দেবকে দেখলে পাপমোচন হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না। মূল্যবান কাঠের কাঠামো দিয়ে এক তলা, দোতলা বা তেতালা রথ নির্মিত হয় যার মাঝখানে স্থাপন করা হয় জগন্নাথ ও সুভদ্রার মূর্তি। ভক্ত বিশ্বাসীগণ রথের সঙ্গে লম্বা দড়ি বেঁধে রথকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। বরুড়ার এ রথযাত্রায় নারী পুরুষ সকলে অংশ নেয়। উল্টোরথ যাত্রা হিসেবে সাতদিন পর রথটিকে পূর্বের জায়গায় আনা হয়। এ সময় বাদ্য বাজানো হয়, নামকীর্তন গাওয়া হয়। মেলা, নাম সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এটি একটি বর্ণিল শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। বরুড়ার রথটি ত্রিতল বিশিষ্ট্য, রথযাত্রা উৎসব ও গীতাসংঘ পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা ডা. পরেশ চন্দ্র পোদ্দার (বয়স ৮০) জানাল, এই রথযাত্রার ঐতহ্যি প্রায় অর্ধ শতকের প্রাচীনতা ঘেরা।

৭. অষ্টমী স্নান

কুমিল্লা সদর দক্ষিণস্থ চণ্ডীমুড়া মন্দিরকেন্দ্রিক ধারাস্রোতেই এখানে অষ্টমী স্নান পালিত হয়। চণ্ডীমুড়া মন্দিরের নিচে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে দূতিয়া দেবী নির্মিত বিশাল দিঘিতে এ স্নান সম্পন্ন হয়। প্রতিবছর ৯ই চৈত্র মহা অষ্টমী তিথির ভোরবেলায় এ স্নান সম্পন্ন হয়। এজন্য পূর্বদিনই পূণ্যার্থীরা মহাতীর্থ চণ্ডীমুড়া সেবাশ্রমে এসে মিলিত হয়। সারাদেশের ৩০/৪০ হাজার পূণ্যার্থী নিজেদের পাপ মোচনের আশায় এখানে এসে হাজির হয় এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে থাকে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি পবিত্র ধর্মীয় আচার এই অষ্টমী স্নান। চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে এই স্নান হয় বলে একে অষ্টমী স্নান বলা হয়। জলের দেবতা বরুণের নামে একে বারুণী স্নানও বলা হয়। এ আচার পালনের পেছনে একটি পুরাণ প্রসঙ্গ রয়েছে। জমদগ্নি ঋষির স্ত্রী রেণুকা গঙ্গা নদীতে পানি আনতে গিয়ে শতবাহু রাজার জলকেলি দেখে মুগ্ধ ও শিহরিত হন। জমদগ্নি স্ত্রীর এই বিকৃত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে পুত্রদের আদেশ করেন রেণুকাকে হত্যা করার জন্য। প্রথম ৪ পুত্র এ আদেশ অমান্য করলে পশুপাখি হয়ে যায়। পরে কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম মাকে হত্যা করে। কিন্তু মাতৃহত্যার অভিশাপে কুঠার তার হাতেই লেগে থাকে। পরশুরাম অনেক জায়গা পরিভ্রমণ করে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করলে কুঠার খসে পড়ে। সেই থেকে ব্রহ্মপুত্র নদে অষ্টমী স্নান শুরু হয়। পরশুরাম যে মহালগ্নে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করেন তা ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি। শাস্ত্রে পাপমোচনের জন্য ব্রহ্মপুত্রে স্নানের উল্লেখ থাকলেও তারা শীতলক্ষা, মেঘনা, যমুনা ইত্যাদি নদীতেও স্নান করে। পরে তা মন্দির সংলগ্ন কিংবদন্তিতুল্য দিঘিকে কেন্দ্র করেও ছড়িয়ে পড়ে। দূতিয়ার দিঘি বা দেওদিঘির ৮মী স্নান সে কথাই প্রমাণ করে।

৮. চৈত্র সংক্রান্তি

চৈত্র সংক্রান্তি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের একটি বিশেষ লোকউৎসব। এদিন বাড়ি বাড়ি নাড়ু তৈরি করে। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার কোন প্রকার কমতি লক্ষ করা যায় না। দুপুরে এই দিন সবাই দুধ, দই, চিড়া, মুড়ি, মিষ্টি খেয়ে থাকে। এ দিন সাধারণত কোরবান পুর, রামচন্দ্রপুর, শ্রীকাইল, জাহাপুর, ছালিয়াকান্দি প্রভৃতি স্থানে চড়ক পূজা বেশ সমারোহে হতে দেখা যায়।

৯. পৌষ সংক্রান্তি

বাংলা পৌষ মাসের শেষ দিন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন পৌষ সংক্রান্তি উদযাপন করে থাকে। এদিন লোকজন পিঠা পায়েশ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে পুকুরে স্নান সেরে আগুন পোহায়। এ আগুন পোহানোর অনুষ্ঠানকে মাঘ স্নান বলে। মাঘ স্নান শেষে সবাই পিঠা পায়েস খায় মহিলারা দুপুরে লক্ষ্মীদেবীর পূজার্চনা করে, বাড়ির উঠানে/মেঝেতে আল্পনা আঁকে। এ দিন প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে বাঙালি খাবার পরিবেশন করা হয়।

১০. চড়ক পূজা

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকউৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দু'দিন চড়ক পূজা হয়ে থাকে। মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর, ছালিয়াকান্দি ও কোরবানপুর গ্রামে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে এ উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলে এ উপলক্ষে মেলাও বসে থাকে।

১১. অম্বুবাচী

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোকউৎসব। স্থানীয় লোকমুখে এটি আমাবইচী নামে পরিচিত। আষাঢ় মাসে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে এবং হিন্দু মহিলারা নানারূপ সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। আমাবইচীর দিন মাটি খোড়া, হাল চালানো ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকার বিধান দেওয়া হয়। হিন্দু বিধবা নারীরা এদিন বাড়িতে নানারুপ পিঠা পুলি তৈরি করে থাকে।

১২. স্বামীজী রামানন্দ গোস্বাইর বাৎসরিক মহোৎসব

তিতাস উপজেলায় প্রচলিত হিন্দু পর্বের বিশেষ লোকউৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম মাছিমপুর ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের স্বামীজী রামানন্দ গোস্বাইর আশ্রম আয়োজিত বাৎসরিক মহোৎসব। স্থানীয় লোকজন তো বটেই আশে পাশে বহু স্থান থেকে প্রতিবছর এ আশ্রমে উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। অনেক বড় আয়তন নিয়ে এ আশ্রমটি। আশ্রমের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশ দর্শনার্থীদের মনকে নির্মল প্রশান্তিতে ভরে দেয়। প্রতিবছর প্রায় ১০,০০০ লোকের জমায়েত হয়ে থাকে এ উৎসবে। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ অষ্টপ্রহর ব্যাপী হরিনাম কীর্তন রামায়ণ পালা গান, কবিগান, দেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া দলের পরিবেশনায় আধ্যাত্মিক গান ইত্যাদি। সর্বোপরি এ উৎসব ঘিরে উৎসব প্রাঙ্গণে জমে ওঠে বিশাল মেলা। মেলায় পাওয়া যায় স্থানীয় কারুশিল্পীদের তৈরি নানা প্রকার হস্ত শিল্প, মিষ্টান্ন জাতীয় নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, যেমন–মিষ্টি, নিমকি, জিলাপী, তিল্লাই, সন্দেশ, বাতাসা, ছানামুখী, দই, রসগোল্লা, আমিত্তি ইত্যাদি, কাঠের

আসবাবপত্র ওঠে প্রচুর। সব মিলিয়ে মহোৎসব চলাকালীন সময়ে এ গ্রামের মানুষের মাঝে সাজ সাজ রব বিরাজ করে।

কুমিল্লা একটি প্রাচীন জনপদ। এক সময় এটা ছিল মূলত নাথপন্থী যোগীদের প্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ যুগে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ধারণা করা হয়, তুর্কি শাসনামলে এখানে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। কুমিল্লার প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে গাংচরে প্রতিষ্ঠিত শাহসুজা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৮ সালে। তাছাড়া এখানে প্রতিটি লোকালয়েই ২/৪টি করে মসজিদ রয়েছে। ঈদগাহ রয়েছে ৪/৫টি। মোটামুটি প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে আছে কান্দিরপাড় জামে মসজিদ, ছাতিপট্টি জামে মসজিদ, ঠাকুরপাড়া বড় মসজিদ। গোধীর পুকুর পাড় মসজিদ, ঠাকুর পাড়া বড় মসজিদ। বাগিচা গাও বড় মসজিদ, ২নং কান্দির পাড় জামে মসজিদ, মদিনা মসজিদ, পুলিশ লাইন মসজিদ, তালতলা জামে মসজিদ, থিরা পুকুর পাড় বড় মসজিদ, ইত্যাদি।

কুমিল্লা শহরের সবচেয়ে বড় দু'টি মাজার হলো কালিয়াজুড়ি হযরত বাবা আইন উদ্দিন শাহ (রঃ) চিশতির মাজার, তিনি হযরত শাহজালাল (রঃ) এর ৩৬০ সফর সঙ্গীর একজন ছিলেন। অপর মাজারটি হলো দারোগা বাড়ি আরো অনেক মাজার এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো হলো ঠাকুরপাড়া আজিজিয়া মাজার, চুন্নিয়া দরবার শরীফ, চাপাপুর পাক-ই-পাঞ্জাতন দরবার শরীফ, তেলিকোনা মজনু শাহর মাজার, তেলিকোনা মাস্তান বাবার মাজার, কাশারিপট্টি চুন্নিয়া দরবার শরীফ, মৌলভীপাড়া গায়েবী মাজার, গাংচর মাজার ইত্যাদি।

মাজারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস প্রবল। প্রতিটি মাজারেই বাৎসরিক ওরশ হয় এবং গরু জবাই করে সেসব ওরশে হাজার হাজার মানুষকে তবারক বিতরণ করা হয়। কালিয়াজুরি মাজারের ওরশকে কেন্দ্র করে ২দিন ব্যাপী বিশাল মেলা বসে।

মুসলিম সমাজের উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদ-উল-আজহা ও ঈদ-উল-ফিতর অন্যতম। এছাড়া মহররম এখানে বিরাট সর্বজনীন মিছিল হয়। এ মিছিলে সামিল হয় সাধারণ মুসলিম সমাজের অনেক মানুষ। মহররমে তাজিয়া মিছিল ছাড়াও রাতে চকবাজার তেরিয়া পট্টিতে বিরাট আগুনের মিছিল হয়। হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এর শোকে মাতম মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ অংশ ঐ মিছিলে শোকের মাতম করতে গিয়ে আপন বুক রক্তাক্ত করে। সারা শীত জুড়ে চলতে থাকে তাফসিরুল কুরআন মাহফিল, বাৎসরিক ইসলামী জলসা। মাইজভাণ্ডারির তরিকায় যারা বিশ্বাস করে তারা ছাতিপট্টিতে বিরাট ইসলামী জলসার আয়োজন করে। এতে ১০/১৫টি গরু জবাই করা হয়। এখানে অতিথি হিসাবে আসেন চট্টগ্রাম ভাণ্ডার শরীফের খাদেমসহ এ তরিকায় বিশ্বাসী বড় বড় আলেমরা। জামতলায় রয়েছে ভাণ্ডারি তরিকায় বিশ্বাসীদের বিরাট খানকা।

১৩. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা। রমযান আসে এখানে মুসলিম সমাজে বিরাট আয়োজন নিয়ে। ধর্মীয় অনুশাসন প্রকট হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষই রোযা রাখে। পর্দা দিয়ে খাবারের দোকান খোলা রাখার সুযোগও

কোথাও থাকে না। ফলে কিশোর কিশোরী, যুবক-যুবতি, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সিয়াম সাধনায় মগ্ন থাকে। স্থানীয় বাজারগুলোতে তখন রকমারি পণ্যের সমারোহ। সন্ধ্যায় বিশাল আয়োজনে খাদ্যের দোকান বিশেষত হোটেলগুলো ইফতারির উপাদান নিয়ে বসে।

আলুর চপ, পিয়াজু, ডিমের চপ, সবজির চপ, ছানাবুট, বেগুনী, মরিচ ভাজা টাটকা মুড়ি, চিড়া ভাজা দিয়ে ঠাসা থাকে ছোট বড় সব হোটেল। খাবারের হোটেলগুলো সন্ধ্যার পর একবেলার ব্যবসা নিয়েই খুশি। সারা বছর যাই আয়োজন থাক রমযানে ধনী গরীব সব পরিবারে রাতের খাবার কিংবা সেহরির জন্য ভালো আয়োজন থাকে। কাপড়ের দোকানগুলোতে যাঁকে উপচে পড়া ভিড়। দেশি ও বিদেশি রেডিমেইড কাপড়ের সমারোহ, আলোকসজ্জা দোকানগুলোকে উৎসবের আমেজে সাজিয়ে তোলে। যারা ধনী তারা পোশাক ও রকমারি পণ্য কিনতে যায় নিটকস্থ জেলা শহর ফেনি বা কুমিল্লায়। ঈদের এক সপ্তাহ আগে ভিড় জমে পাজামা পাঞ্জাবী, জুতার দোকান আর মেয়েদের সাজগোজের রকমারি দোকানগুলোতে। ঈদের দিন নামায শেষে কোলাকুলি আর এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ছেলে বৃদ্ধ সবাই দিনটিকে আনন্দের সাথে উপভোগ করে। কোরবানি ঈদে যাদের সামর্থ আছে তারা একা কোরবানি দেয় আর যাদের সামর্থ কম তারা শেয়ার করে কোরবানি দেয়। তখন স্থানে স্থানে গরু বাজার বসে। কোরবানির চামড়া কেউ বিক্রি করে আর কেউ মাদ্রাসা বা এতিমখানায় দান করে দেয়। কোরবানি ঈদের খরচ বলতে মসল্লা, মাংস ও সেমাই। এ ঈদে কাপড় কেনার আগ্রহ ততটা থাকে না। তবু যাদের আছে তারা ঈদের কেনাকাটা বন্ধ করে না। তাই ঈদের আগের দিন সবার লক্ষ থাকে পরের দিনের প্রস্তুতি। এ দিন গরীব মানুষের ঘরেও প্রচুর কোরবানির মাংস যায়। নানারকম খাবারে প্রতিটি পরিবারে আমন্ত্রিত হয় প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন।

ঈদ-উল-ফিতর : যা স্থানীয়ভাবে রোজার ঈদ নামে পরিচিত। দীর্ঘ ৩০ দিন আল্লাহর আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মশুদ্ধি ও সংযমের মাধ্যমে রোজা রাখে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে এই ত্রিশ দিন অতিবাহিত করে চাঁদ দেখে ঈদ উদযাপন করে। এদিন ঘরে ঘরে ভাল খাবার রান্না হয়। প্রায় সবাই ভালো পোশাক পরিধান করে। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে চলে কুশল বিনিময়, সবাই একমত ও একপথে চলার আশাবাদ ব্যক্ত করে ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

ঈদ-উল-আযহা : এদিন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন আল্লাহর নামে প্রিয় পশু কোরবানি দিয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে এ ঈদ বকরি ঈদ বা কোরবানির ঈদ নামে পরিচিত। এ দিন সব মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের কেউ তাদের গৃহ পালিত পশু, কেউবা বাজার থেকে ক্রয় করা পশু আল্লাহর নামে কোরবানি দিয়ে থাকে। কোরবানির গোস্ত পাড়া প্রতিবেশী ও ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। সব মিলিয়ে এদিন ভাল রান্না-বান্না হয় আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করে। খাওয়া দাওয়ার ধুম পড়ে যায় বাড়ি বাড়ি।

১৪. বিজয় দিবস

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৬ ডিসেম্বর বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তাই মহান বিজয় দিবসে বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচী আয়োজিত হয়। স্কুল কলেজগুলোতে বিজয় দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় বিজয় দিবস উপলক্ষে কনসার্ট। কোথাও ছোট খাটো মেলাও বসে এদিন।

১৫. ওরশ

অলি ও দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যে দোয়া ও জেয়াফতের আয়োজন করা হয় তাকে ওরশ বলে। ওরশ বরুড়ার লোকজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওরশ সাধারণত মসজিদ ও মাজারকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত শীতকালেই ওরশ বেশি সংঘটিত হতে দেখা যায়। অনেক সময় ওরশের খাবার আয়োজনের জন্য পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে চাল সংগ্রহ করা হয়। বরুড়ার প্রায় সর্বত্রই বার্ষিক ওরশ শরীফ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ওরশে সন্ধ্যা থেকেই ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় এবং প্রায় সারারাত ধরে চলে। ওরশের আশপাশের রাস্তায় লোকজ খাবার দাবার ও মেয়েদের পরিধেয় অলঙ্কারের দোকান বসে। সাধারণত শেষ রাত থেকে ওরশের খাবার পরিবেশন শুরু হয়, কোথাও বা সকালে খাবার দেয়া হয়। ওরশকে কেন্দ্র করে আশপাশের লোকজীবনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

বরুড়ায় মাইজভাণ্ডারির ভক্তবৃন্দের সংখ্যা কম নয়। ভক্তদের মধ্যে ধনীরা তাদের বাড়িতে ও মাইজভাণ্ডারি হুজুরের শানে ওরশ পালন করে থাকে। আর বাকি ওরশগুলো হয় মাজার ও দরবার শরীফ কেন্দ্রিক। খোশবাস মালেকিয়া দরবার শরীফে প্রতি বছর পৌষ মাসের ২০ তারিখে ওরশ হয়। অলহর দিঘির সুয়ামিয়া খন্দকার মাজারে প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২৮ তারিখ ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫/৬ হাজার মানুষের সমাগম হয়। ফরিহাটের আব্দুল জব্বার ফকির (রহ) এর রওজা শরীফে ২২শে মাঘ ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। মহেশপুরের মৌলভী আব্দুল হামিদ (রহ) এর মাজারে ২৫শে ফাল্গুন ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ঝলম বক্স আলী চৌধুরীর মাজারেও ওরশ হয়। ওরশ হয় পৌরসভার পশ্চিম পার্শ্বের গ্রাম অর্জুনতলার হাজী সানাউল্লাহ (রহ) এর মাজারে। এছাড়া অন্যান্য জায়গায়ও নিয়মিত বার্ষিক ওরশ হয়।

শাহবাজ ফকিরের ওরশ : তিতাস উপজেলার মুসলিম পর্বের সবচেয়ে বড় লোকউৎসব হলো গাজীপুরের জিন্দাপীর শাহবাজ ফকিরের মাজার আয়োজিত বাৎসরিক ওরশ। আয়তন, লোক সমাবেশ সহ যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় এ ওরশটি এ অঞ্চলে প্রচলিত মুসলিম পর্বের অন্যান্য সকল ওরশের তুলনায় বড়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ৫ তারিখ ৩ দিন ব্যাপী ওরশ হয়ে থাকে। গাজীপুর সমন্বিত স্কুল কলেজের পাশে জিন্দাপীর শাহবাজ ফকিরের মাজার অবস্থিত। মাজারটি আয়তনেও বেশ বড় এবং মাজারের নান্দনিক সৌন্দর্য প্রশংসার দাবী রাখে। মাজার গাত্রে তারকা খচিত দেশি বিদেশি বহু মূল্যবান টাইলসের ব্যবহার মাজারটির বাহ্যিক জৌলুস অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। এ ওরস উপলক্ষে জমে উঠে বিশাল মেলা। মেলায় দূর দুরান্ত থেকে হাজারো ভক্তবৃন্দ

ছুটে আসে পবিত্র ভূমির দর্শন লাভ করতে। মেলায় চলে হাজারো ভক্তবৃন্দের সমস্বরে জিকির, দোয়া, ওয়াজ মহাফিল।

আরও যে সকল ওরশ

জিন্দাপীর শাহবাজ ফকিরের ওরশ (গাজীপুর)
মালেকপীর সাহেবের ওরশ (সাহাবুদ্ধি)
মোঃ ফকির সাহেবের ওরশ (তেতুয়ারামপুর গ্রাম)
কানাই শাহর ওরশ (কড়িকান্দি)
পীর মোঃ জহিরুল ইসলামের ওরশ (কলাকান্দি)
মনু ফকিরের বাৎসরিক ওরশ (বন্ধরামপুর গ্রাম)
পীর জলিল সাহেবের বাৎসরিক ওরশ (মজিদপুর)

ওরশের অন্যান্য দিক/বিশেষত্ব

ওরশের সময় কুস্তি খেলার রীতি প্রচলিত আছে।
ওরশের মেলায় ২-২.৫ কেজি ওজনের বেল পাওয়া যায়।
মেলার প্রচুর আসবাবপত্র পাওয়া যায়।
ওরশে সমবেত ভক্তবৃন্দের মাঝে সিন্নি বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১৬. প্যাগোডা ও ধর্মীয় উৎসব

কুমিল্লায় প্যাগোডা আছে মাত্র ২টি। এর প্রথমটি ঠাকুর পাড়ার কণকস্তূপ বৌদ্ধ বিহার। এটি স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে। এখানে মাঘী পূর্ণিমায় উৎসবও হয়। এ ছাড়া কুমিল্লার অপর বৌদ্ধ মন্দিরটি আছে কোটবাড়ি ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন স্থানে। এটি স্থাপিত হয় ২০০১ সালে।

১৭. গীর্জা ও ধর্মীয় উৎসব

এখানে খ্রিষ্টানদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এরা মূলত বাঙালি খ্রিষ্টান যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ ছিল। বড়দিন, ইস্টার সানডে উপলক্ষে এখানকার দুটি গীর্জায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হয়। এ গীর্জাগুলো হলো আওয়ার লেডি সংলগ্ন গীর্জা এবং ঝাউতলাস্থ ক্যাথলিক গীর্জা।

১৮. বিজয়পুর মেলা

এই মেলা দুইশত বছরের ঐতিহ্যবাহী। তৎকালীন জমিদার রাজ নারায়ণ চৌধুরী এই মেলা চালু করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মধ্যম বিজয়পুর, বিজয়পুর শিব কালীবাড়ি মন্দির এবং বিজয়পুর মৃৎশিল্প প্রাঙ্গনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বলা প্রয়োজন, এখানে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ রয়েছে (মন্দির প্রাঙ্গণে) যাকে কালী বৃক্ষ হিসেবে বলা হচ্ছে। আর রয়েছে একটি অতি প্রাচীন মঠ। এই দুটি প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন এবং ১১৪১ বাংলা সনে প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি মন্দিরটিকে আশ্রয় করেই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই প্রাচীন মন্দির, মঠ ও কালীবৃক্ষের পাশাপাশি একই জায়গায় বিজয়পুর মৃৎশিল্প কেন্দ্রটি অবস্থিত হওয়ায় মেলাটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে।

১৯. গাজী সাহেবের মাজার মেলা

গাজী সাহেবের মাজার পশ্চিম গাঁয়ে অবস্থিত। দীঘির পশ্চিম পাড়ে পাঁচ গম্বুজ মসজিদের পাশে এ মাজার অবস্থিত। আধ্যাত্মিক পীরে কামেল গাজী সাহেবের হাতে

পশ্চিমগাঁয়ে নবাব বংশের গোড়াপত্তন হয়। গাজী সাহেবের ভক্ত অনুরক্ত ও স্থানীয় লোকজনের আগ্রহ উদ্দীপনায় এখানে ওরশ ও মেলা এ দুটি অনুষ্ঠান উৎসব বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। এখানে ফাল্গুন মাসে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। আর বৈশাখ মাসের ০২ তারিখে মেলা বসে। প্রায় দু'শ বছর আগে এখানে মেলা শুরু হয়। এটিই লাকসামের প্রাচীনতম মেলা। মেলার সময় দীঘির পশ্চিম পাড়ে বিশেষভাবে জনসমাগম হলেও মাজার ও দীঘির চার পাশটাই তখন জমে ওঠে। মূলত গাজী সাহেব ও ফয়জুন্নেসার স্মৃতিধন্য পুরো পশ্চিম গাঁওই তখন মুখর হয়ে ওঠে। দরগা কমিটি ও মসজিদ কমিটির যৌথ উদ্যোগে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় মুরুব্বীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আজকাল এ মেলায় পূর্বের মতো স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না যদিও জনসমাগমের কমতি হয় না। পশ্চিমগাঁয়ের কিশোর কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রবীণ-প্রবীণাদের সঙ্গে সঙ্গে গাজী সাহেবের ভক্তরাও দূর-দুরান্ত থেকে মেলার সময় এসে হাজির হয়।

মেলায় তরমুজ, বাঙ্গিসহ দেশি ফল ফলাদির সমাহার ঘটে। তাছাড়া মুড়ি মুড়কি, কছমা, বাতাসা, নিমকি মোয়া, আচার, চটপটি, সন্দেশ, পাপড় ইত্যাদি লোকজখাবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া আধুনিক যান্ত্রিক শুকনো খাবারেরও কমতি থাকে না।

বাঁশের বাঁশির বিচিত্র সমাহার ছাড়াও আজকাল প্লাস্টিকের কমদামি 'ভুভুজোলা' মেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া নানারকম শিশুদের খেলনায় মেলা প্রাঙ্গন রঙিন হয়ে ওঠে। এ মেলায় স্থানীয় লোকশিল্পীদের প্রস্তুতকৃত বাঁশ বেতের বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। কাঠের তৈজসপত্রও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। গৃহস্থেরা মেলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনে বাড়ি ফিরেন। আর তরুণ-তরুণীরা তাদের প্রিয়জনকে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপহার খুঁজতে মেলায় আসেন। মেলায় মেয়েদের অলঙ্কারের বিশাল যোগান থাকে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এ মেলা মানুষের মনকে রঙিন আভায় ভরিয়ে দেয়।

২০. ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার লোকমেলা

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় বেশ কিছু লোকমেলা প্রচলিত আছে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকমেলা হলো–

চান্দলা আদি শিব মেলা
ইষ্টক গ্রাম পূর্ণধাম মেলা (অষ্টমীর স্নান)
মকিমপুর দয়াময় মহোৎসব
ষাইটশালা কালীসিদ্ধা মেলা।

চান্দলা আদি শিব মেলা : মন্দিরের অবস্থান উত্তর চান্দলায়। মাঘ মাসের ২৪ তারিখ ১ দিন ব্যাপী উৎসব হয়। নামকীর্তন, ভজন গীত হয়ে থাকে, সাথে আরো থাকে কবিগান/পালাগান, রামায়ণ গান। এ উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন খোলা মাঠে বসে লোকমেলা। সকালে পূজার পূর্বে মন্দিরে পাঠা বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তারপর পূজা দেওয়া হলে ভক্তবৃন্দের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।
চান্দলার আদি শিব মেলা/মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাগণ হলেন,

সুভাষ দাস,
লালু দাস,
স্বদেশ দাস।

মন্দিরটি বহু প্রাচীন মন্দির। ৯ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে মন্দিরটিকে সংস্কার করা হয়। পুনসংস্কারক ছিলেন–শ্রী লালমোহন দাস।

ইষ্টকগ্রাম পূর্ণধাম মেলা : ইষ্টক গ্রাম যদিও ভৌগোলিক সীমারেখা বিচারে দেবীদ্বার উপজেলায় পড়েছে তবুও দেখা যায় প্রতিবছর ইষ্টক গ্রামে যে পূর্ণধাম মেলার আয়োজন বসে সেখানে মানুষজন সীমারেখা ভুলে গিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই মেলায় অষ্টমীর স্থান হয়ে থাকে, পূণ্যার্থীরা বিভিন্ন স্থান থেকে এখান এসে জড়ো হয় এবং তীর্থ স্নান করে। মেলাকে ঘিরে বসে নানা প্রকার পণ্যের মেলা, নাগর দোলা, বাউল গান, নানা প্রকার খাবারের সমাহার। এ মেলাটি উদযাপিত হয়ে থাকে প্রতি বছর চৈত্র মাসে সাধারণত যখন লাঙ্গলবন্ধ মেলা যেদিন হয় সেদিন।

২১. মকিমপুর দয়াময় মহোৎসব

মকিমপুর গ্রামে দয়াময় এর অনুসারীগণ প্রতিবছর এ উৎসব পালন করে থাকেন। প্রতিবছর এ উৎসবে বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার ভক্তবৃন্দের সমাহার হয়ে থাকে। মকিমপুর গ্রামে আছে চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর দয়াময় মন্দির। এ উৎসবে বসে মেলা, বাউল গানের আসর, ভক্তিগীতি, আধ্যাত্মিক গীত, ভজন, কীর্তন সহ নানা প্রকার আয়োজন।

অন্যান্য মেলা : রাসের মেলার রাসস্থলী, শ্রীরাম ঠাকুরের আশ্রম ৩দিন ঝুলন যাত্রার মেলা রাণীর বাজার, রাজেশ্বরী কালীবাড়ি। রাখের মেলা-কার্ত্তিক মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গল বার ঈশ্বর পাঠশালায়। ওরশ-কালিয়াজুরী, তেলিকোনা, কাশারীপট্টী, বিবির বাজার।

আধুনিক মেলা : প্রতি বৎসর টাউন হল, স্টেডিয়াম, অডিটোরিয়াম, শিল্পকলা একাডেমিতে বৃক্ষ মেলা/কৃষিমেলা তাঁত মেলা, বই মেলা, মৃৎশিল্পের গয়না মেলা লেগেই থাকে।

বিশেষ মেলা : এখানে লোকধর্মের প্রচার ও প্রসার ক্রমাগত বাড়ছে। রামকৃষ্ণ সংঘ, বিবেকানন্দ লোকনাথ সংঘ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সংঘ, স্বামী স্বরাপানন্দ সংঘ তাদের আবির্ভাব বা তিরোধান বার্ষিকীতে দুই হতে তিন দিন ব্যাপী উৎসব করে। এতে তাদের উৎসব স্থানগুলোতে মেলার আয়োজন হয়।

২২. কঠিন চীবর দানউৎসব

ময়নামতি মিউজিয়াম রোডে আনন্দ বিহারের পশ্চিম পার্শ্বে এবং কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে (সীমানা প্রচীর সংলগ্ন) পিকনিক স্পটের পাশে কিছু উচু ভূমিতে নব শালবন বিহারটি অবস্থিত। এই বৌদ্ধ মন্দির এবং অনাথালয়টিকে বৌদ্ধ পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমা প্রবারণা পূর্ণিমা পালনের পাশাপাশি প্রতি বছর এখানে কঠিন চীবর দানউৎসব পালিত হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালের ১৪ অক্টোবর রোজ শুক্রবার এখানে এই উৎসব উদযাপন করা হয়।

এই উৎসব পালনের পশ্চাতে বিশাখার স্মৃতি জড়িত। মহা উপাসিকা বিশাখা কর্তৃক প্রবর্তিত চীবর দানই হলো কঠিন চীবর দান উৎসবের মূল লক্ষ। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা তৈরি এবং সেই তুলায় চীবর তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রথমে চরকার মাধ্যমে তুলা থেকে সুতা তৈরি করা হয়। সুতা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রং করিয়ে কেইনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় চীবর বা কাপড়। এই চীবর পরদিন বিকেলে দায়ক দায়িকারা উৎসর্গ করেন ভান্তেদের উদ্দেশ্যে। এই দানে অনেক পূণ্য লাভ করা

যায়। তিন মাসের বর্ষা শেষে মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব পরিণত হয় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের মিলনমেলায়। এ উৎসব তাদের প্রাণের উৎসব। দেশের অন্যান্য প্রান্তের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ও ময়নামতি বিহারের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে ভাত ও সবজি মিশিয়ে একটি খাবার সকলকে পরিবেশন করা হয়। সবাই পাটিতে বসে বিহার প্রাঙ্গনে এই খাবার খায়। এই উৎসব পাহাড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২৩. গরিয়া লোকোৎসব

এটি ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ও নৃত্যগীত। একে গরিয়া পূজাও বলা হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরাতন বছরকে বিদায় জানানো হয় এবং নববর্ষকে গ্রহণ করা হয়। অনেক ছেলে মেয়ে এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি ত্রিপুরা গণমানুষের শিল্প, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শিল্পীরা তা পরিবেশন করে। যে বাড়ি হতে এটি শুরু করা হয়, সেখানেই এসে শেষ করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে শিব তাদের প্রধান উপাস্য। পরিবারের অমঙ্গল দূর করার জন্য গরিয়ারূপী শিবের নিকট প্রার্থনা করে তারা। এতে আচাই নামক একজন প্রধান অভিনেতা বা সর্দার থাকে। এ অনুষ্ঠানে আচাই ধুতি, সাদা জামা, সাদা পাগড়ি, কোমরবন্ধনী এসব পরিধান করে, পুরুষেরা ধুতি, গেঞ্জি, কোমরবন্ধনী পারে। আর মেয়েরা কোমরবন্ধনীর সঙ্গে পরে রিনাই ও রিসা। এ অনুষ্ঠানে একটি ঢোল দু'জনে বাজিয়ে থাকে। এ নৃত্যগীতে জঙ্গল কাটা, জসলে আগুন দেওয়া, বীজ বপন, চরকায় সুতা কাটা, কাপড় বোনা, ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়।

২৪. বিবাহ

গ্রামীণ বিনোদন ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত কোন কিছু আজ আর অবশিষ্ট আছে কি না এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম প্রায় সবই বিলুপ্তির পথে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান কিছুটা টিকে আছে হিন্দু ও মুসলমানের জন্মদিন, বিবাহ ব্রতাচার ঋতু ভিত্তিক আচার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, খেলাধুলা ইত্যাদিতে। এখনো মহা ধুমধামের সাথে গ্রামীণ ও লোকজ জীবনে প্রাচীন সংস্কার ধরে রেখে বিবাহ কার্য সম্পাদন হয়। ঘটা করে ছেলেমেয়ে দেখা, আশির্বাদ, পান চিনি, গায়ে হলুদ, অধিবাস, বিয়ের গীত, বিয়ে আসরের নানাবিধ সংস্কার, ঠাট্টা মশকারা, আড়াইল্যা, বৌ-ভাত হয়। ছেলে বা মেয়ে দেখার জন্য ঘটকালি আছে। অধিকাংশ পরিবারে এ কাজটা হয় সামাজিক আয়োজনের মাধ্যমে। প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা, ২/৪ জন মুরুব্বী আপ্যায়ণ, সবার মোকাবেলায় কথাবার্তা পাকা করা ফর্দ করা, দাবি দাওয়া পেশ, পান চিনির আয়োজন, আশীর্বাদ নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই হয়। আধুনিক চিন্তার অধিকারী প্রগতিশীল ছেলে মেয়েরা পছন্দ করে বিয়ে করলেও পারিবারিক সিদ্ধান্তহীনতা বা বিরোধিতা সেখানে নেই। এক সময় এ জন্য সামাজিক ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করা হত। অর্থাৎ কেউ যদি সমাজ গর্হিত নিয়মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করা হত। অবশ্য পরে সালিশ করে ক্ষমা চেয়ে সমাজে উঠা যেত। তবু এর দাগটি চিরতরে মুছে যেত না।

এখনো বিয়ে ঠিক করার ক্ষেত্রে বাবার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর মা বাবাও চান 'শুভস্য শিগ্রম' অর্থ্যাৎ শুভ কাজ তাড়াতাড়ি হওয়াই ভাল এবং তা আলোচনার মাধ্যমে ঘটক পাঠিয়ে। সর্বক্ষেত্রে অবশ্য ঘটক থাকে না। যদি ছেলে মেয়ে

পরস্পরকে পছন্দ করে তা হলে পারিবারিক ভাবেই বিষয়টা নিস্পত্তি করা হয়। বিবাহ বাঙালি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা। একে ঘিরে অনেক সংস্কার চালু আছে। বিশেষত হিন্দু ধর্মে বিবাহের নিয়ম প্রচুর। একটি বিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে হয়ে গেলেই চলবে না। বিয়ের পর অনেক অকল্যাণ হতে পারে এই ভেবে তারা কিছু লোকাচার পালন করে।

এ জন্য কথা বললাম শেফালী রাণী পাল এর সাথে স্বামী: মৃত- সুধীর চন্দ্র পাল। শুকুল হাউস, রাজগঞ্জ কুমিল্লা। বয়স ৫০/৫৫ হবে।

সংগ্রাহক : কী নাম আপনার?

শেফালী রাণী পাল : শেফালী পাল।

সংগ্রাহক : হিন্দু সমাজে বিয়ে ঠিক করার ব্যাপারে কোন নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

শেফালী রাণী পাল : প্রথমেই পাকা দেখার কথা আসে, ছেলে অর্থাৎ বর পক্ষের লোকজন দশ জন নিয়ে মেয়ে দেখতে আসে। তারা মেয়ে পছন্দ হলে ধান, দূর্বা ও চন্দন দিয়ে আশীর্বাদ করে। যদি ছেলে পক্ষের সামর্থ থাকে তাহলে মেয়েকে স্বর্ণের আংটি বা চেন দেয়, আর কেউ কেউ টাকা, ঠিকুজি বিচার হয়না? হয় এটা আনুষ্ঠানিক কন্যা দেখার আগেই করতে হয়, ছেলেপক্ষ তার জন্ম তারিখ, রাশি, বংশ ইত্যাদি মেয়েপক্ষকে জানায় আর মেয়েপক্ষ ছেলে পক্ষকে, যদি সব কিছু ঠিকমত মিলে তাহলেই পাকাভাবে দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

সংগ্রাহক : যদি মেয়ে পছন্দ হয় আশীর্বাদের পাশাপাশি আর কোন নিয়ম কি পালন করা হয়?

শেফালী রাণী পাল : মেয়েপক্ষের মহিলারা শঙ্খ বা উলুধ্বনি দেয়, সাথে ছেলেপক্ষও। তখন উভয় পক্ষই গ্রামের প্রতিবেশীদের মিষ্টিমুখ করাতে হয় এবং চা প্যানি খাওয়াতে হয়। একে পানচিনি বলে।

সংগ্রাহক : পাকাভাবে কথা হবার পর আর কী কী হয়?

শেফালী রাণী পাল : পাকাভাবে দেখার পর হিন্দু বিয়েতে বর ও কন্যা পক্ষকে অনেক নিয়ম মানতে হয়।

সংগ্রাহক : কয়েকটি নিয়মের কথা কি বলবেন?

শেফালী রাণী পাল : হ্যাঁ, পানচিনি, গায়ে হলুদ (অধিবাস), পানখিলি, ক্ষীরভোজন, জল ভরা, সোহাগ মাগা, বরমান, বরণ ভালা, বউ বরণ, পাশা খেলা আরো কত কি?

সংগ্রাহক : পানচিনি সম্পর্কে একটু বলবেন?

শেফালী রাণী পাল : পানচিনি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বিয়ের শুরু হয়। ঘটক বা অন্য কারো মাধ্যমে বরের পক্ষ থেকে প্রথম যখন কন্যা দেখতে যাওয়া হয় তখন তার সঙ্গে পান সুপারি মিষ্টি পাঠানো হয়। আগে চিনি বাতাসা পাঠানো হত। এখন নিয়ম পাল্টেছে তাই মিষ্টি পাঠানো হয়, এর আরেক নাম মঙ্গলাচরণ বা আশীর্বাদ।

সংগ্রাহক : অধিবাসের নিয়ম কী?

শেফালী রাণী পাল : অধিবাস হল বিয়ের আগের দিনের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে কাঁচা হলুদের সাথে মুগ, মাসকলাই, মশুরী ডাল ভালভাবে পাটায় পিশে এক সাথে মিশিয়ে মেয়ে ও ছেলের গায়ে মাখানো হয়।

সংগ্রাহক : এটা কারা করে?
শেফালী রাণী পাল : এটা করে প্রতিবেশী মহিলারা বরের বাড়ি থেকে এ উপলক্ষে লাল নতুন শাড়ি আসে, সাথে আসে একটি ডালা। মেয়ে বা ছেলের গায়ে হলুদ মাখার সময় মেয়েরা গীত গায়, ২/১টা গীত কি শোনানো যায়।
এসব গীত গাইবার আলাদা মানুষ আছে।

পান খিলি হল বিবাহিত নারী অর্থাৎ যাদের স্বামী জীবিত তাদের অনুষ্ঠান। এটা বর কনে উভয়ের বাড়িতে হয়। এদিন তারা একত্রিত হয়ে কেউ মঙ্গল ঘট বসায় কেউ ধূপ জ্বালায়, কেউ দ্বীপ জ্বালায়।

সংগ্রাহক : এর উদ্দেশ্য কী?
শেফালী রাণী পাল : এতে বর ও কন্যার মঙ্গল হয়।

সংগ্রাহক : ক্ষীরভোজন বিষয়টা কী?
শেফালী রাণী পাল : এটা এক সময় হত, এখন হয় না। এটা আসলে বর কন্যার জন্য অবিবাহিত অবস্থার শেষ খাবার। এ অনুষ্ঠানে বর ও কন্যার নিকট আত্মীয় জ্ঞাতী গোষ্ঠীরা তাদেরকে মিষ্টান্ন খাওয়ায়। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনো এ অনুষ্ঠানটা ছিল, বহু বছর আর এ অনুষ্ঠান হতে দেখিনা।

সংগ্রাহক : জলভরা কী?
শেফালী রাণী পাল : জলভরা এখনো আছে। বিয়ের দিন খুব ভোরে কাক পাখি ডাকার আগে সধবা নারীরা কন্যাকে স্নান করানোর জন্য সাতঘাট থেকে জল আনে। এরপর কলসীর মুখে একটি আমপাতা প্রশাখাসহ ঘরের এক কোনে রেখে দেয়া হয়।

সংগ্রাহক : এখানে কি বিয়ের বাদ্য বাজে?
শেফালী রাণী পাল : হ্যাঁ, বিয়ের বাদ্যতো বাজবেই। মেয়ের বিয়ে বাদ্য না বাজলে কেমনে হবে? তবে এখন শহরের বাড়িতে জলভরা হয় যে কোন সময়, সাত ঘাটতো পাওয়া যায় না, তিন ঘাট বা এক ঘাটে করা হয়। সোহাগ মাগা কী? এটা মেয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সকাল থেকে মেয়েদের বাড়িতে নানা আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মেয়ে যেন আদর সোহাগে থাকে এই কামনা সব মা করে। এটা করা হয় মেয়ের মঙ্গলের জন্য। আসলে সোহাগ মাগার অর্থ হল পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের কাছে মেয়ের জন্য আশীর্বাদ চাওয়া।

সংগ্রাহক : এর জন্য কি কোন নিয়ম আছে?
শেফালী রাণী পাল : হ্যাঁ, অনেক নিয়ম। এটা করে মেয়ের মা একটা লক্ষ্মীর কুলা আচল দিয়ে ঢেকে কুলাটা মাথায় নিয়ে মা প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের ঘরে ঘরে যায়। কুলায় থাকে সিন্দুর, কাঁচা হলুদ, তেল আর মাটি। এ মাটি চিমটি দিয়ে ঘরের দুয়ার থেকে তোলা হয়। মার সঙ্গে পাড়ার নারীরাও যায়। তারা গীত গায় আর জোগার দেয় আর কোন নিয়ম কি আছে এ সোহাগ মাগার? আছে, কুলাটি রঙ দিয়ে আলপনার মত করা হয়। জলভরার কলস, বিয়ের পিড়ি, বিয়ের ফুলে সবই রঙ করা হয়। বিয়ের আগের দিন কন্যার বাড়িতে ঘর উঠানে চালের গুড়া দিয়ে আলপনা করার নিয়ম আছে। সোহাগ মাগার নিয়ম হল সাতঘর আল্পনা করা, কুলোর মধ্যে হলুদ, তেল, সিন্দুর, মাটি ছাড়াও থাকে একটি লাল পাড়ের নতুন শাড়ি। কেউ কেউ তেলের বদলে ঘি ব্যবহার করে আবার কেউ কেউ ব্যবহার করে পান সুপারি দই।

সংগ্রাহক : বরস্নান কী?
শেফালী রাণী পাল : বরস্নান হল বর যাত্রার আগের মঙ্গল চরণ আর কন্যা স্নান হলো মেয়ে সাজানোর আগের মঙ্গল চরণ। এসব করতে হয়। বিয়ে অতি পবিত্র বিষয়। বিয়ের পিড়িতে বসার আগে মেয়ে ও বরকে পূত পবিত্র হতে হয়।

সংগ্রাহক : বরণডালা কী?
শেফালী রাণী পাল : বরণডালা হল বিবাহতত্ত্ব পাঠানোর ডালা। বর মেয়ের বাড়িতে যে সব দ্রব্য পাঠায় তাই বরণডালা। এখন অবশ্য বরণডালা আসেনা। আসে দামি লাগেজ, বা স্যুটকেস। মেয়ের জন্য বরের বাড়ি থেকে সাজন, অলংকার পরিচ্ছদ আসে, কেউ কেউ আলাদা ভাবে একটি বাঁশ বা বেতের তৈরি ডালা পাঠায়। ডালা পাঠাতে না পারলে তা সাজানোর জন্য পান, সুপারী কাঁচা হলুদ, মিষ্টান্ন, দই, মাছ অবশ্যই পাঠাতে হয়।

সংগ্রাহক : বরণডালা পাঠানো হয় কখন?
শেফালী রাণী পাল : আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন। এখন অবশ্য কেউ কেউ বিয়ের দিনও পাঠায়, কাছাকাছি বিয়ে হলে তো আর কথাই নাই।

সংগ্রাহক : বর বিয়েতে যাত্রার আগে কি কোন নিয়ম আছে?
শেফালী রাণী পাল : হ্যাঁ আছে।

সংগ্রাহক : কী নিয়ম?
শেফালী রাণী পাল : প্রতিদিন সকালে আশ্রমে চলে যাবে সে মেয়েকে কিছু দিবে।

সংগ্রাহক : পুরুষবরণ, জামাইবরণ নাপিতবরণের কি কোন নিয়ম আছে?
শেফালী রাণী পাল : হ্যাঁ, এখানে বিজোড় সংখ্যায় টাকা দিতে হয়। বিয়ের জন্য বিজোড় সংখ্যা মঙ্গলের চিহ্ন। বিয়ের শেষ রাতে হয় বর কনের প্রতীকী বাসর। এর আগে বরকে শালিকা বা শ্যালিকা সম্পর্কের কেউ খাওয়ায়, হাত ধোয়ায়। এ জন্য জামাইকে উপহার দিতে হয়। শ্যালিকা না থাকলে কাজটা করে শালা। বর কনের বাসর সজ্জা তোলাকে বলে বাঁসি সজ্জা এখানেও বাঁসি সজ্জা তোলার জন্য বরকে দণ্ড দিতে হয়। এ জন্য বিয়েতে যাত্রা করার আগে বরের সাথে যে যায় তার হাতে প্রচুর ভাঙ্গতি টাকা দিয়ে দিতে হয়। নিয়ম মানতে হবে নতুবা এসব নিয়ে অনেক কথা হয়।

সংগ্রাহক : বরের সাথে কে থাকে?
শেফালী রাণী পাল : সাধারণত জামাই বাবু সম্পর্কের কেউ না থাকলে ছোট বোন জামাইও যেতে পারে। এখন বলুন বউ বরণের কথা।
ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার আগে একটা কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। ঘর থেকে বাহিরে উঠান পর্যন্ত সেখানে পান সুপারী ধান, দূর্বা থাকে মা ধান দূর্বা দিয়ে বর ও কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। তারপর তার কোলে বসিয়ে দু'জনকে দুধ খাওয়ান।

সংগ্রাহক : আপনাদের বউভাতের সংস্কার কী?
শেফালী রাণী পাল : বউ যেদিন প্রথম রান্না ঘরে যায় এবং তার হাতের স্পর্শ করা রান্না সমাজকে পরিবেশন করে সে বরের সমাজে উঠবে। বরের বাড়িতে এটাই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। এ দিনের অনুষ্ঠানে কন্যা পক্ষের লোকজনও উপস্থিত থাকে। আর্থিক অবস্থা

যাই থাক একদিন বর পক্ষকে তাদের অবস্থান জানানোর জন্য সমাজের দশজনকে শাক ভাতের নিমন্ত্রণ করতে হয়। বিরাট না হোক, বরপক্ষ চেষ্টা করে সমাজে নিমন্ত্রিত অতিথিদের এক বেলা নিয়ম অনুযায়ী খাওয়াতে। পোলাও, সাদাভাত, মাছ, মাংস, ডিম, সালাদ, চাটনী এ দিনের প্রধান আয়োজন। ঘরের ছেলে বিয়ে করতে বাইরে যাবে। এটা খুব পবিত্র কাজ, পথে কত অমঙ্গল হতে পাবে। কোন মা চান না ছেলে বিয়েতে যাত্রার সময় কারো কুনজরে পড়ুক। এ জন্য মা ছেলে প্রণাম করে বিদায় চাইলে হাতের বড় আঙুলটা একটু কামড়ে বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের ধুলো নিয়ে তিনবার ছেলের কপালে ছোয়ান এবং থুথু দেন। উদ্দেশ্য ছেলের উপর যেন কারো খারাপ দৃষ্টি না পড়ে।

সংগ্রাহক : আরো কী নিয়ম আছে বিয়ের?
শেফালী রাণী পাল : আছে তো, ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার আগে বউবরণ হয়। কিন্তু বিয়ের রাতে শেষে আরো কী কী হয় তাতো জানা হলো না? কোনটা জানতে চাও, বলো। একটু বিয়ের আসরের কথা বলুন। বিয়ের আসরে অনেক নিয়ম আছে। হিন্দু সমাজে বিয়ের আসরে সাত দিবার নিয়ম আছে। পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়ে বিয়ের কাজ সারেন এটা অনেক সময়ের ব্যাপার এখানে বর, কন্যা, কন্যার বাপ সবাইকে উপোস থাকতে হয়। বিয়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মুখে কিছু নিতে পারে না। যদি কনের বাড়িতে ঢোকার আগে তার শ্যালিকা বা শ্যালক সম্পর্কের আত্মীয়সহ বউ দিয়া শরবত খাইয়ে নগদ কিছু আদায় করে। কন্যার বাপকে অনেক দান দক্ষিণা করতে হয়।

যেমন পুরুষবরণ, নাপিতবরণ, জামাইবরণ, আরো কত কী? এর আগেও কী কিছু করতে হয়? তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করে শুদ্ধ হতে হয়। তা না হলে বর কনের অমঙ্গল হয়। একে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে।

সংগ্রাহক : বিয়ের শেষ আনুষ্ঠানিকতা কী?
শেফালী রাণী পাল : পাশাখেলা। এর আরেক নাম কড়িখেলা। বাসর ঘরের মেঝেতে শীতলপাটির উপর বর ও কন্যাকে পাশা খেলতে হয়। এ জন্য কোথাও একুশটি, কোথাও সাতটি কড়ি ব্যবহার করা হয়। খেলার সময় কেউ বরের পক্ষ নেয়, কেউ কন্যার, কড়িগুলো বর তিনবার আর কন্যা তিনবার পাটির উপর ছড়ায়। এতে ভাগ্য গুণে দেখা হয় কার কতটি কড়ি উল্টালো। যার বেশী উল্টায় তার জিত। এরপর হয় আংটি লুকানো। এ খেলায় যেই জিতুক বরকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এছাড়া ভাত খাওয়া শেষে দই বা হালকা পানীয় সহ পান সুপারি থাকে। বউ ভাতের দিন নিমন্ত্রিতরা নিমন্ত্রণ শেষে বর ও কনেকে দেখে তাদের হাতে অর্থ বা নানা রকম উপহার তুলে দেন। এটা ছিল, আছে থাকবে। বিয়ের দিন কনেপক্ষের বাড়ি থেকেও প্রচুর উপহার সামগ্রী আসে। কেউ কেউ ছেলেকে যৌতুক দিতে হয় বলে মেয়ের বাড়িতে পাওয়া উপহার সামগ্রী মেয়ের বাড়িতেই রেখে দেয়। অথচ বউ ভাতের সিংহভাগ খরচ কনে পক্ষই বহন করে।

সংগ্রাহক : কীভাবে?
শেফালী রাণী পাল : বিয়ের যে লেনদেন হয় তা দিয়েই বরপক্ষ বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করে। এখানে বরপক্ষের যাতায়াতের অর্ধেক খরচ মেয়ের বাড়িতে পুরোহিতের যাবতীয় খরচের অর্ধেক কন্যা পক্ষকে বহন করতে হয়।

সংগ্রাহক : দ্বিরাগমন কী?
শেফালী রাণী পাল : দ্বিতীয় বার কনেপক্ষের লোকের বরের বাড়িতে আসা। এটা এখন আলাদাভাবে হয়না। বউ ভাত ও দ্বিরাগমন এক সাথেই সারা হয়। এতে বাড়তি খরচ হয়না, সময়ও বাঁচে।

সংগ্রাহক : আড়াইল্যা কী?
শেফালী রাণী পাল : বরের কনের বাড়িতে আড়াই দিন থাকা। এ দিন কনের বাড়িতে বর আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্য বরকে মাছ, দই, মিষ্টি দ্রব্য কিনতে হয়।
বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান কী?

বিয়ের শেষ অনুষ্ঠান হল অষ্টমঙ্গল। এটা হিন্দু ধর্মে পালিত হয় বিয়ের অষ্টম দিনে কন্যার বাড়িতে মূলত এ দিনেই বর ও কনের মঙ্গলসূত্র খুলে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়।

হিন্দু বিয়ে রীতির যে চমৎকার তথ্য পাওয়া গেল তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাকেও।

মুসলিম বিয়ে

মুসলিম বিয়ে নিয়ে কথা হয় আলোমনি খন্দকার-এর সঙ্গে বয়স ১৭, উত্তর চর্থা, কুমিল্লা।

সে জানায় আমাদের মধ্যে তো কোষ্ঠি বিচার হয় না। মুসলমানরা ভাগ্যে বিশ্বাস করে না, সবই আল্লাহর হাতে, মেয়ে বা ছেলে পছন্দ হলে মুরব্বী কাউকে দিয়ে উভয় পক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। এখন ঘটকালি এভাবেই হয়।

যদি উভয় পক্ষ পরস্পরকে দেখতে আগ্রহী হয় তাহলে পানচিনি। এই দিন উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বিয়ের দিনক্ষণ দান-যৌতুক দেনমোহর ঠিক করা হয়। সব ঠিক হয়ে গেলে উপস্থিত সবাইকে পানচিনির মিষ্টি পান সুপারী খাওয়ানো হয়।

ফর্দ হয় মেয়ে দেখার দিন। আবার ছেলে দেখার দিনও হতে পারে। ফর্দ হল মেয়ে পক্ষের কাছে ছেলে পক্ষের দাবি আর ছেলে পক্ষের কাছে মেয়ে পক্ষের উভয় ক্ষেত্রেই কিছু সামাজিক বিধান আছে, ধর্মীয় নয়।

গায়ে হলুদের দিন বরের বাড়ি থেকে মেয়ের জন্য কুলা, হলুদ, শাড়ি, কাঁচা হলুদ ইত্যাদি পাঠানোর নিয়ম। এসব নিয়ে আসে মেয়ে পক্ষের কোন আত্মীয় সাধারণত এদিন ছেলের নানা, নানী ছোট ভাইবোন ভগ্নীপতি, বন্ধুরা আসে, মা বাবা নয়।

হলুদ সন্ধ্যার সূচনা হয় ছেলের ভগ্নিপতি বা বোন গায়ে হলুদের সূচনা করে। মেয়ের হাতে রাখি পরায়, ছেলের ছোট ভাই বা বোন, তারপর একে একে সবাই গায়ে হলুদ দিয়ে মেয়েকে গোসলের পিড়িতে বসায়। এ পিড়িটা আল্পনা করা থাকে এবং বিয়ের পিঁড়ি হিসাবেই নির্দিষ্ট। এরপর মেয়ের মাথায় ওড়না ধরে এর উপরে পুতা ধরা

হয়। এ পুতার উপর সরিষার তেল ঢালা হয়, যা ওড়না ভেদ করে মেয়ের মাথার উপর পড়ে। এ সময় মেয়ের ঠাট্টা (ঠেসারা) সম্পর্কের আত্মীয়ারা বিয়ের গীত গায়, অন্যরা কলসি দিয়ে পানি এনে মেয়েকে গায়ে তেল হলুদ মাখিয়ে খুব ভাল করে গোসল করিয়ে এ পর্ব শেষ করে। এখানে মেয়ের জন্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র মেয়ের বাড়িতে স্মৃতি হিসাবে রাখা হয়।

যারা ছেলের বাড়ি থেকে আসে তাদের মিষ্টি মুখ করানো হয় এবং এরপর খাওয়া দাওয়া। গায়ে হলুদ উপলক্ষে মেয়ে পক্ষ তাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও মেয়ের বন্ধুদের দাওয়াত করে। এখন গায়ে হলুদে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় কেউ ব্যান্ডপার্টি আনে আবার কেউ সাউন্ড সিস্টেম এনে নামি শিল্পী দিয়ে গান গাওয়ায়। প্রচুর আনন্দ হয় এ অনুষ্ঠানে।

আচার-অনুষ্ঠান

অঞ্চলভেদে মানুষের আচার-আচরণ ভিন্ন হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, অভ্যাস, বিশ্বাস, ভৌগোলিকতা ইত্যাদির কারণেই এলাকাভেদে মানুষের রীতি আচারে পার্থক্য ঘটে। তবে একই আচার অনুষ্ঠান একটি দেশের নানা জায়গায় পালিত হতে দেখা যায়। সাধভক্ষণ, আকিকা, অন্নপ্রাশন, বৃষ্টি আবাহন বা মেঘমাগন, গৃহপ্রবেশ ও গৃহবন্ধন, বালা মুছিবত দুরীকরণের দোয়া ও মিলাদ নোয়াখানা। মানত করা, সই ও দোস্তী পাতানো, হালখাতা, লোককাইজ্যা ইত্যাদি এ এলাকার প্রধান রীতি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মুসলমানির অনুষ্ঠান ও (সুন্নতে খৎনা) একটি প্রথা হয়ে গেছে। আর হিন্দু ও মুসলিম রীতির বিয়ে রয়েছে পর্বে পর্বে বিভক্ত নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান।

১. হালখাতা

হালখাতার আনুষ্ঠানিকতা বিক্রেতা ও খদ্দেরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে একে লোকোৎসব হিসেবে না দেখিয়ে লোকাচার হিসেবে দেখানো হলো। আগেকার দিনে রাজা ও জমিদারগণ খাজনা আদায়ের জন্য পূণ্যাহ পালন করতো। এদিন সাধারণ প্রজাগণ জমিদারের কাছারি বাড়িতে এসে জলপান, মিষ্টিমুখ করতেন এবং খাজনা প্রদান করতেন। এই রীতি থেকেই হালখাতার প্রচলন হয়েছে। পূণ্যাহের অস্তিত্ব এখন নেই, তবু হালখাতাকে বরুড়ায় এখনো পূণ্যাহ নামেই ডাকা হয়।

বর্তমান ব্যবসায়ী ও দোকানমালিকগণ খদ্দেরদের নিকট থেকে তাদের পাওনা আদায়ের জন্য হালখাতা খুলে থাকেন। খদ্দেরকে আলপনা করা চিঠিতে দাওয়াত দেওয়া হয়। ঠিঠিতে লেখা থাকে,

হাসিমুখে দিতেছি বিদায়
ফিরে না আসিব আর
শান্তির অভয় বাণী
শোনবো বার বার।

সাধারণ বাংলা বা ইংরেজি বছরের প্রথম দিকেই হালখাতার আয়োজন করা হয়। তাই এ জাতীয় পঙক্তি লেখা থাকে। এদিন দেনাদার ক্রেতাগণ তাদের সমুদয় পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দোকান মালিক তাদের আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন রকম মিষ্টান্নের ব্যবস্থা রাখেন। আজকাল অনেককেই বিরিয়ানি খাওয়াতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীগণ এদিন মাইকের মাধ্যমে মারফতি, দেহতত্ত্ব, জারি, নারী পুরুষকেন্দ্রিক বিচার গান ইত্যাদির অডিও বিনোদনের ব্যবস্থা করেন।

২. সাধভক্ষণ

বরুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় একে হাদি বা সাধী বলা হয়। সাধারণত সাত মাসের গর্ভবতী নারীকে নিয়ে এই আচার গড়ে উঠেছে। তবে তা ৮ বা ৯ মাসেও হয়ে থাকে। এই

লোকাচারটি অধিকাংশ জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে অঞ্চলবিশেষে এর নিয়মনীতিতে ভিন্নতা যুক্ত হয়ে থাকে। এ আচার পালনের দিন গর্ভবতী নারীর সাধ বা ইচ্ছানুযায়ী খেতে দেওয়া হয়। ৭ মাসের পর সাধ খাওয়ানো চলে বটে, তবে এতে মেয়েপক্ষের মান থাকে না। এজন্য শ্বশুরবাড়ির মানুষের কটু কথাও শুনতে হয়। অনুষ্ঠানটি হয় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। সাধভক্ষণের সমুদয় উপকরণ নিয়ে মেয়ের বাবা-মা ও আত্মীয়দেরকে নিয়ে মেয়ের জামাইবাড়িতে গিয়ে হাজির হতে হয় সন্তানবতী নারীকে উঠানের এক জায়গায় নতুন পাটিতে বসানো হয়। ৭ বা ততোধিক পদের ফল-ফলাদি, নাস্তা, হরেক রকমের মাছ, মাংস, ভর্তা, ইত্যাদি তার সামনে রাখা হয়। অনেক সময় ধাইরা এ আয়োজন ও খানা পিনার অংশীদার হয়। গর্ভবতীকে ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো হয়। অন্যরাও এ খাবার খায়। শিশুদেরও এ খাবার খাওয়ানো হয়। খাবারের মধ্যে টক জাতীয় খাবার থাকে, থাকে মিষ্টান্নও। শিশুর মঙ্গল কামনা এবং গর্ভবতীর ইচ্ছাপূরণ এ দুটিই এ অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনে করা হয় সাধভক্ষণ না খাওয়ালে সন্তান লোভী ও অসংযমী হবে। এ অনুষ্ঠানে আর্থিক সামর্থ্য (মেয়ের অভিভাবকের) অনুযায়ী খরচ করা হয়। গরিব বাবা মাও এটি পালনের প্রয়োজনীয়তার্য় বিশ্বাস করেন। সন্তান খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে না মনে করেই এটি পালিত হয়। তবে এর একটি বৈজ্ঞানিক দিক রয়েছে। এভাবে খাওয়ালে তা থেকে গর্ভস্থ শিশু পুষ্টি পায়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সাধভক্ষণের বিবরণ রয়েছে।

৩. করণক্রিয়া

করণক্রিয়া কুমিল্লাতে মুসলিম সমাজে ব্যাপক নয়। সন্তানের কল্যাণ কামনায়, নিজের বা পরিবারের স্বাস্থ্য ব্যবসা ও ভবিষ্যত উন্নতিতে যে যে মাজারে বিশ্বাস স্থাপন করে সেখানে মানত করে। মিলাদের আকাঙ্খাও ব্যক্ত করা হয়। মানত ফলুক বা না ফলুক তা রক্ষা করা তখন সবার কর্তব্য হয়ে যায়। কুমিল্লার অধিকাংশ মানতগুলো হয় মাজারকেন্দ্রিক। এর নাম সম্ভবত পীরবাদ। দারোগা বাড়ির মাজার, কালিয়াজুড়ি হযরত আইনউদ্দিন শাহর মাজার এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অন্য যে মাজারগুলো আছে সেখানেও প্রচুর মানত হয়। গাছের প্রথম ফলটা মাজারে দেয়া হয়। বিশ্বাস এতে গাছে প্রচুর ফল হবে এবং ফল পুষ্ট হবে। ব্রত, চড়ক জামাইষষ্ঠী সাতশা, ভোগ এসব বাঙালি হিন্দু সমাজের সাংবাৎসরিক ক্রিয়ার অংশ। প্রতি শনিবারে শনিপূজা দিয়ে শনির দশা থেকে মুক্তি পাওয়া, শনির কুনজর এড়িয়ে চলা অনেক পরিবারেই আছে। এ পূজা দিতে হয় ঘরের বাইরে এবং শনিপূজার প্রসাদ ঘরে আনার বিধান নেই। প্রতিবছর চড়ক পূজা হয় চৈত্র মাসে। চড়ক পূজা উপলক্ষে কুমিল্লা রাণী বাজারস্থ রাসস্থলি প্রাঙ্গনে তিনদিন ব্যাপী চড়ক মেলা হয়। অবশ্য কুমিল্লায় চড়ক পূজা হয়না। লক্ষ্মীর ব্রত সারা বছরই করা যায়। ভাদ্র মাসে একবার লক্ষ্মীর ব্রত হয় যা অনেক পরিবারই করে থাকে। এ ব্রতটি হয় ব্যাপকভাবে। জামাই ষষ্ঠীর একটা নির্দিষ্ট দিনলিপি আছে। বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে এ উপলক্ষটি বাঙালি হিন্দু সমাজের এক সামাজিক বাধ্যগত বিধি হিসাবে গণ্য হয়। সাতদিন পর্যন্ত সময় থাকে জামাইষষ্ঠীর। শ্যালিকা ও শ্বশুরবাড়ি আত্মীয় স্বজনের জন্য নতুন কাপড় চোপড় নিয়ে

যায়। সাথে নিতে হয় আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, মিষ্টি দুধ ইত্যাদি। শ্বশুর শাশুড়ি ও মেয়ে, মেয়ে জামাইসহ নাতি নাতনীকে নুতন কাপড় দিয়ে আশীর্বাদ করে। এদিন শ্বশুর বাড়িতে খুব ভাল খাবারের আয়োজন হয়। এ ছাড়া হয় বিপদ নাশিনী ব্রত, মনসা ভ্যান মাসব্যাপী মনসার পুঁথিপাঠ হয়। পুঁথিপাঠ শেষে হয় গীত। তারপর প্রসাদ বিতরণ। ভোগ দেওয়ার বিষয়টা হিন্দু সমাজের চিরাচরিত বিষয়।

৪. মিলাদ দেওয়া/দোয়া পড়ানো

এটি গ্রামীণ মুসলিম সমাজের একটি অন্যতম লোকাচার। দোয়া পড়ানোর আনুষ্ঠানিকতা বা মিলাদ দেওয়া ছাড়া গ্রামীণ মুসলমান জনজীবনের কথা কল্পনা করা যায় না। নতুন ঘরে বসবাস উদ্বোধন, বালা-মুসিবত ও রোগ শোক থেকে মুক্তির নিমিত্তে এ আচার পালন করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় কর্তব্যবোধ থেকেও মানুষ এটি সময়ে সময়ে আয়োজন করে থাকে। শিশু জন্মের পাঁচদিনের অনুষ্ঠান, মুসলমানি (সুন্নতে খৎনা) অনুষ্ঠান, হালখাতা অনুষ্ঠান, মৃত্যুর চল্লিশা পালন কিংবা কোন সফলতা লাভ বা সফলকাম হওয়ার প্রার্থনা জানানোর ভাষা হিসেবে মিলাদ পড়ানো হয়। এই লোকচার পালন না করলে সমাজে মানসম্মান থাকে না। যদিও এটি পালনের বাধ্যবাধ্যকতা নেই।

গ্রামের মোল্লারা এ আচারানুষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত। অধিকাংশ সময় একজন মোল্লা দিয়েই এই আচার সম্পন্ন করা হয়। তবে বড় পরিসরে ৫-১০ জন মোল্লাকেও দাওয়াত করে আনা হয়। এক্ষেত্রে বয়স্ক একজন প্রধান মোল্লা হিসেবে নেতৃত্ব দেন এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন। মোল্লারা সাধারণত স্থানীয় মসজিদের ঈমাম হয়ে থাকেন।

দোয়া পড়ানোর দিন গৃহস্থ ঘরে ভালো খানা পিনার আয়োজন করা হয়। বাড়িঘর লেপে-মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। বাড়ির পুরুষ মহিলারা পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে। মোল্লারা এলে আবার বাতি জ্বালিয়ে সকলে টুপি মাথায় গোল হয়ে বসে। এতে বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় নানা দোয়া-দরুদ পড়তে হয়। বসা থেকে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকতা পালনকে বলে 'কেয়াম করা'। সাধারণত দাঁড়ানো অবস্থায় মোল্লাদের সাথে অন্যরা কণ্ঠ মিলিয়ে সুর করে নবীর শানে ছন্দোবদ্ধ পক্তিমালা গেয়ে থাকে। যেমন–

১. কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী আমাদের ছাড়িয়া আপনি বিনা কী লাভ হইবে এই ধরাতে বাচিয়া

২. উড়িয়া যাওরে ভোরের হাওয়া
যাওরে উড়িয়া মদিনায়
গুণাগারের ছালাম খানি
পৌঁছাও নবীজীর রওজায়।

৩. নবীজীরও সুন্নত ধরে ডাক মুমিন মাওলারে রোজ হাশরে দয়াল নবীজী ভুলনারে মোদেরে। এ সময় সকলের গায়ে সুগন্ধি গোলাপজল ছিটানো হয়। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতায় একটি ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকে। তারপর বসে আরো কিছু সূরা পড়ে মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ করা হয়। অন্দরের মহিলারাও মোনাজাত ধরে। তারপর খাবার পরিবেশন করা হয় এবং মোল্লাদের সম্মানী দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সাথে সৌহার্দ্যও বাড়ে।

৫. আউজ উৎসব

নবজাতকের জন্মের ৫দিনের মাথায় আউজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি নবজাতককে সাদরে বরণ অনুষ্ঠান। নবজাতকই এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়। গ্রামে সাধারণত ছোট একটি ঘরে মাকে রাখা হয় সন্তান জন্মদানের জন্য। একে 'আউজ ঘর' (আতুর ঘর) বলে। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুকে বড় ঘর বা শোবার ঘরে তোলা হয়। এদিনই শিশুর চুল প্রথম বারের মতো কাটা হয়। আগের দিনে সাধারণত বাড়িতে নাপিত এনে এ চুল কাটানো হতো। আউজ অনুষ্ঠানের গানেই এ পরিচয় পাওয়া যায়,

সোনার গাঁইয়া নাপতারে রূপার গাঁইয়া ক্ষুর
বালা কইরা কামাইও নাপতা
না লাগাইও ক্ষুররে, না লাগাইও ক্ষুর।

এখন সাধারণত সন্তানের মা বা অন্য নিকট সম্পর্কের কেউ এ চুল কাটার কাজটি করে। চুল কেটে গোছল করিয়ে নবজাতককে নতুন কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। নবজাতকের মামার বাড়ি থেকে নবজাতকের জন্য নতুন পোশাক আনা একরকম বাধ্যতামূলক। একে 'হাজপোশাক' (সাজের পোশাক) বলে। সন্তানের মামার বাড়ির মামা, নানা, নানিগণ পোশাকের পাশাপাশি কচি মুরগি, আতপ চাল ইত্যাদিও এনে থাকে। অন্যান্য নিকট জনদেরও দাওয়াত করা হয়।

মূলত সন্ধ্যা থেকেই অনুষ্ঠান জমে ওঠে। সন্ধ্যায় সাধারণত নবজাতকের সুন্দর ভবিষ্যত কামনায় স্থানীয় মোল্লা দিয়ে মিলাদ (দোয়াপড়ানো) পড়ানো হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নবজাতকের নাম রাখা হয়। এজন্য ৫টি সলিতাতে কেরোসিন মিশিয়ে একেকটি সালিতার জন্য একেক নাম নির্ধারণ করা হয়। সলিতায় আগুন দিয়ে দেখা হয় কোনটি পরে নিভেছে। যেটি সবশেষে নিভে সেই নামই নবজাতকের জন্য রাখা হয়। মনেকরা হয় এতে সন্তান দীর্ঘজীবী হবে। আবার কন্যা সন্তানের চুল কাটানোর সময় সাধারণত একগাছি পাটের উপরে বসা হয়। মনে করা হয় এতে কন্যার চুল দীঘল হবে। কিছু স্থানীয় মহিলা এ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গান গাইতে জানে। এদেরকে 'গীতঅলী' (গীতওয়ালী অর্থাৎ গায়িকা) বলে। অনুষ্ঠানের পর্বে পর্বে গান গাওয়ার জন্য 'গীদঅলী' দের দাওয়াত করে আনা হয়। গীদঅলী' গাইতে থাকে,

সোনারই ঘর খান রূপালি কেওয়ার (দরজা) খান
কি খাওয়াইয়া পালব জয়ধন মালারে
জয়ধন কান্দাইও না

সবশেষে সকলে মিলে আহার পর্বে বসে। খাওয়ার শেষে নবজাতকের মঙ্গল কামনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৬. ব্রত-পার্বন

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব হল ব্রত পার্বন। লোকমুখে একটি কথা প্রচলিত আছে তা হলো 'বারো মাসে তেরো পার্বণ। এ অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে ব্রত পার্বন লোকউৎসব পালনের সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য কতগুলো ব্রত পার্বনের বিবরণ তুলে ধরা হলো–

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত : সাধারণ লোকমুখে তা মঙ্গলাচণ্ডী ব্রত নামে পরিচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রত পালন করা হয়। ঠাকুর পুরোহিত দিয়ে এ ব্রত করার বিধান আছে। ব্রত শেষে ব্রতকথা শ্রবণ করতে হয়। ব্রতের উপকরণ সতেরটি সুপারি, ধান, দূর্বা, ফুল, পাকা আম, কাঁঠাল, পৈতে ইত্যাদি।

শিবরাত্রির ব্রত : আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয় নবমী তিথির ভেতর যে কোন শনি বা মঙ্গলবারের এই ব্রত করতে হয়। ঘট স্থাপন করে তাতে আম্রপল্লব দিয়ে এই পূজা করতে হয়। এই পূজার জন্যই পুরোহিত নিতে হবে ও সাধ্যমতো তাকে দান দক্ষিণা দিতে হবে।

সত্যনারায়ণ ব্রত : এই ব্রতের কোনও তিথি নক্ষত্রের নিষেধ নেই। যে কোন লোক প্রদোষ কালে এই ব্রত করতে পারে। নারী পুরুষ, কুমার কুমারী নির্বিশেষে এই ব্রত পালন করতে পারে। পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি এই ব্রতের প্রসিদ্ধ দিন। উপবাস থেকে এই ব্রত পালন করতে হয়।

শনিদেবের ব্রত : এই ব্রত বহুল প্রচলিত একটি ধর্মানুষ্ঠান। শনিবার সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে উঠানে এই ব্রত করতে হয়। এতে সত্যনারায়ণ ব্রতের মতো প্রসাদ দেওয়া হয়ে থাকে। সারাদিন উপবাস থাকার পর সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজা শেষে ব্রতকথা শুনে প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়।

জন্মাষ্টমীর ব্রত : ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির জন্মাষ্টমী ব্রত করতে হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করতে পারে। ব্রতের আগেরদিন নিরামিষ খেয়ে সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ব্রতের দিন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঠাকুর দিয়ে পূজা করিয়ে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে নিজে পারনা করবেন।

৭. মনসা পূজা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনসার প্রতিমা পূজা হয়না। মনসা পূজিত হন ফনীমনসা বৃক্ষের ডাল বা সাজ বৃক্ষের ডালে পূজিত হন। আবার অনেক জায়গায়ই দেখা যায় ঘটেও পূজা হয়। বর্ষাকাল সাপের প্রাদুর্ভাব বেশী থাকে বলে এই সময় মনসা পূজা হয়।

শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজা হয়। কুমিল্লা অঞ্চলে মনসা পূজা প্রতিমা ও ঘটে দু'ভাবেই হয়ে থাকে। চান্দিনা থানায় প্রতিমা পূজাও দেখা যায়। এরকম একটি পূজায় দেখা বিবরণ নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমীর আগের দিন রাত আটটার সময় মনসার অধিবাস করানো হয়। অধিবাসের সময় সকলে উলুধ্বনি ও জোকার দেয়। সেই রাতে কাজল, ঘৃত দ্বারা বেল পাতার বোটা দিয়ে দেবীর চক্ষু দান করে নিতে হয়। যেই পুরোহিত বা পূজারী চক্ষুদান করেন তিনি নিজ দীক্ষা বা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করে এই চক্ষুদান করার ফলেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় বলে হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করেন।

প্রতিমার আকার ও সহার : মনসা প্রতিমার চারহাত। চারহাতেই চারটি সাপ ধরা। এবং উপরের দু'হাতে দুটি শাঁখা দেয়া। মনসার একটি চোখ নষ্ট। তাই সেটিও সেভাবে দেয়া মনসার গলায় কানে, হাতে, গয়না রয়েছে। মনসার সহার জয়া ও বিজয়া। মনসার পায়ের কাছে দুটো নাগ ফণাতুলে বসে রয়েছে। মনসার বাহন হাঁস। তাই

হাঁসটি মনসার পায়ের কাছে বসা অবস্থায় রয়েছে। হাঁসের পাশেই বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের প্রতিমা। বেহুলার কোলে লক্ষ্মীন্দর মৃত অবস্থায়। আর বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ধরে রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মনসা পূজায় বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের উপাখ্যানটিও মর্যাদা পায়।

ভদ্রমণ্ডল : এটি মনসা প্রতিমা স্থাপনের পর এর গমনের যেই জায়গা বা যেখানে রাজঘট বসানো হবে সেখানে করা হয়। ভদ্রমণ্ডল পঞ্চরঙের দ্রব্য দিয়ে চতুর্ভূজ আকৃতি করে করা হয়। পঞ্চরঙের দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে হলুদ গুড়া, আতপ চালের গুড়ি, সিদুর, বেলপাতা পুড়িয়ে এর কাল রঙ ইত্যাদি এই ভদ্রমণ্ডলের উপর বসবে।

রাজঘট : রাজঘট অন্যঘটের চেয়ে আকৃতিতে বড় হয়। এটির উপরের অংশ রঙিন হয়। রাজঘটে প্রথমে পঞ্চ আমপাতায় সিদুরের তিনটি করে ফোটা দিয়ে তারপর ঘটের মুখে বসিয়ে দেবে। তার আগে রাজঘটটি জল দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এরপর বেলপাতা, দূর্বা ও ফুল এর উপর রাখতে হবে। তারপর রাজঘটের চারদিকে চারটি কাণ্ড বসাতে হয়। কাণ্ড হচ্ছে পাট কাঠির শলার উপরের অংশ ভেঙ্গে তার উপরের দিকটা মাঝখানে কেটে সেখানে আমপাতা ভাঁজ করে দিয়ে দেয়। কাণ্ডটি ঘট আচ্ছাদনে ব্যবহার করা হয়। তারপর রাজঘটের উপর পাঁচটি পান, পাঁচ টুকরা সুপারি রাজঘটের আমপাতার উপর রাখতে হবে। তারপর রাজঘট আচ্ছাদনের প্রথমে সুতাকে চারটি কাণ্ডকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনবার বেধে দিতে হবে। এরপর রাজঘটের উপরে একটি নারকেল সিঁদুরের পাঁচটি ফোটা পরিয়ে রাখতে হবে। তারপর রাজঘটটি গামছা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে। আচ্ছাদন করার সময় উলুধ্বনি দিতে হয়। তারপর রাজঘটের উপরে শাড়ি ও গামছা দিতে হয় দর্পন হিসেবে।

নৈবদ্য : নৈবদ্য হচ্ছে দেবী অর্পন করা ফলমূল। এগুলো পরিষ্কার করে ফেটে কলাপাতায় সাজিয়ে দিতে হয়। তবে এখন কলাগাছ কমে যাওয়ায় সবাই নিজ নিজ পাত্রে এনে সেই পাত্রের নিচে এক টুকরো কাগজ রেখে দেয়। ফলের নৈবদ্যে বর্ষাকালীন নানা ধরনের ফল সাজানো থাকে। এছাড়াও নারকেলের নাড়ু, সন্দেশও থাকে।

সংকল্প পাত্র : কলার ডোঙ্গারকে একটি সংকল্পের পাত্র করতে হয়। এই পাত্রে ফুল, গোলাপ জল, তুলসি পাতা, দূর্বা, হরিতকি, তিল, আতাপ চাল, মধু ঘি দিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। অন্য একটি পাত্রে আতপ দুধ, সাবান, সোনা রুপার জল, তুলসি পাতায় মিশিয়ে দিতে হবে। এই জলের পাত্রটির জল বেলপাতায় চুবিয়ে প্রত্যেকটি নৈবদ্যের পাত্রে এর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করতে হবে।

অষ্ট নাগের নৈবদ্য : মনসা পূজার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট নাগের পূজাও করা হয়। অষ্ট নাগ হচ্ছে বাসুকয়ে, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কর্কোটিকা, কুলীরা, শঙ্খ ও অনন্ত নাগ। তাই আটটি কলার ডোঙ্গায় চিনি, বাতাসা, ঘৃত, মধু, আপত দুধ, শবরী কলা দিয়ে তার উপরে আমপাতা ফুল দিয়ে ৮টি ডেঙ্গা সাজাতে হবে। যারা উপবাস থেকে পূজা করবে তারা এই ৮টি গোঙ্গা নিয়ে গিয়ে জলে নিয়ে অষ্টনাগকে দেবে।

আনুষাঙ্গিক : একটি শাপলা দিয়ে মালা তৈরি করে মনসার গলায় পরিয়ে দিতে হবে। প্রচলিত আছে, হিন্দু সমাজের মানুষরা মনসা পূজার আগে শাপলা খায় না। শাপলাদিতে মনসা পূজা দিয়ে, অষ্ট নাগকে পূজা দিয়ে তারপর খায়। কারণ হিসেবে তারা ব্যাখ্যা করে শাপলার গাছের নিচে অষ্টনাগ শাপলার কাণ্ড পেচিয়ে থাকে, মনসা পূজা শেষ হলে তারা শাপলা মুড়া থেকে চলে যায়। রাজঘটের উপরে আমপাতা, বট পাতা, অশ্বথ বটের পাতা, জিরা বট পাতা, কাঁঠাইল বট পাতা, আমপুঞ্চত, যজ্ঞ ডুমুরের পাতা একসঙ্গে সুতায় ফেটে রাজঘটের উপর দিতে হবে।

পূণ্য পাত্র : সাত, নয় বা এগারো প্রকারের তরকারি আর চাল দিতে হয় পূণ্য পাত্রে। এটি একজনের একবেলায় আহার হিসেবে দেয়া হয়। কমপক্ষে সোয়া সের দিতে হয়। এর নিচে দিলে পূণ্য পাত্র হয় না।

এরপর বিষহরি, পদ্মাবতী ও মনসা এই তিন নামে ধ্বনি দিতে হয। প্রকৃত অর্থে তিনটিই মনসার নাম।

ধ্বনিটি হচ্ছে,

জয় জয় মনসা মা প্রেমানন্দে,
হরি হরি বল মন বল হরি,
জয় জয় পদ্মাবতী,
জয় জয় বিষহরি,
জয় জয় মনসা।

এই ধ্বনি দেয় ছেলেরা। তখন মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়, আর বাদ্যযন্ত্রীরা ঢাক-ঢোল কাশা বাজায়।

এই সংকল্প মন্ত্রটি পড়ে যিনি পূজা করছেন তিনি কিছু পণ করেন। সংকল্প মন্ত্রের শুরুতে মন্ত্র পড়ে প্রথমে নিজের মাথায় জল ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর কপালে মাটির তিলক দিতে হবে।

তারপর পুরোহিত নিজে বসে পূজায়। এরপর মন্ত্র পড়ে সহস্র দ্বার নামে পাত্র (যে পাত্রে অনেক ছিদ্র থাকে) দিয়ে মনসাকে স্নান করাবে। স্নানের সময় সোনা-রুপার জল, ফুল, দূর্বা দিয়ে স্নান করাবে।

যজ্ঞ : মাটির চতুর্ভূজ এঁকে সলা, ডুমুরের পাতা, ডাল, বাল্ব, যজ্ঞের পণ্য পত্রের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর ঘি ঢেলে আগুন জ্বেলে মন্ত্র উচ্চারণ করে। তারপর একটা শবরী কলা ঘি মাখিয়ে আগুনের উপর দিতে হয়।

পুষ্পাঞ্জলি : তারপর ফুল বেল পাতা নিয়ে তার উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র পড়ে মনসা দেবীকে অর্পণ করতে হবে।

তারপর মনসা দেবীর ধ্যান করতে হবে।

এরপর অষ্টনাগের পূজা করতে হবে।

অষ্টনাগের পূজা : অষ্টনাগ হচ্ছে বাসুক, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কর্কোটিকা, কুলীরা, শঙ্খ, অনন্ত নাগ।

এই অষ্টনাগকে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করতে হয়। এরপর পূজা শেষে নদীতে অথবা পুকুরে, যারা উপবাস থাকবে তারা অষ্টনাগকে কলার ঢোঙ্গায় করে নৈবদ্য নেয়ে সাথে। সেখানে দুধ-কলা থাকে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস এতে করে অষ্টনাগ তাদের কোন অনিষ্ট করবে না।

বিসর্জন : এরপর দুদিন পরে দশমীতে মনসা দেবীকে বিসর্জন করে দেয়।

লোকখাদ্য

মাছে-ভাতে বাঙালি কথাটিতেই আমাদের খাদ্য-খাবারের ঐতিহ্যটি বোঝা যায়। এদেশের মানুষের গোলায় গোলায় ধান ছিল বলেই গলায় গলায় গান সৃষ্টি হয়েছে। মূলত খাবার বা লোকজ খাবারের প্রধান উপাদান ধান থেকে সৃষ্ট চাল। চাল থেকে নানা পদ্ধতিতে তৈরি নানা ধরনের খাবার আবিষ্কার করেছে মানুষ। তাছাড়া আশপাশের খাবার উপযোগী উদ্ভিদ বা তার ফুল ফল এবং প্রাণীর মধ্যে প্রধানত মাছকে কেন্দ্র করেই লোকজ খাবারের বলয়টি তৈরি হয়েছে।

১. কান্দির জাউ

এটি একটি লোকজ খাবার। বরুড়ায় একে কান্দির ঝাউ বা কাঁজির জাউ বলে। কাঁজি শব্দটি এসেছে কাঞ্জিক থেকে যার অর্থ আমানি বা সজল ভাত থেকে প্রস্তুত সিরকা। কাঁজি কাউকে দিতে নেই বলে সংস্কার আছে। তাই প্রবচন আছে,

কানজি চাইলে ঝাড়া মারিও
দুধ চাইলে হাইট্টা দিও।

প্রস্তুত প্রণালী : এটি খুবই সহজ প্রণালী। ভাত রান্নার সময় চালটি ভাতে রূপান্তরিত হওয়ার ঠিক পূর্বে কিছু পরিমাণ ভাত পানি অন্য একটি পাত্রে তুলে রাখতে হয়। এভাবে ৪/৫ দিন অল্প অল্প পরিমাণ জমাতে হয়। তারপর ৪/৫ দিনের জমানো ভাত-পানি শুধু জ্বাল দিয়ে ঝাউ বানিয়ে খাওয়া হয়। এটি খেতে টক স্বাদ লাগে। অনেকেই এটি খেতে পছন্দ করে। এই খাবারটিতে পচন ধরে এক ধরনের মাদকতা সৃষ্টি হয়। একে নিয়ে একটি প্রবাদও পাওয়া যায়-নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।

তৈরি হচ্ছে সুস্বাদু মোরব্বা

২. মোরব্বা

মোরব্বা করা হয় চালকুমড়া দিয়ে। তবে চাল-কুমড়াটি হতে হয় পরিপক্ক। প্রথমে চালকুমড়াটিকে প্রয়োজন মতো কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। এই টুকরোগুলোকে কাটা চামচ দিয়ে ছিদ্র করা হয়। তারপর এগুলোকে সিদ্ধ করতে হয়। তারপর এগুলোকে গামছায় ভরে কষে বেঁধে ১ দিন বা ১ রাত (অর্থাৎ ১২ ঘন্টা) ঝুলিয়ে রাখতে হয় যাতে সবটা পানি ঝরে যায়। তারপর শুধু দুধের মধ্যে এলাচ, দারুচিনি, জেপাতা, নারকেল, চিনি ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। কষানো হয়ে গেলে সুস্বাদু মোরব্বা তৈরি হয়ে যায়। এরপর আসে খাওয়া বা পরিবেশনের পালা।

৩. পিঠা-পুলি

শহরের মানুষের মতো গ্রাম বাংলার মানুষ নিয়ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাদের শৌখিনতার ক্ষেত্রে কোন হেরফের ঘটেনি। সারা বছর বাঙালির ঘরে পিঠা পুলির উৎসব চলছে, তো চলছে। চলুক না। ওগুলো তো আর বন্ধ করে দেয়া যায় না। দীর্ঘদিন যাবৎ তাই চলে আসছে। এখানে উৎপাদিত পিঠা, গোপালভোগ, ক্ষীর ভোগ, পাটি সাপটা, নকশী পিঠা, দুধপুলি, ডিমপুলি, নারকেলপুলি, ভাপা পিঠা ইত্যাদি। পূজা পার্বনে, ঈদে, বিয়েতে, মুসলমান ও হিন্দু সমাজে পিঠা তৈরির প্রচলন আছে। নতুন জামাই বাড়িতে আসা, বিবাহিতা মেয়ের বাড়িতে আসা, আত্মীয় স্বজনের আগমন ইত্যাদি উপলক্ষে পিঠা পায়েশ এর আয়োজন হয়।

৪. মাসকলায়ের আমিত্তি

মাসকলায়ের আমিত্তি একটি জনপ্রিয় খাবার এবং ভীষণ চাহিদা সম্পন্ন জাতীয় খাদ্য দ্রব্য। স্থানীয় ভাবে এ খাবারটি মাসের আমিত্তি নামে পরিচিত। মাসের আমিত্তি তৈরি করার জন্য প্রথমে যা করা হয় তা হলো মাসের বা মাসকলাইয়ের ডালগুলোকে ভাল ভাবে ধুয়ে নেওয়ার পর পরিষ্কার জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিজিয়ে রাখার ফলে ডাল থেকে কালো পাতলা চামড়া আলগা হয়ে আসে। ডালগুলোকে তারপর অত্যন্ত মিহি করে বাটা। বড় একটি কড়াইয়ে বাটা ডালের পেস্ট রেখে ভালভাবে ফোটাতে হয় ফলে ডাল অত্যন্ত মসৃন ও মিহি হয়। তারপর এর সাথে খাবার বার্লি সামান্য পরিমাণ মিশানো হয়। মেশানো হয়ে গেলে এই পেস্টটাকে আমিত্তি তৈরির কাপড়ের নাতনিতে ঢেলে, বড় কড়াইয়ে গরম তেলে জিলাপীর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খাস্তা আমিত্তি তৈরি করা হয়ে থাকে। তারপর এই খাস্তা আমিত্তিগুলোকে চিনির শিরায় ভালোভাবে ভেজানো হয়। ভেজানো আমিত্তিগুলোকে শিরা থেকে ছেকে তুলে এনে পরিবেশন করা হয়।

৫. ছানার আমিত্তি

দুধ থেকে তৈরি করা ছানাগুলোর সাথে পরিমাণ মতো ময়দা খাবার বার্লি মিশিয়ে ভালোভাবে ফেটে নিতে হয়। তারপর এই পেস্টকে জিলাপি বা আমিত্তি তৈরির নাতনিতে পেঁচিয়ে গরম তেলের উপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জিলাপির আকার দেয়া হয় এবং ভাজা হয়। গরম গরম খাস্তা আমিত্তি চিনির শিরায় ভেজানো হয় এবং কিছুক্ষণ পর এগুলোকে শিরা থেকে ছেকে তুলে ফেলা হয় এবং খাবার হিসেবে পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হয়।

৬. লেডি ক্যানি

লেডি ক্যানি মিষ্টির মূলত উদ্ভবঘটে ছিলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এই মিষ্টি উদ্ভবের পেছেনে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে ব্রিটিশ শাসনামলে লর্ড ক্যানিং এক সময় (আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রিঃ) তার স্ত্রী লেডি ক্যানিংসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বেড়াতে আসেন। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত মিষ্টির কারিগরেরা লেডি ক্যানিং-এর জন্য বিশেষ ধরনের রসগোল্লা প্রস্তুত করেন। লেডি ক্যানিং এই রসগোল্লা খেয়ে ভীষণ আনন্দিত হন এবং প্রচুর রসগোল্লা তিনি ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিষ্টির কারিগররা লেডি ক্যানিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই মিষ্টির নামকরণ করেন লেডি ক্যানি। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে লেডি ক্যানি বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়া তৈরি করা হয় না। কুমিল্লার রামচন্দ্রপুরে প্রায় সারা বছরই এই মিষ্টি পাওয়া যায় যা এ অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খাবার এবং একটি বিশেষ ঐতিহ্য।

প্রস্তুত প্রণালী : দুধ থেকে প্রস্তুত ছানাগুলোকে শুকিয়ে মাওয়া প্রস্তুত করা হয়। তারপর মাওয়া শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তারপর মাওয়াগুলোকে চালুনিতে নিয়ে গুড়া করা হয়। গুড়া মাওয়ার সাথে পুনরায় ছানা মেশানো হয় এবং সামান্য ময়দা মিশিয়ে মিষ্টির আকৃতি দিয়ে লেডি ক্যানি তৈরি করা হয়।

৭. সিদল শুঁটকি

শুঁটকি মাছে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ। তাই সচেতন মানুষেরা শুঁটকি খেয়ে থাকে স্বাদ ও পুষ্টি লাভের জন্য। লাকসাম মনোহরগঞ্জসহ কুমিল্লার অন্যান্য উপজেলায় যেখানে মৌসুমে বেশি মাছ ধরা পড়ে সেখানে স্থানীয়ভাবে শুঁটকি করা হয়।

সিঁদল শুঁটকি করা হয় পুটি মাছ দিয়ে। (সরপুটি নয়, দেশি পুটি মাছ)। প্রথমে মাছগুলো ভালোভাবে ধুয়ে তিন চার দিন শুকাতে হয়। মাছের নাড়ি ভুড়ি ভেতরেই থাকে বের করা হয় না। তারপর পৌষ মাঘ মাসে রাতে ঘরের চালে দুই তিন দিন রেখে দিতে হয় শিশিরে ভেজানোর জন্য। পরে মাছগুলো প্লাস্টিকের থলিতে ভরে জাগ দেওয়া হয়। তা মাটির কলসি বা মটকাতে রাখা হয়। এমনভাবে রাখা হয় যেন মটকায় ফাঁক না থাকে। মটকার মুখ পলিথিন দিয়ে ঢেকে মজবুত করে বাঁধা হয়। তারপর ঘরের মেঝে বা উঠানে গর্ত করে মটকা উপুড় করে রেখে দেওয়া হয়। দুই তিন মাস পর এই মটকা উঠালে শুঁটকিগুলোর যে রূপ পাওয়া যায় তাই সিঁদল শুটকি। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, সরিষার তেল দিয়ে এ মাছ ভেজে ভর্তা খাওয়া হয়। এতে একটি তীব্রগন্ধ থাকে।

৮. ভর্তা

ভর্তা ভগবান/ভর্তা খাইলে অপমান
ভর্তা খাইলে পেট জ্বলে
ভর্তার বিচার কে করে।

ভর্তার নাম নিলেই প্রথমে আসে আলু ভর্তার কথা। কারণ গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণ প্রায়ই এ ভর্তা খেয়ে থাকে। গোল আলু সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে তাতে সরিষার তেল, কাঁচা পেয়াজ ও কাঁচামরিচ মিশিয়ে খেলে একটি ভিন্ন স্বাদ তৈরি হয়। তাছাড়া

গাছ বেগুন পুড়িয়ে মরিচ, পেঁয়াজ, তেল সহযোগে তৈরি ভর্তাও স্বাদে অতুলনীয়। এ ছাড়া শিমের ভর্তা, পটল ভর্তাসহ ভর্তার রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। টাকিমাছ আগুনের তাওয়ায় রেখে পুড়িয়ে তার কাঁটাটা ফেলে দিয়ে যে ভর্তা তৈরি করা হয় তা অত্যন্ত সুস্বাদু। তাছাড়া চিংড়ি মাছের ভর্তাও স্বাদে অতুলনীয়।

৯. নানা রকমের পিঠা পুলি

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বিভিন্ন নামের বিভিন্ন প্রকারের নকশী পিঠা ও অন্যান্য পিঠা পুলি খাওয়ার রেওয়াজ আছে। নিম্নে কিছু পিঠা তৈরির পদ্ধতি বর্ণিত হলো–

ম্যারা পিঠা সাইন্যা পিঠা : চালের আটা সেনে নিয়ে তৈরি হয় বলে একে সাইন্যা পিঠাও বলে। আটা সেনে গোল মণ্ড তৈরি করা হয়। চাইলে এতে গুড়ও মিশ্রিত করা যায়। এই মণ্ড হাতের তালু ও কাঠের পিড়ার সাহায্যে ঘুরিয়ে বিশেষ কায়দায় দুইপাশ বর্ধিত করা হয়। এগুলো মাটির পাতিলের ঢাকনা ছিদ্র করে তার উপর রেখে ভাপ দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। তারপর খাওয়া হয়। এই ম্যারা পিঠা নিয়ে ছড়াও প্রচলিত আছে,

ম্যারা পিঠা শীতকালে / মা বানাই দিছে
দুলাভাই আংগো (আমাদের) বাড়ি / আপুর লাই আইছে
গেরামগঞ্জে ম্যারা পিঠা / বাড়ি বাড়ি যায়
তালত বইনে পিরাত বই (বসে) /মজা করি খায়।

ভাপা পিঠা : শীতকালের জনপ্রিয় পিঠা। চালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয়। কিছু মোটা আটা অল্প ভেজা অবস্থায় টুকরো কাপড়ে ছোট বাটির কানা বরাবর নিয়ে চুলার ওপর রাখা খোলায় রেখে সেঁকে নিলে ভাঁপা পিঠা তৈরি হয়।

খোলাপিঠা বা চিতোই পিঠা : এই পিঠা তৈরির পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। গোলানো চালের গুঁড়ির সাথে সামান্য লবণ মিশিয়ে তাওয়ায় সেঁকে এই পিঠা তৈরি করা হয়। খেজুরের রসে চুবিয়ে খেতে ভাল লাগে।

নকশি পিঠা বা ফুল পিঠা : নকশি পিঠা বাঙালির শিল্পীমনের উজ্জ্বল উদাহরণ। গ্রামের গৃহবধুরা তার মনের মতো নকশা তৈরি করেছে এসব পিঠায়।

উপকরণ : এক কেজি আতপ চাল, গুড় বা চিনি (প্রয়োজনমত) খেজুর কাঁটা।

পদ্ধতি : আতপ চালের কাই বা মণ্ড প্রস্তুত করে এমন ভাবে বেলতে হয় যাতে পুরুত্ব বজায় থাকে। তারপর এ পিঠায় সুই বা খেজুর কাঁটা দিয়ে বিভিন্ন নকশা কাটা হয়। নকশার বাইরের অংশ সুই বা কাঁটা দিয়ে টেনে তুলে দিতে হয়। তারপর ডুবো তেলে কড়া করে ভেজে নিতে হয়।

১০. রসমালাই ও স্পঞ্জ

কুমিল্লার যে বিশেষ খাবারটি সারা বাংলাদেশে কুমিল্লাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে তা হল রসমালাই। এটি মূলত এক সময় মাতৃভাণ্ডারের রসমালাইকেই বুঝাত। শতাব্দী প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী বাবু শংকর প্রসাদ সেন। কথা হয় তাঁর সাথে।

সংগ্রাহক : কত বছর বয়স হল মাতৃভাণ্ডারের?

শংকর প্রসাদ : প্রায় শত বছর।

প্রতিদিন কী পরিমাণ রসমালাই আপনারা বানান?

শংকর প্রসাদ : প্রায় ১০/১৫ মণ দুধের।
সংগ্রাহক : রসমালাইয়ের মূল উপাদান দুধ। তা আপনারা কীভাবে রসে পরিণত করেন?
শংকর প্রসাদ : এটা একান্ত নিজস্ব ফর্মুলা। হালকা চিনি লাগে কিন্তু এটা মুখ্য উপাদান নয়।
সংগ্রাহক : রসমালাইতো অনেকে উৎপাদন করে। আপনাদেরটাই সবাই নিতে চায় কেন।
শংকর প্রসাদ : এটা হয়তো ঐতিহ্যগত কারণে। মাতৃভাণ্ডারের প্রতিই মানুষের দুর্বলতা।
সংগ্রাহক : আলেখারচর, ময়নামতি, বিরতি, কাবিলাতে প্রচুর রসমালাইয়ের দোকান গড়ে উঠেছে। এদের সম্পর্কে কিছু বলবেন না।
শংকর প্রসাদ : কারো সম্পর্কেই আমার কিছু বলার নেই। সবাই মাতৃভাণ্ডার বা কুমিল্লার আদি ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করছে। সব জায়গায় এটা হয়। আপনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান সেখানকার ছানামুখি, চমচম, লেডিকেনি বিখ্যাত। সেখানেও এরূপ অজস্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ঢাকার আদি মরণ চাঁদ এখনো পৃথিবী বিখ্যাত। কে যে মরণ চাঁদ তা তো কাস্টমার জানে না।
সংগ্রাহক : আপনার তাতে খারাপ লাগে না?
শংকর প্রসাদ : খারাপ লাগার কিছু নাই। সবাই করে খাচ্ছে। আমার তাতে ব্যবসার ক্ষতি হয়নি, বরং সুনাম বেড়েছে। মানুষ জেনে গেছে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠা মাতৃভাণ্ডারগুলো প্রকৃত মাতৃভাণ্ডার নয়।
সংগ্রাহক : আপনি কী আমাকে বিশেষ কিছু বলবেন?
শংকর প্রসাদ : এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ যে প্রকৃত মাতৃভাণ্ডারেই রসমালাই সম্পর্কে জানতে এসেছেন।
সংগ্রাহক : আমি চাইছিলাম এর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন।
শংকর প্রসাদ : স্যরি, এটা সম্ভব নয়। এর উপাদানগুলোর নাম বলছি। এটাই যথেষ্ট। ব্যবসার প্রয়োজনে আমাদের অনেক কিছুই গোপন রাখতে হয়।
সংগ্রাহক : এখানকার বিখ্যাত কোন মিষ্টির নাম কি বলবেন যা এখানকার মানুষ ব্যবহার করে?
শংকর প্রসাদ : নিশ্চয়ই। জলযোগের স্পঞ্জ সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত। আমরাও স্পঞ্জ বানাই কিন্তু তা জলযোগের মত হয় না। এছাড়া আছে ছানামুখি, লালমোহন, মালাইকারী, চমচম, ক্ষীরভোগ ইত্যাদি।
এরপর মুখোমুখি হলাম দুলাল দার। আমাদের প্রিয় মানুষ।
ঝাউতলা, কুমিল্লা।
সংগ্রাহক : দাদা, নমস্কার
দুলাল : নমস্কার
সংগ্রাহক : আমি আপনার একটু সময় কী নষ্ট করতে পারি?
দুলাল : বলুন।

সংগ্রাহক : বাংলা একাডেমির প্রয়োজনে আপনি কি স্পঞ্জ সম্পর্কে কিছু বলবেন?
দুলাল : কি জানতে চান বলুন।

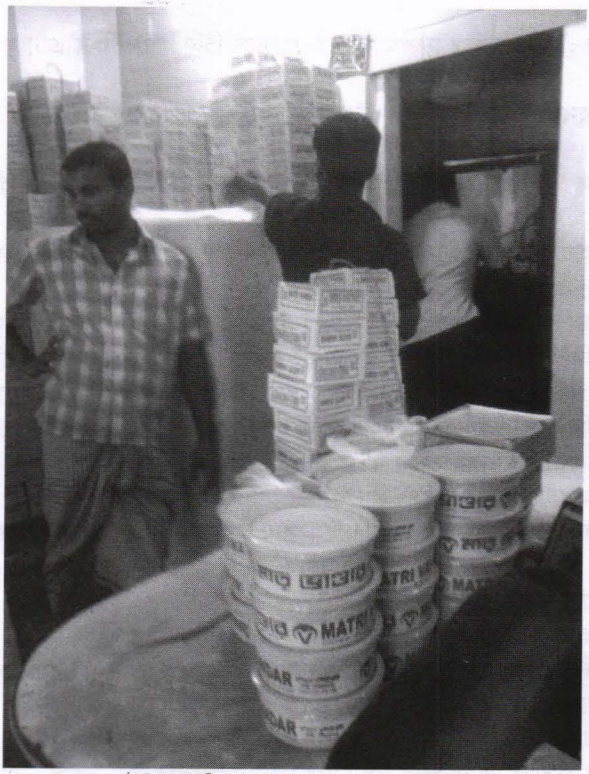

ঐতিহ্যবাহী মাতৃভাণ্ডারের ভেতরের চিত্র

সংগ্রাহক : স্পঞ্জ তৈরির মূল উপাদান কী?
দুলাল : দুধ। যে দুধে ছানা হয় তাই স্পঞ্জের মূল উপাদান। এর সাথে লাগে চিনি, যৎসামান্য ময়দা।
সংগ্রাহক : উপাদানগুলো তো সবাই ব্যবহার করে কিন্তু আপনাদের মত হয়না কেন? এটা হয়তো কারিগরের বাহাদুরী। গোপন কোন ফর্মুলা আছে?
দুলাল : আরে না। এটা নির্ভর করে ছানাটা কী উপায়ে বানানো হল এর উপর। কেউ হয়তো বেশি লাভের আশায় ছানায় ময়দার পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয়। আমিত্তি তো সবাই বানায়, সবার কী এক রকম হয়? তেমনি পেড়া, ছানার সন্দেশ, সবকিছুর ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। দুলালদা, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বিদায় নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে স্পঞ্জ না খাইয়ে ছাড়বেন না। অগত্যা আর কী করা। জলযোগের স্পঞ্জ খেয়ে দুলালদাকে নমস্কার দিয়ে বিদায় হলাম।

তথ্যসূত্র : সন্তোষ পাল

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

লোকনাট্য সাধারণত খোলা মাঠ বা মুক্তমঞ্চ অথবা চাষের জমিতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। গান, নাচ ও সংলাপ এই তিনটি বিষয়েরই প্রাধান্য থাকে লোকনাট্যে। সাধারণত বিধিবদ্ধ লোকনাট্যের কোন পূর্ণাঙ্গ উপাদান কুমিল্লাতে পাওয়া যায় নাই আমরা এ অংশে বদরজানের পালা ও কয়েকটি খণ্ডিত লোকনাট্য উপাদান উপস্থাপন করছি,

ক. লোকনাট্য

সংগ্রহ সূত্র ও রচয়িতা পরিচিতি : পালাটির রচয়িতা আব্দুল আউয়াল ডাক্তার। তিনি এলোপ্যাথিক পল্লী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যখন পালাটি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ষাটের কোঠায়। সাধারণ পল্লী চিকিৎসক হলেও তাঁর কবি প্রতিভা ছিল। তাঁর ধীশক্তি ও কবি প্রতিভার সম্পর্কে আবুল কাশেম সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি পুঁথি পাঠ করতেন। গাজী-কালু-চম্পাবতীর পুঁথি, সোনাভান, লালমতি, সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান, গফুর বাদশা বানেছা পরী, শহিদ কারবালা, জঙ্গনামা, ইত্যাদি পুঁথি তিনি পড়তেন বলে আবুল কাশেম সাহেব নিশ্চিত করেন। ঘটনার কিছু পরেই তিনি পালাটি রচনা করে কবি প্রতিভার পরিচয় দেন।

১. বদরজানের পালা

[রচয়িতা ও গীতিকার : আব্দুল আউয়াল ডাক্তার]

কাহিনি সংক্ষেপ : মাউই-পুত্রার পরকীয়া প্রেমের অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে এই গীতিকাটি রচিত হয়। বাংলা ১৩৪৯ সালের চৈত্র মাসের হৃদয়বিদারক ঘটনার ফসল এটি। দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩) এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায়' যে বিয়োগ-ব্যথা ঝংকৃত হতে দেখি এখানেও তা আছে খানিকটা ভিন্ন পদ্ধতিতে। এই পালায় 'মহুয়া', 'মদিনা' বা জয়চন্দ্রের' মতো মনের মানুষকে না পেয়ে নিজেকে শেষ করার প্রক্রিয়া নেই, তবে এখানেও মৃত্যু সংগঠনের ঘটনা আছে। বদরজান তার প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রেম কামের পথকে মসৃণ ও নিরাপদ করার জন্য স্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। স্থানীয়বাজার থেকে 'ডগরা বিষ' (আফিম) এনে পানের সাথে খাইয়ে স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত করে। আজকের দিনে এ জাতীয় প্রেম ও বহুবিধ মৃত্যুর ঘটনা স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে। কেননা এসব এখন অহরহ ঘটছে। কিন্তু ঐ সময় এ ঘটনা জনমনে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং মানুষ বিস্ময়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। লোকমুখে এ ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম-উপজেলা-শহরে। এ ঘটনা নিয়ে দ্রুত পালা রচিত হয়ে যায় এবং তা নানা গ্রামে নানা উপজেলায় মঞ্চায়িত হতে থাকে।

বদরজান বা বদরের নেছার বিয়ে হয় মহেশপুর গ্রামের হাসন আলী চৌধুরীর সাথে। তাদের বিয়ের প্রায় বিশ/পঁচিশ বছর পর এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে

তাদের এক কন্যা আতরজান এবং এক পুত্র সিদ্দিক জন্ম নেয়। আতরজানের বয়স তখন ১৬/১৭ বছর এবং ছেলে সিদ্দিকের বয়স দুই আড়াই বছর। মেয়ে আতরজানকে একই গ্রামে বিয়ে দেয়া হয় রোশন আলীর সঙ্গে। রোশন আলীর ভাই, আতরজানের ভাসুর এবং বদরজানের পুত্রা কালা মিয়ার সঙ্গেই বদরজানের অবৈধ প্রেম গড়ে ওঠে। তথ্যদাতা কাশেম মাস্টার নিশ্চিত করেন যে কালা মিয়ার গায়ের রঙ ছিল অত্যন্ত কালো। তবে বদরজান ছিল ফর্সা ও বেশ সুন্দরী। কালা মিয়ার কাম-বাসনা আমাদেরকে পৌরাণিক কৃষ্ণ-কালার কথাই মনে করিয়ে দেয় যিনি ষোলশত গোপিনীকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। আর বদরজানও কি হয়ে উঠেছিলেন বিরহিনী রাধা? যে রাধা স্বামী অইহন ঘোষের নপুংশকতার জন্য গোপন অভিসারিকা হয়ে উঠেছিলেন।

জানা যায় বদরজান ও তার স্বামী হাসন আলী চৌধুরীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল। তখন হাসন আলী চৌধুরীর বয়স ছিল ষাটের কাছাকাছি আর বদরজানের বয়স ছিল চল্লিশের কোঠায়। ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, চৌধুরীর যৌবন ছিল তখন ভাটার দিকে, কিন্তু বদরের তখনো যৌবন-জ্বালা ছিল। মেয়ে আতরজানের বিয়ের বছর খানেক পর এ ঘটনা ঘটে। মূলত মেয়ের অনুপস্থিতিই তাদের নিকটে আসার পরিবেশ রচনা করে। এক সময় ভাবে হাসন আলীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে তাদের মিলনের পথ পুরোপুরি অবাধ হবে। এই অবৈধ প্রেমের বিষে নির্দোষ হাসন আলী চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পর ঘটনা ও মৃত্যুরহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। থানায় মামলা হয়। পুলিশ প্রয়োজনে ঘটনার এগার দিন পর কবর থেকে লাশ তোলা হয়। আসামী ফরিয়াদি-পুলিশের গ্রাম থানা-কোর্টে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। বছরখানেক মামলা চলে। বদরজান ও তার প্রেমিক কালামিয়া জেল খাটেন। পরে মামলা উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনার পর কালামিয়া লোকের নিকট 'চ্যাংভা কালা' হিসেবে অভিহিত হন। আর মজার ব্যাপার হলো মামলা নিষ্পত্তির পরপরই বদরজান একই গ্রামে 'ইছা পাগলা' নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। ইছা পাগলার ঔরসে বদরের গর্ভে দুজন মেয়েও জন্মলাভ করে। কালামিয়া ও বদরজান দুজনেই আজ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু অবৈধ প্রেমের আঞ্চলিক ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট জনপদে আজও তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিবাহের দুই-আড়াই দশক পরের পরকীয়া প্রেমের পরিণতির পালা বলে স্বাভাবিক কারণেই এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য হয়ে ওঠেনি। এর কাহিনিও অত্যন্ত সরল। তবু এটি ঐ সময়ে অভাবিত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আবার এই কাহিনি নিয়ে সাধারণ মানুষ ও নানা ছড়া ও পঙক্তি রচনা করেছে। মোটকথা তারা হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষের নায়ক ও প্রতিনায়ক। আবুল কাশেম মাস্টার গৃতিকাটির যতটুকু বলেছেন তাতে কাহিনির মোটামুটি একটি রূপ পাওয় যায়। এতে তাদের প্রণয়াংশের খানিক পরিচয় রয়েছে, অধিকাংশ ঘটনা মামলা-মোকদ্দমা, লাশ ও লাশের ময়নাতদন্ত বিষয়ক। তবে পিতা হারানো সন্তানদের বিয়োগ ব্যথার বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে।

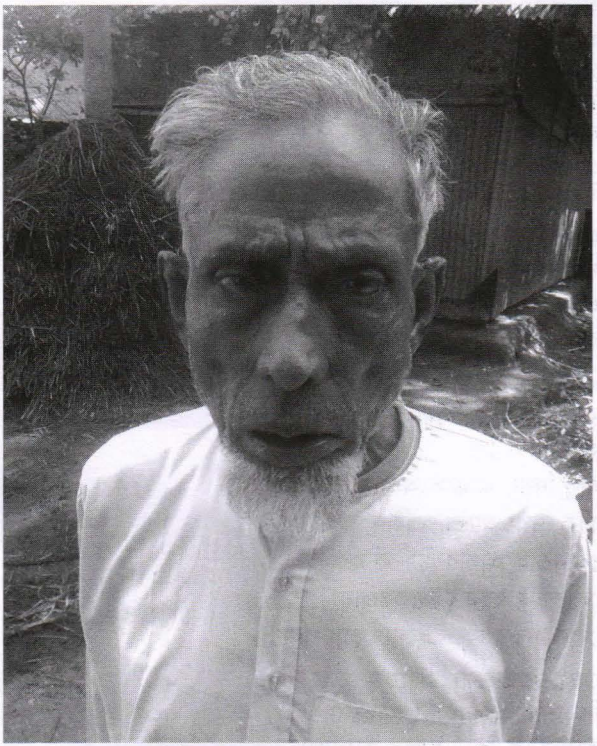

জনাব আবুল কাশেম মাস্টার (বদরজানো পালা সরবরাহকারী একমাত্র ব্যক্তি)

বদরজানের পালা

১. ১৩৪৯ সনের চৈত্র মাসে
মহেশপুর হয় ঘটনা
স্বামী মারে বিষ কাওয়াইয়া
একি বীষম যন্ত্রণা।

২. বদরজানের ঘরের পিছে
নীল মরিচের গাছ
বদরজানের হাতের মধ্যে
বার লাইঙ্গার কাচ।

৩. বদরজানে ভাত রান্ধে
দাড়াদুড়া দিয়া
চ্যাংড়া কালা চাইয়া রইছে
হুরকি বেড়া দিয়া।

৪. বদরজান বলছে
ভাত না বসাইতে সখী
চালনও না রান্ধি
দিবানিশি বইসা বইসা
কানার লাইগা কান্দি।
ও নাগর ছাইড়া গ্যালা
দিয়া বীষম জ্বালা।

৫. আগের বাটায় সুয়া চন্দন
পাছের বাটায় তেল
হালতে-দুলতে বদরজানে
কালার কাছে গ্যাল
হে নাগর--।

৬. মৃত্যুর আগে চৌধুরী বলছে–
ওহো সখী গো
মালু দিয়া, আক্কাস আলী
ডাক দিয়া আনো আজিদ আলী গো
কোনডাই আমার ছিদ্দিক রকমান
কোনডাই আমার আতরজান
খোদার ভয় কি নাইগো তোর পরাণ।

৭. মেয়ে আতরজান বলছে–
কি শোনাইলেন বুড়া দাদিগো
আমায় কি শোনাইলেন কানেগো
ওহো দুঃখে মরিগো
উরুয়া পরড়শীল ছ্যাল ওগো দাদি
আইনাছো পরাণে গো
দাদি দুঃখে মরিগো।

৮. আবার ম্যালের খবর পাইয়া
আজিদ এজাহার করতে যায় থানায়
স্বামী মারে বিষ খাওয়াইয়া
স্ত্রী বদরেরনেছায়।

৯. দারোগা বাবু জিজ্ঞেস করে
আতরজানকে ডাকিয়া
সত্য কইরা বল মাগো
আমার সামনে আসিয়া।

১০. এসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার বাবু
মেথর একজন সঙ্গে লয়

সিঙ্গার পাড়ের কবরের ও
কাছে আইয়া বয়।

১১. আপতোর আলী, আজিজ মিয়া
কবর খুলে দুজনা
স্বামী মারে বিষ খাওয়াইয়া
একি বীষম যন্ত্রণা।

১২. কইলজা গুদ্দা হেষা আরো
ডাক্তার কইরা নেয় সঙ্গে
কলিকাতা পাঠাইয়া দেয়
পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে।

১৩. ইংরেজ সাহেব পরীক্ষা করেন
ইংলিশ এক যন্ত্রের দ্বারা
পরীক্ষাতে পাওয়া গেল
বিষেরও মরা।

১৪. পরীক্ষাতে পাওয়া গেছে
তিন রতি বিষ খাওয়াইছে
আমার ভাসুর কালা মিয়ায়
বিষ আইন্যা দিছে।

১৫. বদর জান বলছে–
লিলুয়া বাতাসেরে আমার
দুলে গলার মালা
কালার সনে কইরা পিরীতরে
আমার ঘটলো ভীষণ জ্বালারে
দুঃখ সহে না পরাণে।

১৬. কাহিনির ফ্ল্যাশব্যাক/চৌধুরী বলছে–
তোমার যখন অসুখ ছিল
কত কষ্ট পাইয়াছি
দিবারাত্রি ঔষধ আইন্যা
বিধি তোমারে খাওয়াইছি।

১৭. আতরজান–
মরিয়া না গ্যাছে বাবায়
কারও পানে চাইবো
ভাইয়ে বইনে কাতার হইয়া
মোরা পরাণ ও জুড়াইবো।
খোদার কাছে দোয়া করি
হাত যে উঠাইয়া

জিলায় জিলায় ফিরাক তাদের
হস্তে রশি দিয়া।

১৮. বার মাসের বার ফল
খোদায় ও দিয়াছে
চৌধুরী মিয়ার গাছে দুটি
মিষ্টি কাঁঠাল পাইকাছে
চৌধুরী কই রইলারে।

তথ্যসূত্র : আবুল কাশেম মাস্টার, পিতা : মৃত আলী মিয়া, (প্রধান অবরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক), বয়স ৮০, গ্রাম : মহেশপুর, বরুড়া, কুমিল্লা

এছাড়াও কুমিল্লা অঞ্চলে লোকনাট্যর যেসকল উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ–

২. কৃষ্ণলীলা

কৃষ্ণ : আমি বলি কমলিনী গো। সৎসঙ্গ নিয়ে গোপীগন। চলগো আমারি সনে যাব নিধুবন। আমরা নিধুবনে রাধারী সনে করবো রসের আলাপন।

শ্রীমতি : আমি বলি ছি ছি কালা জয়বলা। তোমার সনে, তুমি তো নিষ্ঠুর বল
শ্যাম কালা হরে।
তুমি করলে আনে ঘরের বাহির শেষে ফিরে চাও না।

কৃষ্ণ : আমি বলি কমলিনি গো শুন ওগো রসময়ি
কেন গো নিষ্ঠুর বল আমি নিষ্ঠুর নই। তোমরা
আমার সনে চল খেলব কত রস সই।

শ্রীমতি : আমি বলি বারে বারে বল তুমি কি কারণ
যাবনা তোমারি সনে মদন মোহন।
আমরা মাইয়ায় মাইয়া মিলেমিলে করবো
কত আলাপন।

কৃষ্ণ : আমি বলি কমলিনী গো মাইয়ায় মাইয়ায়
যোগ হইলে রস মিলে না রস
মরি পুরুষ না হইলে।
ওগো পুরুষ মাইয়ায় মিল হইলে
কথায় কথায় রস মিলে

শ্রীমতি : আমি বলি ঠাকুর কৃষ্ণ লোন ওরে ত্রিভঙ্গ
প্রেম রসেরা ভাণ্ডে আছে -ই অঙ্গ
আমরা মাইয়ায় মাইয়ায় যোগ হইলে
করব কতো রসরঙ্গ।

অন্তরা : আমি বলি প্রেমের ভাণ্ড মাইয়ায় কাছে রইয়াছে।
ভাণ্ড খুলিবার চাবি পুরুষের কাছে।
পুরুষ বিনে ভাণ্ড খোলবার মাইয়ায় কি মইদ্যে আছে। ঐ

৩. বস্ত্রহরণ

পণ কিরয়ে থেলে পাশা দুর্যধন আর যুদিষ্ঠির।
চুতুর দিকে সভা করে বসিলেন বীর।
তাদের রাজ্যে গেল ভাজ্য গেল আর
লজ্জা ডোবদীর। ঐ
দ্রোপদী হয় রজ জ্বালায় তাতে ছিল এক বসন।
দুঃশাসন করে সতীর কেশ আবর্তন।
আমি তোমায় উলঙ্গ করবো জুড়াব মনের বেদন। ঐ
দ্রোপদী কয় সকাতরে ছোট ভাইরে দুঃশাসন।
সর্ম্পকেতে বড় হয়ে ধরি তোর চরণ।
ওরে তুই কি জানিস মনা ভাইয়ে
সতী নারীর কি বেদন।
দুঃশাসন কয় দ্রোপদী গো লজ্জা কর কী কারণ।
উরুতে বসায়ে তোমারে জুড়াব জীবন।
তুমি পঞ্চ স্বামীর ঘর করিয়ে সতী রহিলেন কী কারণ।

দ্রোপদী : চতুর্দিকে সভা করে বসিলেন শ্বশুর ভাসুর সকলেই কী দুঃশাসনরে তুর মতই নিষ্ঠুর আমি পঞ্চ স্বামীর ঘর করিয়ে আপন বুদ্ধি নাই গো মোর। ঐ

ভীম : আমি বলি ঠাকুর দাদা, আরতো প্রাণে সহেনা। পতির কাছে সতীর কেন এতো লাঞ্চনা। দাদা তুমি থাক ধর্ম নিয়ে/আমি ফুরাই বাসনা। ঐ

দ্রোপদী : দ্রোপদী বস্ত্র ধরে দুঃশাসনে মারে টান।

খসে পরে বুকের বসন
বাঁচেনা আর মান
তখন দ্রোপদীরে দুই হাত তুলে
কোথায় আছে ভগবান।

দুঃশাসন : আমি বলি দ্রোপদী গো বলে বেগন খসে না। তুমি কি জাদু জানা বুঝতে পারি না।

অন্তরা : যতই টানে এতই বারে রাখিতে দ্রোপদীর মান সহজেই যোগলে না বসন সহন ভগবান।

ঐ দিন মনমোহন করে জঞ্জির বলে/ভক্তদের হইয়াছে মান।

৪. সীতার অন্বেষণ

হনুমান-অশোক বনে হনুমানে, রাম বলে করে রোদন। শুনে সীতায় সীতা নিষেধ করে জনক জীবন। রাম বল না

কোকিল পাখি, অকালে হবে মরণ।

হনুমান : কোকিল পাখি নইগো আমি, বীর হনুমান আমরণ সীতার সন্ধানে, মাগো পাঠাইয়াছে রাম। কত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে অশোক বনে আসিলাম। ঐ

সীতা : সত্য করে বলরে হনু, ওরে প্রবল নন্দন
কী আকৃতি রাম রুপ, ঠাকুর লক্ষণ।
কেমন সুখে আছেন প্রভু, সত্য করে বল এখন দূর্বাদল।

অন্তরা : দূর্বাদল রাম রুপ লক্ষণ গৌর বরণ হয়।
পঞ্চ কুটির বনের মাঝে নিরাপদ আশ্রয়।
ঐদিন নগরবাসী বলে সত্য দিলায় পরিচয়।

৫. দাতাকর্ম

মাস্টার : সূর্য্যের নন্দন দাতা কর্ণ, হস্তিনাতে করে বাস। ভারতে প্রকাশ করে কাশি রাম দাস। একদিন ব্রাহ্মণরূপে জনরে ধনে, এসে করে মহাগ্রাস। ঐ ঘরেতে প্রকাশ করে---ব্রাহ্মণ রুপে জনার্ধনে হস্তিনাতে আসিল। ছলনা করিয়া কিছু খাবার চাহিল। তখন গৃহে যেয়ে কর্ণরাজ খাবার কিছু আনিল।

শুনি : আমি যাহা ভোজন করি, রাজা তোমার জানা নাই। কচি মাংস এনে রাজা আমায় দিতে চায়। আমি অন্য কারো মাংস চাইনা বিশ্বকেতুর মাংস চাই। ঐ

বিশ্বকেতু : বিশ্বকেতু বলে বাবা ভ্রান্ত হলে কী কারণ তোমার গৃহেতে দেখি স্বয়ং নারায়ণ। তুমি আমার মাংস পাক করিয়া ঠাকুরকে করাও ভোজন।

মাস্টার : স্বামী স্ত্রী করাত ধরে ছেদন করে পুত্রধন। বিরস দেখিলে বদন না করব ভোজন। তুমি না পারিলে বল রাজা করিব অন্যত্র গমন। স্বামী স্ত্রী করতো ধরে ছেদন করল পুত্রধন। মমতা করিয়া মাথা চুপে রেখেছে এখন। সর্ব মাংস পাক কিরয়া মুনির সামনে আনিল। তখন মাথা নাই দেখিয়া ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইল। ক্রোধান্বিত হইয়া মুনি, উঠে যখন দাড়ায়। হেন কালে করজোড়ে রাজায় বলিল তখন মাথা দিয়া টক রাধিয়া মুনির সামনে আনিল।

মাস্টার : খেতে বসে শুনি ঠাকুর বিশ্বকেতু ডাকিল, খেলা হইতে বিশ্বকেতু অমনি আসিল। তখন কর্ণমুনি, বিশ্বকেতু তিনজনে ভোজন করিল।

অন্তরা : মাস্টার--শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্ম, গোলকের এ শ্রীনাথ। পদ্মাবতীর মিল হলু পেল অকস্মাৎ। ঐ দিন যুগেন্দ্রে কয় ভক্তির বলে ভক্তিতে হয় অধিষ্ঠান, পদ্মাবতীর মিলন হল পেল অকশর্তি।

৬. শিবলীলা

শিব একদিন ভাঙ খেয়ে ভাঙ্গেরা শিবে গিয়াছে বিল্লতলে গৌরিকে কোলে নিয়ে বসলেন সিতলে। তখন ভাঙের রসে মুচকি হেসে হাত দিয়ে গলা ধরে।

নারদ : এমন সময় নারদ এসে প্রণাম করে শ্রীচরণ বলে সৌভাগ্য আজি যোগল রুপ দর্শন। ওরে দুই রূপসী মধ্যে মামা মনটা বুজে কার কেমন।

শিব : আমি বলি গিরি পুরে দুইজন আমার এক সমান। আমার মাইয়া মেওয়ার মতন ধরতে খুব নরম। ওরে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা বাতাস শীত কালে পায় সরম।

নারদ : আমি বলি দুইজন মাঝি রাখ চকি সমতলে। একজন থাকে মাথার উপর আর একজন কুলে। আবার সন্ধ্যার পরে ছোট মামি সান্নিক ছাড়া গাল ফুলে।

শিব : আমি বলি আমার মতন। দুই রূপসী যার ঘরে জোয়ার ভাটা বেদয়ের বুশি বুজেনা থরে আমার ভাঙের নেশা জমাট করতে কুলে রস করে।

অন্তরা : নারদ বলে কুলে নিতে হইত যদি রস উদয় দুই সতিনের ঝগড়া কেন ভূমিকম্প হয়। অধম শংকর বলে শোনরে নারদ ঘরের কথা পরে কয়।

৭. রাধার মান

কৃষ্ণ : একদিন কৃষ্ণ এসে বলে, শোন বৃন্দে, মান কইরাছে আমার রাই। কেমনেতে রাধার কাছে এখন আমি যাই।

রাধে মান করিয়া বসে আছে। আসে না গো আমার চাই। ঐ

কেমনেতে রাধার কাছে যাই।

বৃন্দে : আমি বলি শোন কালা, দিও না আর জ্বালাতন। যে জন তোমার ভালরে বাসে জুড়াও তার জীবন। চন্দ্রা হল নতুন শাড়ি, পুলনের নাই আশা।

কৃষ্ণ : আমি বলি শোন বৃন্দে গো ধরি আমি তোমার পা। আজুকা পরিয়াছি বৃন্দে রাধার মান দেখায়। ওগো মান ভাঙ্গিয়ে দেওগো রাধে ধরি আমি তোমার পায়।

বৃন্দে : আমি বলি শোন কালা। পেয়েছি অনেক দিনে। সহজে ছাড়বনা তোমায়। আছো মোর মনে। আমি পূর্বের কথা সুধ করিব অভিমানে। সহজে ছাড়বো না তোমায় আছে মনে।

এই কথা শুনিয়া বৃন্দে গোপনে যায় রাধার চাই। স্বামী শিবে তোমার কাছে শুন ওগো রাধার মান ভিক্ষা চাহিলে সামে ভিক্ষা দিও না গো রাই। ঐ

কৃষ্ণ : বৃন্দে এল ঘরে ফিরে সাম গিয়া কয় রাধারে চক্ষু মেলে একটি কথা কও না আমারে আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম আর ভুলবনা তোমাকে।

রাধা : দূরে যাও হে তুমি চন্দ্রা বলি সাম কালো। অন্তরে অন্তরের ব্যথা দিও না জ্বালা। আমি কালোরূপ আর হেরবনায়ে একা রাধা রই কালা। ঐ

অন্তরা : ওগো পায়ে ধরিতে মান ভাঙ্গিতে কিছুতে না পারি আর। কাঁদিতে কাঁদিতে সামে গেল বলিয়া। আমি ডাক দিয়া কই, ওগো বৃন্দে রাই চাহিলনা ফিরিয়া গো।

৮. সীতার বনবাস

সীতা দিতে বনবাস দেশে লক্ষণ আসতে চায়।
সীতা দেবী বলে দেবর চলিল কোথায় দিয়া
জন্তুর ঘরে, চিরতরে দেশে লক্ষণ আসতে চায়।
হাতে ধরে রথে তুলে, পথে নানা আলপন
বনবাসের কথা কিছু বলনা লক্ষণ।
আনলে গুপ্ত চুড়ি। নারীর বক্ষে ফেটে যায় অনল।
পঞ্চ মাসের গর্ভ সীতা রামের সন্তান উদয়।
রবি কোল বীল লক্ষণ, দিয়ে যায় কার।
দিও রামের সন্তান, রামের কোলে বুক ছিড়ে নেও বের করে।

সীতা : অগ্নিজলে সাগর কোলে, পরীক্ষা কি মনে নাই

তবে কেমন পাতায় বনে
দেখে কি অন্যরা
বল কেমন করে পাশরিলে
প্রবু রাম চন্দ্র গুসাই।
চতুর্দশী বৎসরের জন্য, রইলাম নিদ্রা অনাহার
বলনা রমণীর জন্য, প্রতিজ্ঞা তোমার।
ওগো গাছ পাথরে সেতু বেধে হয়ে নিল লঙ্কাসর।

অন্তরা : জন্মের মত জান কিরে। লক্ষণ দিল বিসর্জন। মরার মতো ধরা, সীতা করিল স্মরণ। ঐদিন বঙ্গে বলে বিধির বিধান কে করে খণ্ডন।

৯. কলসি কাখে শ্রীরাধিকা

রাধা পেরি আনতে পারি, সংগে নিয়ে সখিগন
কাখে কলসি নিয়ে যায় গো যমুনায় তখন
সম্পর্ণা করি সারি সারি বাতাস ও রামায়ণ
সপনা করি সারি সারি নামল এসে যমুনায়
কদম জালেতে কৃষ্ণে মনে ভাবে দায়।
করব কিছু চাতুরালি নামল এসে যমুনায়।
মন রঙ্গে সখি গনে জল ভরিল কলসিতে
কৃষ্ণ কয়গো শোন বলি সবার সাথে।
বিনা করে সদর ঘাটে কেও পারিবেনা জল নিতে।
সরে বলে ওমা ওমা কি বলে মন্দের কানাই
ওরে জলের ঘাটে জমা লাগে কখন শুনি নাই।
আমরা কুল বধূ আসলাম জলে
কড়ি আমরা কোথায় পাই
জলের ঘাটে জমা লাগে কখন শুনি নাই।
কড়ি দিতে না পারিলে দিয়ে যাও কানের সোনা
কাইল আসিয়া সুদ করিও যায় যত দেনা
আমি যতন করিয়া রেখে দিব তোমাগো কানের সব গয়না।
আসল সোনা হইয়া তুমি নকল সোনা যাও
কেনে বিশ্বাস না হল জামিন রেখ
রশি মই রাই, ঈশ্বর চন্দ্র ভেবে বলে
রূপের পায়ের নাই গো ধাই।

কুমিল্লা জেলার থানাগুলোর প্রায় সব থানাতেই এই লোকনৃত্য দেখা যায়। তাই দেবীদ্বার থানা ও চান্দিনা থানায়ও এই লোকনৃত্য দেখা যায়। এই নৃত্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনগনের নিজস্ব রীতি। এটি উৎসবে আনন্দ প্রকাশ ও আচারের একটি মাধ্যম। এই লোকনৃত্যে নারী, পুরুষ সকলেই অংশগ্রহণ করে। এই নৃত্যে বিশেষ কোন পোশাক পরতে হয় না। প্রত্যেক নৃত্যরত নারী পুরুষ তাদের নিজস্ব

পোশাক (শাড়ি, প্যান্ট-শার্ট) পরে এই নাচ নেচে থাকে। এই নাচের সঙ্গে ভক্তিমূলক নাচের একটি ধারা লক্ষণীয়। এই নাচ অনেকটাই ত্রিপুরা নৃত্যের মতো। এই নৃত্যে দুটো হাত ও পা সমান তালে ঢাকের ছন্দে ছন্দে দোলে। এই নৃত্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান ঢাকের বাজনা। বৃদ্ধরা এই নাচকে তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবেই মনে করে।

খ. লোকনৃত্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের লোকনৃত্য চালু রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য হলো—গম্ভীরা নাচ, ঘেমটা নাচ, পুতুল নাচ, জারি নাচ, কালীনৃত্য, চৌ-নাচ, বাউল নাচ, হুদমা নাচ, লাঠি নাচ ইত্যাদি। তার মধ্যে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ এলাকার দিশাবন্দ গ্রামের একদল প্রবীণ ব্যক্তি জারিগান ও জারি নাচ এখনো টিকিয়ে রেখেছে।

জারিনৃত্য

১. সদর দক্ষিণের জারিনাচ

সদর দক্ষিণের নেউড়া গ্রামের মানিক সরকার পার্শ্ববর্তী দিশাবন্দ গ্রামের কিছু লোক নিয়ে যে দল গঠন করেন তা মানিক সরকার ও তার দল নামে বেশ পরিচিত। উল্লেখ্য যে, তাদের কেউই শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান নন। তারা সহজাত অনুশীলন ও পরিবেশনা ও ফরমায়েশি আনুষ্ঠানিক পরিবেশনার মাধ্যমে লোককলার এই আশিকটিকে কুমিল্লায় জিইয়ে রেখেছেন। মহররম মাস এলেই নেউড়া, ঢুলিপাড়া, দিশাবন্দসহ কুমিল্লার অন্যান্য এলাকা এরা মুখর করে তোলেন। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো–

আশুরা উপলক্ষে এই নাচ-গান পরিবেশিত হয়। এটি মুসলিম সংস্কৃতি হলেও সব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজন তা উপভোগ করে থাকে। ইরাকের ফোরাত তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন হত্যা এবং তার ভাই ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার করুণ কাহিনিকে ঘিরে বিশ্বের শিয়া সম্প্রদায় নাচ-গান, মাতম, মেলা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। এই প্রেক্ষিতেই অন্যান্যদের মধ্যেও তার চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে পড়ে। মূলত মীর মশাররফ হোসেন এর বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের ঘটনাকেই মূল উৎস ধরে বাংলাদেশে জারি গান ও নাচের সৃষ্টি হয়েছে। জারি নাচের প্রধানকে সরকার বলে এবং অন্যান্যদের বলে দোহার। তবে সরকার নাচে না, নাচের কাজটি করে দোহাররাই। তারা সাদা লুঙ্গি এবং সাদা ফতুয়া বা সাদা টি-শার্ট/গেনজি পরে এবং কোমরে বা মাথায় লাল গামছা পরে নাচ পরিবেশন করে। তবে সরকারের গামছাটি গলায় পরতে দেখা যায়।

প্রথমে বাঁশি বাজিয়ে পরিবেশনার সূচনা করে। দোহাররা ধূয়া গায় এবং পার্শ্বপদক্ষেপ ফেলে নাচে। জারি নাচ বৃত্তাকারে প্রদর্শিত হয় কখনো কখনো তারা হাতের গামছাটি আচলের মতো করে দুলিয়ে থাকে। বৃত্তাকারে পা ফেলে ফেলে ঘুরে ঘুরে তারা নাচে।

আদিম নৃ-গোষ্ঠীই মূলত লোকনৃত্যের ধারক ও বাহক অঞ্চল ভিত্তিতে কিছু বিশেষ লোকনৃত্য চোখে পড়ে। প্রাচীন কাল থেকে মানুষের শ্রম বিভাগের উপর ভিত্তি করে কিছু লোকনৃত্যগড়ে উঠেছে যেমন : মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে নৌকা বাওয়াকে কেন্দ্র করে ইত্যাদি। উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছু নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। যেমন : বাউল নৃত্য, আরতি নৃত্য, ধুপতি নৃত্য, কাদা নৃত্য, ঢাক নৃত্য ইত্যাদি। এসব লোকনৃত্যগুলো এ অঞ্চলে (মুরাদনগর) প্রচলন আছে। এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো,

২. বাউল নৃত্য

প্রকৃত অর্থে বাউল নাচ কুষ্টিয়ার সেউড়িয়া অঞ্চলে প্রতিবছর বাউল লালন শা'র আওধান ও তিরোধান দিবসে চোখে পড়ে। এখানে প্রতিবছর মেলা বসে, মেলায় বসে বাউল গানের আসর। বাউল গানের সাথে চলে বাউল নৃত্য। আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন স্থানে বসে বাউল বয়াতি গানের আসর। এ সময় গানের পাশাপাশি চলে আত্মহারা বাউলদের শারীরিক নানান কলা কৌশলের নৃত্য। তাদের হাতে থাকে একতারা এবং কোমরে বাধা থাকে বায়া। পায়ে ঘুঙুরও পরে থাকে অনেকে।

৩. আরতি নৃত্য

হিন্দুদের নানা ধর্মীয় পূজা পার্বনে আরতি নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজার এ জাতীয় নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। রাত যত বাড়তে থাকে ততই এই নৃত্যের ঝোক বাড়তে থাকে।

৪. ধুপতি নৃত্য

পূজা পার্বনে এ নাচটিও প্রায়ই দেখা যায়। রাতে পূজার সময় নৃত্য শিল্পীরা এ নাচ পরিবেশন করে থাকেন। নৃত্য শিল্পীরা দুই হাতে ও মুখে একটি করে দুপতি নিয়ে মোট ৩টি ধুপতি নিয়ে নৃত্য করতে থাকেন। ধুপতিগুলোতে থাকে নারকেলের ছোবড়া ও ধুপ ধোনার আগুন।

৫. কাদা নৃত্য

দুর্গা পূজার দশমী শেষে ছেলেরা দুর্গা মণ্ডপের সামনে এসে উঠানে জল ঢেলে কাদা-কাদা করে মাটি নরম করে এক প্রকার নৃত্য করে থাকে যা স্থানীয় ভাবে কাদা নৃত্য নামে পরিচিত।

৬. ঢাক নৃত্য

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার সময় ঢাক বাদ্যসহ পুণ্যার্থীরা নৃত্য করতে করতে বাড়ি বাড়ি যায় এবং বাড়ির গৃহস্থরা তাদেরকে নানা প্রকার উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে ঢাকের গান শুরু হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে ঢাক-নামানো বলে। তারপর এক মাস ঢাকের গানের পরে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন এই গান সমাপ্ত হয়।

ঢাকের গানের সদস্য সংখ্যা : হারমোনিয়াম বাজানো ও গানের অন্তরা গায় একজন, তাকে মাস্টার বলে। গায়েন একজন লাগে। আর অন্যান্য চরিত্র সাজার জন্য দশ থেকে পনেরো জন লাগে।

পালা মঞ্চায়ন : এই ঢাকের গানে মহাদেব কালা, রাধা, বাঘ, রাধার মান, লক্ষণ-শক্তিশেল, হরিশচন্দ্র, নৌকা বিলাস, ইত্যাদি গান মঞ্চস্থ হয়।

বাদ্যযন্ত্র : বাঁশী, ঢাক-ঢোল, কাসী, হারমোনিয়াম, নূপুর।

সময় : এটি প্রতিদিন গ্রামের বিভিন্ন উঠানে গান করে অভিনয় করে, নেচে নেচে অনেকটা যাত্রার মতো। গ্রামের প্রত্যেক ঘর থেকে টাকা, ধান, চাল, নারকেল ইত্যাদি চাঁদা তোলে। ১০০-২৫০ টাকা পর্যন্ত প্রতি উঠানে পাওয়া যায়। নিজ গ্রাম শেষ হলে আশপাশের তিন চারটি গ্রামে গিয়ে ঢাকের গান করে।

পোশাক : প্রত্যেক গায়ক যে পাট করবে, সেরকম করে সাজবে। এখানে সকলেই পুরুষ সদস্য থাকে। তাই নারীর কোন চরিত্র হলে পুরুষরাই শাড়ি পরে, নারী সেজে গান করে। কোন কোন পশু-পাখির চরিত্রও তারা করে সেজে।

লোকনৃত্যের সাক্ষাৎকার

শেফালী সরকার, স্বামী-প্রেমানন্দ সরকার, বয়স-৫০, পেশা-গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-ডুমুরিয়া, পোঃ বারেরা, থানা : চান্দিনা।
প্রশ্ন : আপনি এই নৃত্য কখনো করেছেন?
উত্তর : হ, করছি। ছোট থাইক্যা এই নাচ করতাছি।
প্রশ্ন : কে শিখিয়েছে এই নৃত্য?
উত্তর : কেউ শিখায় নাই। দেইখ্যা দেইখ্যা শিখছি।
প্রশ্ন : আপনার স্বামী নিষেধ করে না?
উত্তর : না, মানা করব কিয়েরে। তাইনও মাঝে মইদ্যে নাচে। তহন আমার শরম লাগে। আবার তাইন থাকলে আমি শরমে নাচি না, না থাকলে নাচি। হে মানা করে না কোনদিন।

ঢাকের গান

সাক্ষাৎকার-১
নিবারণ চন্দ্র সরকার

পিতা : মৃত কামাইলাল সরকার, বয়স-৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি
পেশা : কৃষি কাজ
গ্রাম : যোববাড়িয়া
পো : ইলিয়টগঞ্জ
থানা : চান্দিনা

প্রশ্ন : আপনি কতদিন যাবৎ এই ঢাকের গান করেন?

উত্তর : ছোটবেলা থাইক্যা করি। আগে অন্যরা করতো, দেখতাম তারপর অন্যদলের কাছে খাতা থাকে, সেইগানগুলা লেইখ্যা আনছিলাম। তারপর সেইগুলা আমরা করছি।

প্রশ্ন : আপনার দলে কতজন সদস্য আছে?

উত্তর : ঐভাবে তো নির্দিষ্ট নাই। তবে দশ-পনেরো জন প্রত্যেক বছর থাকে। লোক কম পড়লে, যে রাধার পাটটা করে সেই আবার সীতার পাটও করে।

প্রশ্ন : এবার চৈত্রসংক্রান্তিতে ঢাকের গান করবেন?

উত্তর : না দুই বছর ধইরা করি না। সবাই কাম করে। কেউ মিস্ত্রিরির কাম, কেউ যোগালির কাম। এইসব কইরা তারা ঢাকের দলে আসতে চায় না। পোষায় না।

প্রশ্ন : তার মানে এই গ্রামে ঢাকের গান হয় না এখন।

উত্তর : আগে তো চৈত্রমাসে খরায় কোন কাজ থাকতো না করতাম। এখন তো চাষের কাজের বাইরেও কাজ আছে। আর যারা একবার গান বন্ধ দেয় নিজের পাট ভুইল্যা যায়। শিখানো কষ্ট হইয়া যায়।

ঢাকের গান

সাক্ষাৎকার-২
তাপস কুমার সরকার
পিতা : হারাধন চন্দ্র সরকার, বয়স : ৩১, শিক্ষাগত যোগ্যতা-১ম শ্রেণি
পেশা : কাঠ মিস্ত্রি
গ্রাম : যোববাড়িয়া
পো : ইলিয়টগঞ্জ
থানা : চান্দিনা

প্রশ্ন : আপনি ঢাকের গানের কোন চরিত্র করেন?
উত্তর : এখন তো করি না। আগে রাধা, সীতার পাটটা করতাম।
প্রশ্ন : কেন করেন না।

উত্তর : আগে ছোট আছিলাম। একমাস বাইরে গিয়া থাকলেও কোন অসুবিধা হইতো না। টাকার চিন্তাও করতাম না। দলে যইরা ভালা লাগতো। এখন সংসার হইছে। বাচ্চা-কাচ্চা হইছে। মিস্ত্রিরি কামে একরোজ তিনশ টাকা। ঢাকের গানে তো এতো টাকা পাই না।

প্রশ্ন : এতে করে তো এই ঢাকের গান হারিয়ে যাবে?

উত্তর : হারাইবো কেন। অন্যরা করবো। আমরা তো আগে অনেক করছি। তখন মানুষে পছন্দ করতো। এহন মনে করে, যারা আকামলা, তারা এইসব করে। আসলে মানুষও বদলাইয়া গেছে।

লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়াকে বলা যায় জীবন চর্চারই অনুরূপ। প্রতিটি লৌকিক খেলারই রয়েছে উৎস। কুমিল্লার প্রায় সব উপজেলায় প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলো প্রায় অভিন্ন। তবে সদর দক্ষিণ উপজেলায় ব্যতিক্রমী একটি লেখার ঐতিহ্য এখনো টিকে আছে। তা হলো লাঠি খেলা।

১. হা-ডু-ডু

এটি একটি দলীয় লোকক্রীড়া। মাটিকে কুপিয়ে আলগা ঝুর ঝুরে করে নরম করা হয়। খেলার কোর্টের আয়তন করা হয় ২১১৪বর্গ হাত। প্রতিযোগিতামূলক এ খেলায় সাধারণত দশজন করে খেলোয়াড় থাকে (তবে অঞ্চল বিশেষে এ সংখ্যার তারতম্য হয়)। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের যে কোন খেলোয়াড় কোর্টের মাঝ খান থেকে নিশ্বাস নিয়ে মুখে শব্দ করতে করতে প্রতিপক্ষের কোর্টের কাউকে ছুঁয়ে আসার চেষ্টা করতে হয়। সে সফল হলে সে খেলোয়াড়টি প্রতিযোগিতা থেকে অযোগ্য বা বাদ পড়ে যায়। এভাবে যে পক্ষের খেলোয়াড় সব আগে অযোগ্য হয়ে পড়ে সে পক্ষের বিপরীত দল বিজয়ী হয়ে থাকে।

২. লাঠি খেলা

সাধারণত আশুরা উলক্ষেই এ খেলা হয়। মহররম মাস এলেই এ খেলার আয়োজন চোখে পড়ে। এ খেলা দুইজনে কিংবা দলগতভাবে এই খেলা যায়। লেখাই বাহুল্য যে, এটি বড়দের খেলা। তবে তাদের প্রশিক্ষিত হতে হয়। লাঠি ঘূর্ণনের নানা কৌশল আয়ত্তে না থাকলে এটি খেলা সম্ভব হয় না। এ খেলাটি কৃত্রিমভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবু এতে ঘাত- প্রতিঘাতের সুযোগ থাকে।

লাঠিই খেলার মূল উপকরণ। প্রতিযোগিতামূলক বড় আয়োজনে ঢোলের ব্যবস্থা থাকে। মহররম মাসের এক থেকে দশ তারিখের মধ্যে খেলোয়াড়গণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা খেলে থাকে। আবার কোন ধনী গৃহে বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিবেশনার আমন্ত্রণ পেলে পরিবেশিত হয়। খেলোয়াড় শিল্পীগণ বাড়ির উঠানে বা খোলা জায়গায় এ খেলার আয়োজন করে। একক খেলায় খেলোয়াড়ের দক্ষতা ও নৈপূণ্য দেখা হয়। খেলোয়াড় তার হাত, পা, মাথাকে কেন্দ্র কের লাঠি ঘুরানোর নানা কসরত দেখায়। দলীয় খেলায় সাধারণত শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রতিপক্ষের নিকট নিজেদের শক্তি সামর্থ জাহির করা হয়। ঢোলের তালে তালে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন খেলা প্রদর্শিত হয়।

৩. এপেনইটি বায়োস্কোপ

এটি গ্রামের কিশোর খেলা। ১০-১২ জন ছেলে-মেয়ে মিলে এই আনন্দদায়ক খেলাটি খেলে। দু'জন দলনেতা বা রাজা হয়। তারা পরস্পরের হাতের আঙুলের খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে দু'হাত উঁচু করে ধরে গেট তৈরি করে। বাকি ছেলেমেয়েরা পরস্পরের কাঁধে

হাত রেখে সারিবদ্ধভাবে গেটের (হাত দিয়ে বানানো) ভিতর দিয়ে হেটে যায়। তখন নিম্নোক্ত ছড়া কাটা হয়,

এপেনটি বায়োস্কোপ
নাইন টেন টেস্কো
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
সাহেব বাবু যেতে
পান সুপারি খেতে
পানির আগা মরিচ বাটা
ইসকিরিমের চাবি আটা
যার নাম লেলুমালা
তাকে দেব মুক্তার মালা

ছড়াটির শেষকথা মুক্তারমালা উচ্চারণের সময় হাতের নিচে যে থাকে তাকে দুইজনের হাতের বন্ধনীর মধ্যে আটক করা হয়। পরে সকলে তাকে পাঁজাকোলা অবস্থায় উর্ধ্বে তুলে ধরে নেচে নেচে আনন্দ করে থাকে।

৪. বৌছি/বউছি

এটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই প্রচলিত। একে দৌড়াছিও বলে। দুই দলে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। জোড় সংখ্যক সদস্য (কমপক্ষে দুই জোড়) নিয়ে বৌছি খেলা হয় বরুড়া অঞ্চলে।

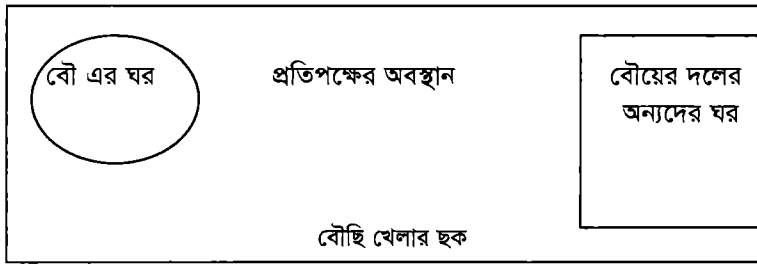

খেলার বিবরণ : কারা প্রথমে খেলবে তা নির্ধারণের জন্য গাছের পাতা দিয়ে টস হয়। গাছের পাতা ছেড়ে দিয়ে বলা হয় হাড্ডি না মাংস। যারা টসে জিতে তারাই বউ পক্ষ হয়ে খেলা শুরু করে। সাধারণত খেলা মাঠের বড় পরিসরে একটি বৃত্তাকার ঘর বানিয়ে সেখানে বউকে রাখা হয়। এর অপর প্রান্তে বউয়ের দলের অন্য খেলোয়াড়দের জন্য একটি আয়তাকার ঘর বানানো হয়। আর প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা এ দুটি ঘরের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সুবিধা মতো অবস্থানে থাকে। বউয়ের হাত-পা ঘরের দাগের বাইরে গেলে সে মারা যাবে। তবে অন্যদলের তারা না দেখালে চলবে।

প্রথমে দলের একজন এক নিঃশ্বাসে বেলে দিয়ে বউয়ের কাছে যায় এবং বলে- 'প্রথমে ছি দিয়া গ্যালাম/বউয়ের মুখ চাইয়া গ্যালাম' কিংবা বলে,

বউয়ের মুখ চাইয়া গ্যালাম
পাঁচশ টাকা দিয়া গ্যালাম
(এ সময় বউয়ের সামনে একটি পাতা রাখে)

তারপর অন্য সদস্যরা বিভিন্ন ছড়া কেটে বোল দেয় এবং প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছোঁয়া দিতে তাড়িয়ে বেড়ায়। একেক জন একেক ভাষায় ছড়া কাটে। যেমন, একজন বোল দেয় 'ছি কুতকুত নাড়ে নাড়ে/ঘন্টা বাজে বারে বারে'। বোল দিতে গিয়ে যদি তার দম পড়ে যায় তখন সে মারা পড়ে। তখনই অন্য একজন অন্য ভাষায় বোল দেয়। যেমন– 'কচুপাতা লকটন/তোরে ছুইতে কতখন/তোরে ছুইতে কতখন' ইত্যাদি ছড়ার সুরে চারপাশ সরগরম হয়ে উঠে। বউয়ের দলের বোল দেওয়া খেলোয়াড়দের লক্ষ থাকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছোয়া দেয়ার জন্য তাড়িয়ে বেড়ানো এবং বউকে ঘরে আসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। আর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের খেয়াল হলো বউ ঘরে যাওয়ার সময় ছোয়া। বৌ সবসময়ই ঘরে যাওয়ার সুযোগ খোজে। বউ যদি ছোয়া বাচিয়ে ঘরে ফিরতে পারে তাহলে এক গেম হয়। আর যদি বউ ছোয়া যায় তাহলে তার দলের সকলেই মারা যায়। পরে এবং প্রতিপক্ষ বৌ দলের হয়ে খেলার সুযোগ পায়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যদি একের পর এক ছোয়া যেতে থাকে তখন বউয়ের ঘরে ফেরার পথ সুগম হয়। আর যদি বউয়ের খেলোয়াড় বেশি মারা পড়ে তাহলে বউয়ের ঘরে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। যে দল বেশি গেম দিতে পারে, তাদের জয় হয়। আমাদের সমাজে মহিলা বা বউদের যে অনিরাপত্তা এবং এজন্য তাকে রক্ষা করার যে মানসিকতা এই দিকটি এই খেলার মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

৫. পাঁচ কইট্টা (পাঁচগুটি)

বরুড়া অঞ্চলে কয়েক রকমের গুটি খেলা প্রচলিত পাঁচগুটি, ছয়গুটি, দশগুটি ইত্যাদি। তবে পাঁচগুটিই বেশি জনপ্রিয়। উঠতি কিশোরীরা এ খেলার প্রধান খেলোয়াড়। এটি দুজনের খেলা। সাধারণত মসৃণ মেঝেতে বসে এটি খেলা হয়। পাথর বা ইটের পাঁচটি মসৃণ টুকরো এ খেলার উপকরণ। এটি কসরতের খেলা হাতের দক্ষতা ও দ্রুতগতির ওপর এ খেলার সাফল্য নির্ভর করে।

খেলার বিবরণ : এ খেলাটিতে আটটি ধাপ রয়েছে। এগুলোকে একের টোক, দুয়ের টোক, তিনের টোক, চারের টোক, পাঁচের টোক, ছিপা বা ছিপটি, ধাপ্পি ও কেঁচকি। পূর্বতন ধাপগুলো শেষ করে সর্বশেষ কেঁচকি পর্যায়ে এসে গেম হয়।

একের টোক : হাতের একটি গুটি নিয়ে আর একটি গুটি মাঠ বা মেঝে থেকে উঠাতে হয়। কন্তি হাতের গুটিটি মাটিতে পড়তে পারবে না।

দুয়ের টোক : হাতে একটি গুটি নিয়ে দুটি গুটি একসাথে মেঝে থেকে উঠাতে হয়।

তিনের টোক : অনুরূপভাবে তিনটি গুটি একসঙ্গে উঠাতে হয়।

চারের টোক : একটি গুটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে খলি হাত মাটিতে মাটিতে স্পর্শ করে শূন্যে ভাসানো গুটি ভূমি স্পর্শ করার আগেই হস্তগত করতে হয়।

পাঁচের টোক : হাতের তালুর উল্টোপিঠে গুটি পাঁচটি নিয়ে গুটিগুলো উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে হাতের তালুতে নিতে হয়।

ছিপা/ছিপটি : হাতের তালুতে সমুদয় গুটি নিয়ে গুটিগুলো শূন্যে ভাসিয়ে হাতের তালুতে উল্টোপিঠে নিতে হয়। যদি সবগুটি উল্টোপিঠে ধারণ করা সম্ভব না হয়, তখন মাটিতে পড়ে যাওয়া গুটিগুলো আঙুলের ছিপি দিয়ে ধরে রেখে তালুর উল্টোপিঠে থাকা গুটিগুলো সহ সবকটি গুটি তালুতে নিতে হয়।

ধারি : লোফালুফির এ পর্যায়ে গুটিগুলো হাতের তালু থেকে উল্টো পিঠে নিতে হয়। তারপর গুটিগুলো শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তালু নিচের দিকে রেখেই ভাসমান গুটিগুলো করায়ত্ত করতে হয়।

কেঁচকি : প্রথমে পাঁচটি গুটিকে ছড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর এক হাত দিয়ে সাঁকোর মতো বানাতে হয়। এই হাতের আঙুলের তৈরি সাঁকোর নিচ দিয়ে ছড়ানো গুটিগুলো পার করতে হয়। প্রথমে প্রতিপক্ষ একটি গুঁটিকে 'কুত্তা' নির্ধারণ করে দেয়। এই 'কুত্তা' গুটিটিকে সবশেষে পার করতে হয়। তখনই 'গেম' হয়। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে। বর্ষার দিনে এ খেলায় মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়।

৬. এক্কা দোক্কা

এই খেলাটি মেয়েদের খেলা এবং প্রায় সর্বত্রই এই খেলাটি চোখে পড়ে। এই খেলাটি খেলার জন্য বাড়ির উঠানে একটি আয়তাকার ঘরের দাগ কাটা হয়। ঘরে ছয়টি দাগ কাটা হয়, ভাগগুলোর নাম যথাক্রমে এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা, পক্কা, ষষ্ঠী। ভাঙা কলসির একটি অংশ যা স্থানীয়ভাবে চাড়া নামে পরিচিত এই খেলাটির একটি উপকরণ। চাড়াটি কপালে রেখে আকাশের দিকে মুখ করে দাগ কাটা ঘরগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করতে হয় খুব সাবধানতার সাথে যাতে পা দাগে না লেগে যায়। দাগে পা পড়লে খেলোয়াড় খেলার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৭. কানা-মাছি

এ খেলাটির বিস্তৃতিও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র। বাড়ির উঠানের মতো বড় খোলা যায়গায় এ খেলাটি হয়ে থাকে। ছেলে মেয়ে উভয়েই এই খেলাটি খেলে থাকে। কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে তার পিঠে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সবাই একত্রে বলতে থাকে কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছো। চোখে কাপড় বাধা ছেলেটি যদি কাউকে ছুয়ে দিতে পারে তবে সে চোর হবে।

৮. গুলিখেলা

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই খেলা প্রচলিত। মুরাদনগরেও এ খেলা খেলতে দেখা যায় ছেলেদের। বাড়ির উঠানে ছোটগর্ত করে নির্দিষ্ট দুরত্ব থেকে ছেলেরা বসে থেকে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে মার্বেল ঠেকিয়ে আঙ্গুলটাকে গুলতির মতো ব্যবহার করে লক্ষ ভেদের কাজে লাগায় এবং গর্তে ফেলার চেষ্টা করে।

৯. লাটিম খেলা

এ খেলাটির চলও সব যায়গায় দেখা যায়। কাঠের তৈরি লাটিমের গায়ে লেইস ফিতা বা নেতি পেচিয়ে লেইছের অপর প্রান্তকে বেঁধে রাখে তাদের ডান হাতের কনিষ্ঠাতে, তারপর সজোরে ছেড়ে দেয়া হয় একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মাঝে। এই বৃত্তের ভেতর ঘুরতে থাকে লাটিমটি।

১০. পুতুল খেলা

পুতুল খেলা প্রধানত মেয়েদের। কাঠ, কাপড়, মাটি দিয়ে মেয়েরা নারী, পুরুষ, বর-কনে তৈরি করে থাকে। তারপর কাপড়, নানা প্রকার গাছের পাতা ও কাপড়ের পাড় দিয়ে তৈরি নানা প্রকার গহনা পুতুলের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে থাকে। দুই বাড়ির দুই বান্ধবী এই খেলায় অংশ নেয়। এক বান্ধবীর বর পুতুলের সাথে অপর বান্ধবীর কনে পুতুলের বিয়ে দেয়া হয়। এ উপলক্ষে তারা কৃত্রিম মাছ, মাংশ পোলাও, কোর্মা রান্না করে থাকে।

মার্বেল/গুলি খেলায় ব্যস্ত শিশুরা

১১. লাইখেলা

লাইখেলা ছেলেদের দলবদ্ধ খেলা। একটি ছেলে বুক পানিতে দাড়িয়ে হাতে অদৃশ্য কিছু ইঙ্গিত করে অন্যদের প্রতি প্রশ্নোত্তর সূচক ছড়া বলতে থাকে। ছড়াগুলো একেক অঞ্চলের এক এক রকম হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটি নিম্নরূপ–

আমার আতে কী?
জলই, এক ডুবে তলই
তরে যদি পাই
এক গরায় খাই।

১২. ঘুড়ি ওড়ানো

এ খেলাটির চল বাংলাদেশের সর্বত্রই চোখে পড়ে। আবহাওয়া শুষ্ক ও অনুকূল থাকলে ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য নাটাই তৈরি সুতায় মাতা দেওয়া, মাওতা দেওয়ার জন্য নানান উপকরণ সংগ্রহ করা সহ এ জাতীয় কাজে ছেলেদের বেশ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগীতাও দেখা যায় ভীষণ। কার ঘুড়ি ওড়ানোর দক্ষতা ভালো কার মন্দ এ সব নিয়ে চলে বিচার বিশ্লেষণ

ও নানা আয়োজন। স্থান বিশেষে এই খেলাটি একটি প্রতিযোগীতা হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় বেশ কিছু লোকক্রীড়া প্রচলিত আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য লোকক্রীড়াগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হলো–

স্থলভাগের ক্রীড়া		জলভাগের ক্রীড়া	অন্তরীক্ষের ক্রীড়া
এক্কা দোক্কা	পাঁচ কড়ি	নৌকা বাইচ	ঘুড়ি ওড়ানো
কানামাছি	ষোল গুটি	সাতার	
গুলি খেলা	অঙ্ক দৌড়	ডুব সাতার	
কুতকুত	দৌড়	লাই খেলা	
লাটিম খেলা	ছোয়া ছুয়ি		
পুতুল খেলা	সাতচাড়া		
লুকোচুরি	হা-ডু-ডু		

১৩. বাঘবন্দী খেলা

এটি দুইজনে খেলে থাকে। ঘুঁটি হলো এই খেলার উপকরণ। এতে একপক্ষে থাকে 'বাঘ' এবং অন্যপক্ষে থাকে ছাগল। এই খেলায় 'ছাগল' নামক ঘুঁটি দ্বারা 'বাঘ' নামক ঘুঁটিকে বন্দী করা হয়। তাই এর নাম হয়েছে বাঘবন্দী। এই খেলার জন্য মাটির ওপর দাগ কেটে ঘর বানানো হয়। ঘরটি নিম্নরূপ,

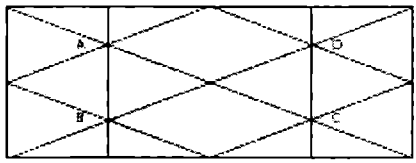

চিত্র : বাঘবন্দী খেলার ছক

অ, ই, ঈ ও উ ঘরে ৫টি করে ২০টি ঘুঁটি বসবে। 'বাঘ' নামক ঘুঁটি সুবিধামতো অন্য যে কোনো ঘরে বসানো হয়। তারপরে শুরু করা হয় চাল। ঘুঁটির চাল সরলরেখা বরাবর চলে। ঘুঁটির বিপরীতে খালি ঘর থাকলে বাঘ লাফ দিয়ে ঘুঁটি মারতে পারে, কিন্তু পর পর দুটি ঘুঁটি অবস্থান করলে বাঘের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এক সময় সব দিক থেকে যখন বাঘকে আটকে ফেলা হয়, তখন আর চাল চলে না। তখন বাঘের পক্ষেও হার হয়। আর যদি বাঘ ছাগলের ঘুঁটি একের পর এক মারতে থাকে, বাঘের পথ রোধ করতে পারে না, তাহলে ছাগল পক্ষের হার হয়। বাঘ শিকারের কৌশল থেকেই এ খেলার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। পূর্বে গরু ছাগল বেঁধে রেখে ফাঁদ পেতে বাঘ শিকার করা হত।

১৪. শান্তালতা খেলা

১০-১২ জন ছেলেমেয়ের দলগত খেলা এটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা স্কুলের 'লেজার পিরিয়ডে' এ খেলায় বিদ্যালয় আঙিনাকে সরগরম করে তোলে। একজন চোর

হয়ে ঘোড়ার মত নিচু হয়ে থাকে। অন্যরা তার উপর দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে পার হয়। তখন নিম্নরূপ ছড়া কাটা হয়,

শান্তালতা
গাছের পাতা
পা ঝিম ঝিম করে
জমিদারের ছেলেরা
মুরগি চুরি করে।
আধেক পথে যাইয়া মুরগি
কক্ কক্ করে।

প্রথমে একজন 'শান্তা লতা' কথাটি উচ্চারণ করে একদিক থেকে চোরকে অতিক্রম করে। তারপর এর পরের পঙক্তি 'গাছের পাতা' উচ্চারণ করে বিপরীত দিক থেকে আরেকজন অতিক্রম করে। এভাবে প্রত্যেকে পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে অতিক্রম করে ছড়াটি শেষ করে। তার পর শুরু হয় খেলাটির পরবর্তী পর্ব। উল্লেখ্য যে, পিঠের উপর দিয়ে অতিক্রমের সময় খোড়া পা মাটিতে পড়ে গেলে সে মারা পড়বে। তারপর চোর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে এবং দুই হাত সমান করে সামনে উচু করে ধরে। তখন অন্যরা পূর্বেকার মত ছড়া কেটে পার হবে চোরের পায়ের উপর দিয়ে। পায়ের সাথে লেগে গেলে চোর হবে।

১৫. ডাইগ্যা খেলা

এটি সাধারণত ছেলেরা খেলে থাকে। গ্রামের কিশোরদের খুব প্রিয় খেলা এটি। দু'জন কিশোর একত্র হলেই এ খেলা খেলতে পারে। প্রয়োজন শুধু দুটি জুতসই চাড়া (মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ)। এই চাড়াই এই খেলার উপকরণ। ডাইগ্যা খেলার স্থান নির্বাচনটি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ক্রমাগত শুকিয়ে আসা পুকুরের ঢালকে কিশোররা উত্তম জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ডাইগ্যা হাত সইয়ের খেলা। যাতে সহজে কেউ তার চাড়াকে খেতে না পারে, এজন্য এইরকম উঁচু নিচু জায়গা পছন্দ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমেই এ খেলা বেশ জমে উঠে।

নিয়ম পদ্ধতি : প্রথমে একটি সুবিধাজনক সমান জায়গায় একটি ঘর বানানো হয়। এই ঘরের ভেতর থেকে চাড়াটিকে সাধারণত ৮-১০ হাত দূরে ছুঁড়ে মাড়ে। খেলোয়াড় যত দক্ষ হয় তত দূরে মারার প্রবণতা থাকে। তারপর দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করা হয় সে তার 'চাড়া' বা 'ডাগ' টিকে খেতে রাজি আছে কিনা। উল্লেখ্য যে, এ খেলায় একজনের চাড়া আর একজন খেতে পারলে তাকে সাধারণত মুঠোয় থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ শীমের বীচি (পরিপক্ব) দিতে হয়। তখন দ্বিতীয় খেলয়াড় জিজ্ঞেস করে খেতে পারলে কী পরিমাণ শীমের বীচি তাকে দেওয়া হবে। বীচির পরিমাণ পছন্দ হলে সে খেতে রাজি হয়। যদি সে তার চাড়াটিকে ঐ খেলোয়াড়টির চাড়ার উপরে ফেলতে পারে বা একটি স্বীকৃত নিকট দূরত্বের মধ্যে (সর্বোচ্চ তা এক বিঘা পর্যন্ত হয়) ফেলতে পারে, তাহলে প্রথম খেলোয়াড়কে সবগুলো শীমের বীচি দিয়ে দিতে হয়। আর যদি দ্বিতীয় খেলোয়াড় প্রথম খেলোয়াড়ের চাড়াটিকে খেতে রাজি না হয়, তখন প্রথম খেলোয়াড়কে

ঘরে ফিরে আসতে হয় অর্থাৎ চাড়াটিকে ঘরের ভেতর ফেলতে পারতে হয়। তখন সে যদি ফিরে আসতে ব্যর্থ হয় তখন তাকেও ২য় পক্ষের ধরা নির্দিষ্ট পরিমাণ শীমের বীচি জরিমানা গুণতে হয়। এভাবে একজনের পর একজন চাড়া মারার সুযোগ পায়। এই খেলার একটি অন্যতম কৌশল এই যে প্রত্যেকেই চায় চাড়াটিকে একটু অসমান, উঁচু নিচু জায়গায় মারতে, যাতে দ্বিতীয় পক্ষ চাড়াটিকে খেতে গেলে নাড়া খেয়ে চাড়াটি দূরে চলে যায় এবং লক্ষভ্রষ্ট হয়। যার হাত যত সই সে এ খেলায় তত ভাল করে থাকে। দেখা যায় দক্ষ খেলোযাড় একসময় তার প্রতিপক্ষেও সমস্ত শীমের বীচি নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অপরপক্ষকে এভাবে হারিয়ে দেওয়ার নাম 'কুইত' করা অর্থাৎ সর্বস্বান্ত করা। এ খেলায় শীমের বীচির মতো প্রত্যক্ষ কোনো খাদ্য বস্তু পাওয়া যায় বলে শিশু কিশোরদের মধ্যে এ খেলার আলাদা আবেদন আছে।

১৬. ইচিং বিচিং

এটি একটি দলগত খেলা। বিনোদনের উদ্দেশ্যেই কিশোর কিশোরীরা এ খেলা খেলে থাকে। ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমে খেলাটি শেষ হয়। মানুষের শরীরের বিশেষ কৌশল ছাড়া এ খেলায় আর কোনো উপকরণ লাগে না। এটি চান্স বা সুযোগের খেলা।

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একত্রে খেলে। প্রথমে একজন রাজা হয়। রাজাকে ঘিরে সবাই চক্রাকারে মাটিতে বসে। সকলের হাত উপুড় করে মাটিতে রাখা হয়। রাজা ইচিং বিচিং চিচিং চা/প্রজাপতি উড়ে যা ছড়াটি উচ্চারণ করে সকলের হাত স্পর্শ করে যেতে থাকে। সকলেরই লক্ষ থাকে ছড়ার শেষ শব্দটি কার হাতে গিয়ে শেষ হয়। যার হাতে ছড়ার শেষ শব্দ পড়ে সে হাত তুলে পেটের ভাঁজে গরম করে। এভাবে ছড়া কেটে কেটে সব খেলোয়াড়ের পালা শেষ করা হয়। সবশেষে রাজা হাত পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করে যার হাত ঠাণ্ডা পাওয়া যায় সে চোর হয়। এ চোর হওয়া বেশ অপমানজনক। আবার কোন কোন সময় শেষ শব্দ পাওয়া লোকে রাজা বানানোর নিয়ম রয়েছে। তখন এই নতুন রাজা আবার ছড়া কাটার সুযোগ পায়।

১৭. ছক্কা

এ খেলার জন্য মাটিতে দাগ কেটে ঘর বানানো ছক্কার ঘর তৈরি করা হয়। ছয় থেকেই ছক্কা কথাটি হয়েছে এ খেলা দুইজনে খেলে। প্রথমে নিজ ঘরে ঘুটি বসানো হয়। তারপর ঘুটি চালার পালা। কৌশলমতো প্রতিপক্ষের একটি ঘুটিকে লাফ দিয়ে অতিক্রম করার সুযোগ আসলে সে ঘুটি তুলে নেয়। এভাবে প্রতিপক্ষের সব কয়টি ঘুটি খেতে পারলে এক গেম হয়।

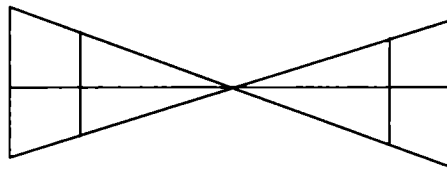

ছক্কা খেলার ছক

১৮. চোর পুলিশ

এ খেলায় চারজন লোক লাগে। ছেলে মেয়েরা একত্রে এ খেলা খেলতে পারে। এ খেলার উপকরণ হিসেবে কাগজ ও কলম সাথে রাখতে হয়। এ খেলার মাধ্যমে অবসর বিনোদন ও গণিত শিক্ষা লাভ করা যায়। এটি সাধারণত একটি ইনডোর গেম।

প্রথমে চার টুকরো কাগজে বাবু দারোয়ান, পুলিশ চোর লেখা হয়। অপর একটি খাতায় রুল টেনে প্রত্যেকের নামে চারটি ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরে প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর বসানো হবে। প্রত্যেকের পয়েন্ট আগেই নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত বাবু-৯০, দারোয়ান-৬০, পুলিশ-৫০ ও চোর-০ পয়েন্ট ধরা হয়। তারপর নাম লেখা কাগজের টুকরো চারটি লটারির উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। যে দারোগা পায় তাকে বলতে হয় পুলিশ কে হ্যায়? তখন যে পুলিশ পেয়েছে সে বলে আমি আমি হ্যায়। দারোগা তখন নির্দেশ দেয় চোরকে বন্দী করো। তখন পুলিশকে অজানা বাবু ও চোর থেকে চোরকে শনাক্ত করতে হয়। পুলিশ যদি চোরকে শনাক্ত করতে সমর্থ হয় তাহলে চোর-০ পয়েন্ট পায়। আর যদি পুলিশ চোর শনাক্ত করতে না পারে তাহলে পুলিশের নির্ধারিত ৫০ পয়েন্ট পায় চোর এবং পুলিশ পায় ০ পয়েন্ট। তখন একজন খাতায় সকলের পয়েন্ট লিখে রাখে। খেলা শেষে সকলের পয়েন্ট যোগ করে যার পয়েন্ট বেশি হয় সে হয় প্রথম। খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়ের মেধাক্রম নির্ধারিত হয় এভাবে-ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, লাট। সাধারণত লাট হওয়া লোককে অন্যদের অপবাদ শুনতে হয়।

এ খেলায় যারা পুলিশ ও চোর পায় তারাই ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বাবু ও দারোয়ান হতে পারলে কোন ঝুঁকি থাকে না। যে বেশি বার বাবু পায় সচরাচর সেই পয়েন্টে এগিয়ে থাকে এবং প্রথম হয়। অবসর কাটানোর একটি অন্যতম আয়োজন আসর হলো এ খেলা।

১৯. পলান্তি

একে লুকপলানি, লুকোচুরি ও কুলুক খেলাও বলা হয়। এটি ৮/১০ জন ছেলেমেয়ে মিলিতভাবে খেলে। এ খেলায় একজন অন্য সবাইকে খুঁজে বের করে। তাই এতে গোয়েন্দাগিরি একটি ভাব রয়েছে।

খেলার শুরুতে একজনকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। চোরের দায়িত্ব হয় লুকিয়ে থাকা অন্য খেলোয়াড়দের খুজে বের করা। চোরকে সব খেলোয়াড়দের কথামতো একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বিশ্বস্তভাবে অবস্থান নিতে হয় যাতে অন্যরা কোথায় লুকায় তা যেন সে জানতে না পারে বা দেখতে না পায়।

পলানো বা লুকানো শেষ হলে তারা কুলক বলে আওয়াজ দেয়। তখন চোর তাদের বের করতে যায়। যে ধরা পড়ে যায় সেও তখন চোরের সঙ্গে আত্মগোপনকারীকে ধরার অভিযানে শামিল হয়। একে একে সবাই ধরা পড়লে খেলা শেষ হয়।

এ খেলায় আত্মগোপন ও আত্মগোপনকারীকে ধরার আনন্দ নিহিত রয়েছে। এ খেলাটি বর্হিবিশ্বে Hide and Seek নামে প্রচলিত আছে। সে হিসেবে খেলাটির একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি রয়েছে। আমাদের দেশে কোথাও কোথাও বিয়ের বাসর ঘরে বর বধূকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার নিয়ম রয়েছে।

নাঙ্গলকোট উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এখানে যেসব লোকজ খেলার সন্ধান পাওয়া গেছে এগুলোকে প্রধান চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো,

শারীরিক পরিশ্রম সাধ্য খেলা : হা-ডু-ডু, বউছি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়া বান্দা, ডাংগুলি, গাউচ্ছা গাউচ্ছা ইত্যাদি। এ খেলাগুলো সাধারণত ছেলেরাই খেলে থাকে।

আনন্দদায়ক পরিশ্রমবিহীন খেলা : ষোল ঘুটি, বাঘবন্দী, কানামাছি, রুমালচুরি, কড়ি, বউরাণী, পুতুল, ইত্যাদি। এগুলো মেয়েদের খেলা।

ছড়া ও ধাঁধার খেলা : এ খেলার মাত্রাটাই এখানে বেশি। সাধারণ স্কুলগামী শিশুরাই খেলে এসব খেলা। স্কুলের আঙিনায় ছোট খেলার মাঠটিই হয়ে ওঠে তাদের মিলন মেলা। দলবেঁধে, জুটি বেঁধে এরা এসব খেলা খেলে। কখনো বা ক্লাসের ফাঁকে টিফিনের সময়ে কিংবা ছুটির দিনে প্রতিটি বাড়ির উঠোন বা ছাড়াবাড়ি তাদের আনন্দ দায়ক খেলায় মুখর হয়ে উঠে। এসব খেলার মূল আনন্দের বীজটি নিহিত আছে ছড়া ও ধাঁধার মধ্যে। সেখানে জীবনের নানা অঙ্ক আছে। এ অঙ্ক ও খুব সহজ। ছড়া ও ধাঁধার খেলাগুলোর নিয়ম সর্বত্র প্রায় এক শুধু বলার ভাষায় একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এর কারণ আঞ্চলিকতার প্রয়োগ। ছড়া ও ধাঁধার খেলার মধ্যে আছে আগুডুম বাগডুম, ইকরি মিকড়ি, রাজার কোটাল, ব্যাঙের মাথা ইত্যাদি।

২০. পানির খেলা

পানির খেলা মূলত একটাই সর্বত্র দেখা যায়। আর তা হল লাই। আর আছে তইতই, পানি ঝুপ্পা বা জলছিটানো।

এছাড়া, বিয়া বিয়া, রান্নাবাটি, কাঁদামাখা, মুরগির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো, ইত্যাদি খেলা প্রচলিত আছে। বিয়া বিয়া, রান্নাবাটি, কাঁদামাখা, ব্যাঙের লাফ এগুলো কোমলমতি বাচ্চাদের নিজস্ব খেলা। উপরে বর্ণিত সবগুলো খেলাই নাঙ্গলকোটের প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান হয়। বিকালে প্রতিটি গ্রামের আশে পাশে যখন মাঠ খালি থাকে বা ধান ঘরে উঠে যায় তখন জমে উঠে শিশু কিশোরদের নানামুখি আয়োজন। বিয়া বিয়া খেলা হলো বিয়ে নিয়ে খেলা। এখানে উপাদান শিশু নয়, উপাদান হলো খেলার ইচ্ছা আর আগ্রহের। বাচ্চা ও শিশুরা অনেক অর্থহীন খেলাই খেলে থাকে। কোন বাড়িতে গাছ কাটা হলে এবং চারিদিক ডালপালা ছড়িয়ে থাকলেও তা শিশুদের খেলার উপকরণ হয়ে ওঠে। এমনকি পুতুল বিয়ে উপলক্ষে জোলাভাতি বা সামাজিক আচার বিচারের আয়োজন হয়।

নিচে এসব বিষয়ের উপর প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হল। বলা আবশ্যক এ তথ্যগুলো সংগ্রহে আমি ২টি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। ১। প্রশ্নোত্তর ২। স্বাধীন মতামত। যারা আমাকে তথ্যগুলো সরবরাহ করেছে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকেই তা দেবার চেষ্টা করেছে। শ্লোক, গীত, ধাঁধা খেলার নাম, বোল, নকীশ কাঁথা, পিঠা, লোকচিকিৎসা কোনটা অভিন্ন থাকলেও প্রত্যেকের তথ্যে নতুনত্ব ছিল। কোনটাতে আবার আঞ্চলিকতার সুর পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ তারা যে উপভাষা ব্যবহার করে। তথ্য সরবরাহে তারা উপভাষাই ব্যবহার করেছে। এতে এগুলো অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে। আমি একজন সংগ্রাহক তাই আমি মনে করি তাদের প্রদত্ত ভাষার ব্যবহার ও

উপস্থাপন পরিবর্তন করার অর্থ হবে কিছুটা অন্যায়। আমি কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি এর একটি নমুনা স্বাক্ষাৎকার (এখানে বলা আবশ্যক আমাকে বাংলা একাডেমি থেকে ফোন করে বলা হয়েছিল আমি যেন সাক্ষাৎকার পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ করি। আমি সেদিকে দৃষ্টি দেবার আগে সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরেছি।)

তথ্যসূত্র : হাজেরা আক্তার স্বপ্না, পিতা-আব্দুল কুদ্দুস, মদনপুর, নাঙ্গলকোট

সংগ্রাহক : কী নাম তোমার?

স্বপ্না : স্বপ্না, পূর্ণনাম : হাজেরা আক্তার স্বপ্না।

সংগ্রাহক : আমাকে কিছু তথ্য দিবে?

স্বপ্না : বলুন।

সংগ্রাহক : এখানে লোকজ ধারার কী খেলা হয়?

স্বপ্না : বৌছি, কিতকিত (কুতকুত) সিট মাটির বউ। শিলপাসা, গাইদান, পলাপলি (লুকোচুরি) পুতুল বিয়ে কানামাছি রাজা রাণী ইত্যাদি।

সংগ্রাহক : সব খেলা কী হয় এখনো?

স্বপ্না : শিলপাসা, সিট মাটির বউ, গাইদান (গাইগোদানী) ডাণ্ডাকুলুক এ খেলাগুলো আমরা খেলতাম, এখনকার ছেলেমেয়েদের খেলতে দেখিনা।

সংগ্রাহক : এখন কী কী খেলা হয়, সেটাই জানতে চাইছি?

স্বপ্না : চেয়ার, বালিশ, রুমালচুরি, পলাপলি, বৌছি, জুতাচুরি, ঝুমুর ঝুমুর জোড়-বিজোড় কুতকুত।

সংগ্রাহক : কী কী পিঠা বানানো হয়?

স্বপ্না : আল মেলিয়া পিঠা, সাকুর পিঠা, চমচম পিঠা, চটকা পিঠা, চামিচ কাটা ইত্যাদি।

সংগ্রাহক : কিছু খেলার বোল বলতে পার?

স্বপ্না : পারি।

সংগ্রাহক : আচ্ছা তুমি নিজেই লিখে দাও। তবে তোমাদের আঞ্চলিক ভাষায়।

স্বপ্না : ঠিক আছে।

আর শোন এগুলো কারো কাছ থেকে নিয়োনা। নিজে যেগুলো জানো পারো শুধু সেগুলোই লিখবে।

আচ্ছা।

এরপর স্বপ্না আমাকে যে তথ্য দিল তা নিম্নরূপ,

১. উত্তর হাতরে গেছিলাম
বাঁশ ও কাটিলাম।
বাঁশের নাই আগা দূর হ বগা।

২. ঝিউ ঝিউ মালারে
হেয়ালা সাউতাম গেলামরে
কাটা হুই মইললাম রে

কাটা দিল সুলানি
বইয়া দিল দুয়ানি
কালার মার ভাঙ্গা ঘর
ঝাঁপ দি হই বগা ধর।

৩, নাইগোল হাতা চিরুনি
বো আইছে হিরুনি
কিগো বো কান্দছ কা
সোকা আরে মাইচ্ছেকা
কিরে সোকা মারচ কা
বোর এত চবা কা
চোরার উদ্দি দোফা দিমু
বার বাইত হাডাই দিমু
বার বাইত কদম গাছ
কাইটে কাইটে বার মাস।

৪. বোগো বো উঠ ঘর দুয়ার কুড়ো
ঘরের ভিতরে তালতো বইন
তালতো বইন সুন্দরি
খোপা বান্দে গোল করি
খোপার ভিতরে শাপলা ফুল
এক্কে ডুবে নদীর কুল।
উত্তর হাতরে গরু বাইন ছি।
দুলা গেছে চাইত
হাত বছরগা মাইয়া কান্দে
দুলার লগে যাইত
দুলা কয় কে রে
পালকি সাজাই দেরে
পালকি নিব কোনান্দি
মেন্দি গাছের তলে দি
মেন্দি গাছের পাতা নাই
ভাবির সাথে কথা নাই।

৫. নানুগো নানু উঠ, কই মাছ কুটো
কই মাছ লড়ে চড়ে, আমার নানু খেলনা করে
খেলনা বাগানে যাইও না
একটি ফুল ছিড়ও না
ভালবাসা কর না।

৬. মাগো মা কিয়াগো
বড্ডা আপুর লম্পা চুল

আশে পাশে গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের গন্ধে
দুলা আইয়ে আনন্দে
দুলারা সাত ভাই
মিষ্টি আইনতো মনে নাই।

৭. আকাশেতে তিনটি তারা
ঝিকিমিকি করে
শাবনূর মেয়েরা কুতকুত খেলে
ও ডিস্কু ভাবি
পিঠা বানাতে যাবি
পিঠা নিল চোরে
চোরে চোরে হেভেল
পায়ে আছে সেন্টেল
হাতে আছে ঘড়ি
যাব শ্বশুর বাড়ি
আম পড়ে টাপুস টুপুস
রস পড়ে বাড়াইয়া
ঈসমাইল পাগল অইছে
লাকিরে লইয়া
লাকির ভিতরে পাখির বাসা
লাকি করে ভালবাসা।

৮. টাইয়ারে টাকুটুকু টাইয়ারে টা
টাইয়া কামড় দিলে মানুষ বাঁচে না
টাই টুই ভগবান
কুড়ালে কাঠিল ঠ্যাং
সইল্লা হাতা আগুন দিলে
ছিচছিড়াইয়া দেয়
কোন হলাগো বাপ বলাইবি
আমার পিছে পিছে আয়।
নাইগোল হাতা চিরুনি
বৌ আইছে হিরুনি
কিগো বো কান্দছ কা
খোকা আরে মাইচ্ছে কা
কিরে খোকা মারছ কিল্লাই
বৌর এত চোবা কা
চোবার উদ্ধি ধোপা দিমু

বার বাইত ঠাডাই দিমু
বার বাইত কদম গাছ
কাইট্টে কাইট্টে বার মাস।

৯. মাগো মা কিয়াগো
বড্ডা আপুর বিয়াগে
বড্ডা আপুর লম্বা চুল
আশে পাশে গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলের গন্ধে
দুলা আইয়ে আনন্দে
দুলারা সাত ভাই
মিষ্টি আইনতো মনে নাই
ও দুলাভাই টা টা
আন্নে লগে কথা আছে রাইতের বারোটা।

১০. আমার একটা মুরগি ছিল
হঠাৎ করে মারা গেল
হায় আল্লাহ কী হলো
ধান থেকে চাল হল
দু'ধের ভিতর মাছি
কোদাল দিয়ে চাচ্ছি
কোদাল হল বেঁকা
স্বামী স্ত্রীর দেখা।

বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত বোল

১. মালা গো মালা
আমরা সবাই খেলা
উঠ গো উঠ
চোখের পানি মোছ
হাতে কী?
কমলা
খাওনা কেন?
চুকা লাগে,
ফালাও না কেন?
মায়া লাগে
এখন তুমি কাকে পছন্দ কর?
তোমাকে।
তথ্যসূত্র : স্বরমিতা কর্মকার, দেশওয়ালী পট্টি, কুমিল্লা

২. একে ইন্দুর
দুই এ বিন্দু
চারে চাচি

পাঁচে পেঁচা
ছয়ে ছেচা
সাতে সাথী আটে আংটি
নয় এ নদী
দশে দধি।
তথ্যসূত্র : সীমা, বল্লভপুর, কোটবাড়ি

৩. আতুইরা বিলাই ধইরা কিলাই
বিলাই করে মিয়াও মিয়াও
তথ্যসূত্র : অদ্রি ভৌমিক, গোয়ালপট্টি

৪. আমার চুলের আগা নাই,
শেম্পু দিতাম মনে নাই।
তথ্যসূত্র : স্বর্ণালী পাল, রাজগঞ্জ, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী

৫. আমার চুলের আগা আছে
শেম্পু দিতাম মনে আছে।
তথ্যসূত্র : এপি মনি, চাঁনপুর

৬. ব্যাঙ্গের মাথা খেলার একটি সংলাপধর্মী ছড়া

এক কথা	কী নীল?
কী কথা?	আগা নীল
ব্যাঙের মাথা	কী আগা?
কী ব্যাঙ	বকের পাখা?
সরু ব্যাঙ	কী বক?
কী সরু	কানি বক?
বামন গরু	কী কানি
কী বামন	ধান ভানি
হাটের বামন	কী ধান?
কি হাঁট	অবিশ ধান।
গোড়ার/গরুর হাঁট	কী কাউ।
কী গরু/কি ঘোড়া	.....খাও।
নীল ঘোড়া।	

আমাদের শিশুরা ডাংগুলি খেলা আবিষ্কার করেছিল কবে এর সঠিক ইতিহাস জানা যায়না। তবে প্রাচীন কাল থেকেই যে এ খেলাটি এদেশে প্রচলিত ছিল এর স্বপক্ষে একমাত্র প্রমাণ সত্তর হাজার গ্রামের মানুষ এ খেলাটি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত। গ্রাম বাংলার খেলাগুলোকে আমরা বেশ ক'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। এতে কোন খেলার কী অবস্থা বর্তমানে আছে তা ভালভাবে জানা যাবে। এগুলো হল,

১. ঘরের খেলা : তিনঘুঁটি, চারঘুঁটি, ষোলঘুঁটি, পুতুল।
২. গলির খেলা : ডাংগুলি, কুতকুত, রান্নাবাটি, বউজামাই কানামাছি,

৩. মাঠের খেলা : দাড়িয়াবাধা, গোল্লাছুট, বউছি, হা-ডু-ডু, ঘুড়ি ওড়ানো।

৪. পানির খেলা : লাই

প্রথম ঘরানার খেলাগুলো এখনো গ্রাম বাংলায় আংশিকভাবে টিকে আছে। কর্মের আসরে নারী ও পুরুষরা এখনো সুযোগ পেলে ষোলঘুঁটি খেলে। অবশ্য এস্থানে এখন যোগ হয়েছে লুডু, দাবা বা সাপলুডু। পুতুল বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরীদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। আগে মাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে এদের রং বেরং এর কাপড় পরিয়ে শিশু কিশোররা খেলত। এখনো কেউ কেউ বানায়। তবে এ স্থানটা এখন দখল করেছে প্লাস্টিক বা কাপড়ের তৈরি পুতুল।

দ্বিতীয় ঘরানার সবগুলো খেলাই এখনো গ্রাম বাংলায় আছে। পড়াশোনার বাড়তি চাপ, আধুনিক বিনোদন মাধ্যম টেলিভিশনের কল্যাণে শতশত চ্যানেলের নানামুখি অনুষ্ঠান এসব খেলা থেকে ছেলেমেয়েদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। বুড়িচং এর প্রত্যন্ত গ্রামেও এখন পৌঁছে গেছে ডিস এন্টেনা, ভিডিও গেম। তাই এখনকার ছেলেমেয়েরা এসব খেলার নাম বলতে পারলেও খেলার কথা স্বীকার করেনি অর্থাৎ তারা জানে এসব খেলার নাম কিন্তু নিজে খেলেনি বা খেলার আগ্রহ পায়নি। তৃতীয় ঘরানার খেলাগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়াবাঁধা বিলুপ্তির পথে। হা-ডু-ডু খেলা নিয়মতি হয়না। শীতকালে কোন কোন এলাকায় আনুষ্ঠানিক হা-ডু-ডু খেলা হয়। এক সময় যে খেলা হতো প্রায় প্রতিটি জনপদে এখন তা হয় মাইকিং করে সন্ধ্যার পর লাইট জ্বালিয়ে বিবাহিত-বিবাহিত, অবিবাহিত-অবিবাহিত, বিবাহিত-অবিবাহিত এইভাবে। এ জন্য-পুরস্কার থাকে। গোল্লাছুট খেলার প্রচলন আছে সর্বত্রই। গ্রামে মাঠের অভাব নেই। বিকালে কিছু ছেলে মেয়ে একসাথে জড়ো হলেই গোল্লাছুট বা বউছি খেলার আসর জমে। গোল্লাছুট ছেলেদের খেলা আর বউছি মেয়েদের। যেসব বাড়ির আশেপাশে খোলা জায়গা আছে, মেয়েরা বউছি খেলার জন্য তাই বেছে নেয়। আগে উঠানে খেলত কিন্তু গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারগুলো বেড়ে যাওয়ায় ঠাসাঠাসা ঘরবাড়ি খেলার স্থানটুকু ও কেড়ে নিয়েছে। যেটুকু খালিস্থান তারা পাচ্ছে তাতেই মনের আনন্দে খেলার আয়োজন করছে। তবে এসব খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ কম। কেউ কেউ দেখতেই পছন্দ করে ২/১ জনকে প্রশ্ন করলাম তোমরা খেলনা কেন? এদের সরল উত্তর ভাল লাগে না। এ ছাড়া গ্রামের মুরব্বীরা নানা রকম সমালোচনা করে।

ঘুড়ি ওড়ানোর অভ্যাস আছে কিন্তু তা কম ছেলেদের মধ্যেই। কেউ কেউ এ ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী। ঘুড়ি কাটাকাটির খেলাতেই তারা আনন্দ পায় তাই এক সময়ের নানা নামের ঘুড়ি এখন সবার কাছেই অতীত। ঢাউশ ঘুড়ি নাম তারা শোনেনি বা দেখেওনি ঘুড়ি ওড়ানোর অভ্যাসটাও হয়তো একসময় নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ছেলে মেয়েরা এখন শারীরিক ব্যায়াম হয় এমন কোন খেলাই খেলতে অভ্যস্ত নয়। কিছু কিছু ছেলে আধুনিক যুগের ফুটবল বা ক্রিকেট খেলায় আগ্রহ দেখালেও ওখানেও অনেকেই নিয়মিত নয়।

চতুর্থ ঘরানার খেলা লাই, নামে মাত্র টিকে আছে। ছেলে মেয়েদের এ প্রসঙ্গ বক্তব্য খেলার মত পুকুর নাই। সব পুকুরেই এখন মাছ চাষ হয় তাই খেলতে গেলে বাধাঁ আসে। বুড়িচং উপজেলা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন খেলার ডাক বা বোল,

১. আম গাছের গামছা
দেখ তার তামসা।

২. অল (ওলো) বইন সকিনা
তিন দিন ধইরা দেখিনা
তিনদিনের জ্বরে
মাথা ব্যথা করে।
৩. বাঁশ পাতা নড়ে চড়ে
সীমার কথা মনে পড়ে।
৪. চি কুতকুত নারে নারে
ঘন্টা বাজে বারে বারে
ঘন্টার সুরে
মৌমাছি উড়ে।
৫. ঝিম চু চিক্কা
কারে দেব ভিক্ষা।
৬. ঝিমাকা ঝিমা রাণী
কলসী লইয়া টানাটানি।
৭. এক টাকা চানাচুর
বাড়ি আমার যাত্রাপুর।
৮. এক টাকা চানাচুর আমার বাড়ি বুড়িচং।
৯. ঝিমুচ চাচ্চা, মুরগির বাচ্চা।

উপরে প্রদত্ত বোলগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেকের নিকট থেকেই জিজ্ঞাসা করে তাদের বলার ঢং এ লেখা হয়েছে। এরা এ বোলগুলো ব্যবহার করে ঢাকাইয়া পাঞ্জা কুত কুত খেলায়। খেলাটিতে যে ঘর ব্যবহার করা হয় তা দেখানো হল,

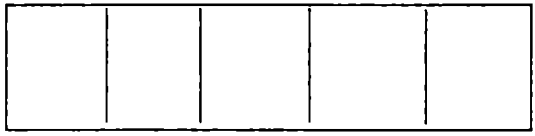

কুতকুত খেলার ঘর

মোট ৫টি ঘর ২ পাশে মাঝে লম্বা রেখা টানা। খেলার জন্য ব্যবহার করে পাতিল ভাঁঙ্গা ঘরের স্থানীয় নাম 'চাড়া' ছোট ছেলে মেয়ে ও তরুণীদের আরেকটি প্রিয় খেলা চার গুঁটি বা চার ঘর খেলা। এর এ খেলার জন্য একটি ঘর ব্যবহার করে এবং মুখে সুর করে নিচের ছড়াকাটে।

খেলায় ব্যবহৃত ডাক বা বুলি

১. ইচিং বিচিং চিং (চিচিং) চা
প্রজাপতি উড়ে যা।
২. ছোট ছোট পুথি (মূলত পূতি)
বড় মালা গেথি
বড় বড় পুথি
ছোট মালা গেথি।

৩. আতুরা বিলাই, ল্যাংড়া বিলাই
ধইরা কিলাই।
৪. আমার কানের লতি নাই
জিনিস দিতাম মনে নাই।
৫. ঘরের ভিতর আলমারি
দুপ্পুর দুপ্পুর কিলমারি।
৬. চালন্তি চাইল্লা যাই,
বলন্তি বইলা, যাই।
৭. চি-কুত নাইয়া
বাবুলের মাইয়া
বাবুলে কান্দে
কাঁচা কলা খাইয়া

এখানে নাম ও ফলের নামটি একেক জন একেক ভাবে ব্যবহার করে কিন্তু বলার সুরটি একই থাকে। যেমন,

চি কুত নাইয়া
সুরেণের মাইয়া
সুরেণে কান্দে
পঁচা কলা খাইয়া

তারা নামগুলোকে কখনো বিকৃতভাবেও ব্যবহার করে। আর অপরকে উসকে দেয়ার জন্য পচাঁ কলা, পচাঁ আপেল পেয়ারা পঁচা ডিম কথাগুলো যোগ করে দেয়।

৮. ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা,
ইচিং বিচিং চিচিং চা
বেগুন বাজি (ভাজি) চড়চড়া।
৯. প্রথম ছি দিয়া গেলাম
বউয়েরে দেইখ্যা গেলাম
পাঁচশ টাকা দিয়া গেলাম
পান বিড়ি খাইয়া গেলাম।
১০. ডিংগি নৌকা ঠেলতে ঠেলতে
লইয়া যা, লইয়া যা--
১১. শিরি একটা বিড়ি দে
আগুনটা জ্বালাই দে
একটা টান খাইয়া দে।
১২. ডেগ ডেগ ডেগের কালি
ডেগটা আমার সর্বনাশী
১৩. এক কলমে লেখাপড়া
দুই কলমে কালি

আছমা তুমি স্বীকার কর
বাবুল তোমার স্বামী।

১৪. তেজপাতা তেলনা
গোলাপ ফুলের বাসনা
বন্ধু কেন এসনা।

১৫. আতুইরা বিলাই ল্যাংড়া বিলাই
বাজারে নিয়া বেইচ্চা হালাই। (ফালাই)

১৬. এ বিনটি বাক্স
নাইন টেন টেক্স
সুলতানা বেবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
সাহেব বলেন যাইতে
পান সুপারি খাইতে
পানের আগাত মরিচ বাটা
স্পিনিং এর ছবি আঁকা
যার নাম রেণুমালা
গলায় দিমু মুক্তার মালা।

এ ছড়াটা বুড়িচং এ ৪/৫ ঘরানায় বলতে শোনা গেছে। এটা কোথাও ওপেনটি বাইস্কোপ নাইনটেন টেলিস্কোপ, আবার কোথাও তেইসস্কোপ আছে। দ্বিতীয় পরিবর্তন

সুলতানা বেবিয়ানা চুলটানা বিবিয়ানা
স্পিনিং এর ছবি আঁক ইসপিরিং এর ছবি আঁকা
ইসপিরিং এর ছবি আটা
ইসপিরিং এর ছবি টানা।

বস্তুত বলার ঢং এ ব্যতিক্রম ঘটলেও বুলি দিতে কোন বাঁধা আসেনা বা তারা কী বলল তা নিয়ে তাদের ভাবনা কম, খেলাটাই মুখ্য। দম থাকলেই হল। শব্দটা ঠিক হল কিনা বা এতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটল কিনা শিশু মনে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

১৭. একে ধাতু
দুইয়ে ডাব্লিউ
তিন ইতামিতা
চাইরে ঘোরা মোরা
পাঁচ এ কদমতুলিত, (ঝুমকা তুলি কদম তুলি ও বলা হয়)
ছয় এ স্লিপ কাটি
সাতে সাত্তামাথা বনবন করে আটে আসেন্ত দুলাভাই বসেন্ত চেকারে।

১৮. শরবত খাইতে কী কী লাগে
টিপকলের পানি লাগে দোকানের চিনি লাগে,
বাগানের লেবু লাগে,
বড় ভাবির হাত লাগে, ছোট ভাবির গ্লাস লাগে,
তাইতো শরবত ভাল লাগে।

১৯. ঝিমছু আম চিনিয়া বাদাম
ঝিমছু আচ্ছা, কইতরের (কবুতরের) বাচ্চা।

২০. আলু বাজি (ভাজি) টকটক
মাছ ভাজি কটকট।

২১. আম গাছ গামছা
দেখব বুবুর তামসা।

২২. ঝিনিপুক (ঝিঁঝি পোক) তুই ঘরতে বারো। (বের ২)

২৩. জিংলা কাটা মদিনা
ওলো বোন সকিনা
তিন দিন দেখিনা
তিন দিনের জ্বরে
মাথা ব্যথা করে
আব্বু জান আম্মু জান
পুতুল কিনে দিয়ে যান
পুতুলের মাথায় প্রজাপতি
ভাবির বিয়ে গোরস্থান।

২৪. ছি কুত কুত নারে নারে
বকুল ডাকে বারে বারে।

Note : এ বোলটি পাঁচঘর খেলার ৪নং বোলের সুরের মতই কিন্তু এখানে 'বকুল' ব্যবহারের কারণ বোঝা গেল না। যাদের জিজ্ঞাসা করলাম তারা বলল, বকুল, কোকিল, দু'টি শব্দই প্রচলিত। খেলার সময় মুখে যা আসে তাই তারা বলে।

২৫. টুনটুনি গো পাখি
নাচতো দেখি
না বাবা নাচবো না
পড়ে গেলে বাঁচবো না
বড় আপুর বিয়ে
কসকু (কসকো) সাবান দিয়ে
কসকু সাবান ভাল না
বড় আপার বিয়ে হল না।

২৬. আকাশের তিন তারা
আমার নাম জাহেনারা (জাহেনারা)
আমি কি জানি-ঠাণ্ডা লেবুর পানি।

২৭. মালা গো মালা
আমরা সবাই খেলা
উঠগো উঠ চোখের পানি মুছ
হাতে কী? কমলা
খাওনা কেন? চুকা লাগে
ফালাওনা কেন? মায়া লাগে
এখন তুমি কাকে পছন্দ কর
তোমাকে (জেসমিন, রুমা, গ্রাম : মিথলমা)

এটা একটা মেয়েলি খেলা। পাঁচজন তিন জনে বা সাত হলে হাত ধরে গোল করে খেলাটি খেলে। মধ্যে একজন থাকে। সে মূলত চোর। সে থাকবে একটা গোল চিহ্নের মধ্যে। সে ঐ বৃত্তের মধ্য থেকে যাকে ধরতে পারবে সে হবে নতুন চোর এভাবেই খেলাটা চলতে থাকবে।

২৮. দুইটি মেয়ে হাত উপরে তুলে নিচের ছড়া কাটতে কাটতে একটি খেলা খেলে। এ খেলাতেও ৫/৬ হলের একটা দল চারদিকে ঘুরতে থাকে। ছড়া কাটা শেষ হলে যে হাত আগে নিচে নামাবে সে মুক্ত অপর জন তখন চোর। এরূপ যেসব ছড়া তারা ব্যবহার করে তা নিচে দেয়া হল–

২৯. আপেল শক্ত বেদনার রক্ত
হ্যালো হ্যালো কী যে হল?
ছেলে হল।
ছেলের নাম কী,
তেলে ভাজা নিমকি
বড় ভাইয়ের বউগো
বিছানা পাটি তুলগো
বিছনার ভিতরে দুরা সাফ
লাফ দিয়া যায় কুমোর পাঠ।

৩০. আই এম ছরি, দুইকানে দরি (ধরি)
লম্পা লম্পা (লম্বা লম্বা) দাড়ি,
চিকন চিকন মোছ (মোচ) তুই আমার দোস্ত,
আমার বাবা অফিসার
আমার মা ডাক্তার
আমার বোন কাল নাগিনী
আমার ভাই, ডিসিম ডিসিম
(তুহিনা, মিথলমা)
তথ্যসূত্র : জেসমিন, মিলমা

লোকখেলার আরো অনেক উপাদান এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নিমসার বাজার থেকে ১ মাইল পশ্চিমে গিয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তরে একটি গ্রাম আছে যার নাম মনঘাটা সেখানে যাবার পথে দেখা হল কয়েকটি বাচ্চা ছেলে জটলা পাকাচ্ছে। আমার হাতে ক্যামেরা নেই। তবু ভাবলাম একটু নামি। নেমে দেখলাম তারা মার্বেল খেলছে। জিজ্ঞাসা করলাম তোমারা আর কী কী খেল? বাচ্চাগুলোর সোজা উত্তর রেডি, মারবেল হা-ডু-ডু কুস্তি জল্লা, লাই।

রেডি খেলা কী?

এ খেলার জন্য দরকার একটা কোনাইচ্চা ঘর, তারপর আট বা দশ জন মিলে খেলা যায়। খেলাতে ২টি দল থাকে। তাহলে এটা দাড়িয়াবান্ধা খেলাই হবে। ওরা বলল, আমরা (রেডি খেলাই বলি। কেন জল্লা, কুস্তি, লাই জল্লা নিয়ে খেলনা? ওরা বলল খেলি জল্লা হল বুলির খেলা এটা দাগ থাকে। দম নিয়ে এ খেলায় দাগ পার হইতে হয় কিন্তু নিয়মের বাইরে গেলে জল্লা, দুইজনের কুস্তি খেলা বহুদিন হয়না। লাই হয় কিন্তু পুকুর নাই। মেয়েরা খেলে না?

খেলে মেয়েদের প্রিয়খেলা দড়িলাফ, পুতুল, কুতকুত, পাঁচ কড়ি ষোলগুটি, তিন গুটি ইত্যাদি।

মেয়েরা নকশি কাঁথা বানায় না?

বানায় কম, এ কাঁথা বানাতে সময় লাগে প্রচুর তাই কেউ বানায় না। গেরামের মানুষ এখন ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন খেলে। অবশ্য অনেকেই আছেন যাদের খেলার ইচ্ছা থাকলেও সময় নেই। মেয়েরা বউছি পুতুল ও কানামাছিটা বেশি খেলে।

তোমাদের এখানে মনসা শীতলা পরমেশ্বর ব্রত হয় না? তাও হয়? সিজনাল অর্থাৎ ঋতুভিত্তিক শীতলা পূজা মানুষ করে চৈত্র মাসে ছেলে মেয়েরা মিলে চড়ুই ভাতি খেলে। এতে সবার চান্দা ধরা হয় বা মুষ্টি ভিক্ষা নেয়া হয়।

মুষ্টি ভিক্ষা কী?

যারা যারা জোলা ভাতি খেলবে তারা প্রত্যেকে নিজেদের ঘর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল আনবে। আর মাছ মাংস, মসলাপাতি কেনার জন্য দিতে হবে আলাদা টাকা। গাজীর পট আসেনা? আসে। তবে এখন খুব বেশি দেখা যায় না। কোন বছরতো দেখাই যায় না। বস্তুত এখানে যে বাচ্চাগুলো ছিল এদের অধিকাংশের বয়স সাত থেকে দশ। এরা আমার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কথা বলল। যে তথ্য তারা দিয়েছে তাতে মিথ্যা আছে বলে মনে হয় না। কারণ আমি প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তারা উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি শুধু তাদের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম আর বয়স। এদর মধ্যে ছিল কাসেম (১২) সুবল (১০) মাহিন (৮) জিতু ও (১০) লক্ষণ (৯)।

২১. ত্রিপুরা ক্রীড়া

পাহাড়ী এ আদিবাসীদের খেলাধুলায় আরণ্যক জীবনের ছায়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চু (লাটিম খেলা), শুকুই, ওয়াকরাই, ওয়াকরাই লাসা, ওয়াসলাই ইত্যাদি খেলা ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত আছে।

শুকুই খেলা : শুকুই শব্দের বাংলা হলো ঘিলা বা গিলা। লতাজাতীয় এ উদ্ভিদে শুকুই ফল (ঘিলা) উৎপন্ন হয়। এটি ১-২ হাত লম্বা হয়। এর বীজ দিয়ে এ দু'দলের মধ্যে শুকুই খেলা সংঘটিত হয়।

ওয়াকরাই : এ খেলায় জীবনে ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা পাওয়া যায়। এতে লাঠির সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বাঁশের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কসরৎ করা হয়।

ওয়াকরাই লাসা : এটি ত্রিপুরাদের একটি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলায় একপক্ষ বাঘ এবং অন্যপক্ষ শূকর সাজে। প্রতিদলে ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকে। একপক্ষ অন্যপক্ষকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারলে বাঘ হয়, আর হারলে হয় শূকর।

ওয়াসলাই : এটি শক্তিমত্তার খেলা। এই খেলায় দেড় দুই হাত লম্বা একটি বাঁশের দণ্ড প্রয়োজন হয়। মুখোমুখি দু'জন মাটিতে বসে একে অপরের পায়ের তালু সংযুক্ত করে শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। নিজের দিকে অপরকে নিয়ে আসতে পারলে জয় হয়।

লক্ষ করলে দেখা যায় প্রতিটি খেলার উপকরণই পাহাড়ে প্রাপ্ত বা উৎপন্ন বস্তু থেকে নেওয়া হয়েছে। শূকর পালনকারী ত্রিপুরা গোষ্ঠীর কাছে বাঘই শক্তি সামর্থ্য ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। তাদের জনজীবনধারার সাথে সম্পর্ক রেখেই খেলাগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

জীবন জীবিকার বাস্তবতা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল বৃত্তিমূলক পেশাজীবীর। যাঁদেরকে আমরা লোকপেশাজীবী হিসেবে জানি। লোকপেশাজীবী প্রথা আমাদের মানব সমাজের শুধুই প্রয়োজনই মেটায়নি. বিনোদনেরও পরিণতি এনে দিয়েছে।

কামারশালায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কামার/কর্মকার

১. কামার

কামার, কুমার, তাঁতী, ধোপা, মুচি, চিরায়ত গ্রাম বাংলার দৈনন্দিন লোকজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্পী। এদের বাদ দিয়ে আমাদের লোক সংস্কৃতি শূন্য। এছাড়া আছে বাঁশ ও বেত শিল্পী যারা বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো তৈরি করে হাজার বছর ধরে এ দেশের চাহিদা পূরণ করেছে। কুমিল্লা নয়, সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে এদের প্রয়োজন ছিল, আছে, থাকবে। অমর দা

আমাকে চকবাজারে অবস্থানরত শুভপুর, সংরাইশ ও শুভপুরের কামারদের তথ্য দেবার পর উল্লেখ করেছিলেন কামারদের উপর দেয়া এ তথ্যগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। কামার আছে কালীবাজার, নিকটবর্তী চৌয়ারা, চর্থা, বিবির বাজার, কালীবাজার, বামৈল বাজার, নন্দী বাজার প্রভৃতি স্থানেও। তবে এরা সরাসরি কর্মকার নয়। কেউ মালি, কেউ ধোপা বা অন্য কোন সমাজ থেকে আগত। তিনি যেসব নাম দিলেন এর সূত্রধরে আমি চিহ্নিত স্থানগুলোতে গেলাম। সেখানে যাদের কর্মরত অবস্থায় দেখতে পেলাম তাদের পরিচয় নিম্নরূপ, ১. নিখিল কর্মকার (৩৮), পিতা- চিন্তাহরণ কর্মকার, রাজাপাড়া। ইনি কাজ করেন উত্তর চর্থায় একটি দোকানে ২. চৌয়ারাতে কাজ করেন রঞ্জিত কর্মকার। ইনিও চিন্তাহরণ কর্মকারের বড় ছেলে। বয়স ৫০ বৎসর। ৩. বিমল চন্দ্র কর্মকার (৪৫), পিতা- মনমোহন কর্মকার, কালীরবাজার। ৪. তপন কর্মকার, কালীরবাজার, কুমিল্লা। বিমল বাবু কাজ করছিলেন আরেক বিমল চন্দ্র সরকারকে নিয়ে। ইনি এ কাজে আছেন ৭/৮ বছর। পরিবারটি জগদাসার, বরুড়া থেকে কালীরবাজারে অভিবাসী।

২. সওদাগর

মনোহরগঞ্জ উপজেলায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদেরকে সওদাগর বলা হয়। বেদে সম্প্রদায়েরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী তারা। ধর্মীয় বিচারে এরা মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী। মনোহরগঞ্জ বাজারের পশ্চিম পাশে কাজিমউদ্দিন মসজিদ পেরিয়ে পশ্চিম দিকে গেলেই তাদের এ বিশেষ পাড়াটি পাওয়া যায়। ডাকাতিয়া নদীর এ তীরে তাদের স্থায়ী বসবাস রয়েছে কয়েক পুরুষ ধরে। তারা নৌকায় বসবাস করে না বা সমতলে বাচাইড় (অস্থায়ী শেড) ভেতর থাকে না। তাদের বাড়িঘর আমাদের মতোই।

কথা বলি এ সম্প্রদায়ের ওসমান সওদাগরের সঙ্গে। বয়স ৪৫ এর ঘরে। তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি গ্রুপ আছে– যথা, সাপুড়ে- তারা সাপ নাচায়, সাপের খেলা দেখায়, শিকড়বাকড় বিক্রি করে, বাজারে বাচাইড় দিয়ে থাকে। আরেক দল আছে এদেরকে বান্দুইরগা বলে। এরা বানরের খেলা দেখায়। আরেকটি দল হলো ওসমানের মতো সওদাগর। এরা কসমেটিক সামগ্রী ফেরি করে বিক্রি করে। বেদেদের অপর একটি দল চল বানায়, ছাতা মেরামত করে এমনকী লাইট, তালাচাবি মেরামত করেও জীবিকা চালায়।

ওসমান জানান ৩/৪ হাজার টাকার পুঁজি হলেই এ ব্যবসা করা যায়। এদের বউ ঝিও বাড়ি বাড়ি ঘুরে এ বৃত্তি করে। এখানে প্রায় দেড়শ পরিবার বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। তবে তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছেলে মেয়েদের তারা চাইলেও শিক্ষা দিতে পারে না আর্থিক অনটনের কারণে। জানা যায়, স্কুলের নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে পারে না বলে তাদের সন্তানরা প্রাইমারি স্কুলের উপবৃত্তির টাকাও পায় না।

কথা বলি ওসমান ও তার ছেলে মেয়ের সাথে। আরও কথা বলি কুলসুম, সাবানা, পরাণ, নূপুর , রতড়বা ও নাসিমা বেগমের সাথে। এই মেয়েগুলোর অধিকাংশেরই বিয়ে হয়েছে অল্প বয়সে। বাল্যবিবাহ তাদের মধ্যে একটি সাধারণ চিত্র। এদের খাদ্যাভাস আমাদের মতোই। এমনকি বিয়ে ও আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম রীতিতেই হয়ে থাকে। এদের বিয়ে শাদি নিজেদের মধ্যে যেমন হয় তেমনি সাধারণ গৃহস্থ মুসলিম ঘরেও তাদের বিয়ে শাদি হয়। যেমন, এখানে ওসমান নিজে বিয়ে করেছেন গৃহস্থ ঘরে। তার

মেয়েকেও বিয়ে দিয়েছেন গৃহস্থ ঘরে। গৃহস্থ ঘরে বিয়ে করতে পারা বা বিয়ে দিতে পারা তাদের জন্য আভিজাত্যের প্রতীক।

৩. সুইপার

লাকসাম রেলওয়ে জংশনের পাশে বেশকিছু সুইপার ও মেথর পরিবার রয়েছে। মূলত রেল জংশন গোড়াপত্তনের পূর্ব হতেই এখানে এদের জীবন যাত্রা শুরু হয়। চারপাশের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে এরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে। কিন্তু ভাগ্য ও জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটেনি।

৪. রবিদাস

লাকসাম জংশন ও উত্তর বাজারের আশেপাশে ৩১টি রবিদাস পরিবার বসবাস করে। লাকসাম উত্তর বাজার এলাকার পঞ্চাশোর্ধ বিশ্বনাথ রবিদাসের সাথে কথা বলে জানা যায় ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা এখানে বাস করে আসছেন কয়েক পুরুষ ধরে। আলোচনায় তার স্ত্রী বকুলও এসে যোগ দেন। লাকসামের সাধারণ মানুষ এদেরকে বলে মুচি। জুতা সেলাই করা এদের প্রধান পেশা। জানা যায়, প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেলে তারা সকলে মিলে একটি জুতা তৈরির কারখানা চালাতে পারবে। তাদের সন্তানদের কেউ কেউ আজ লেখাপড়া শিখে পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। রবিদাস সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক শূকর পোষে। লাকসামের রবিদাসদের একটি নিজস্ব শ্মশান খোলা আছে।

৫. কাহার

রেলওয়ে জংশন এবং পূর্ব লাকসামের মহাশ্মশান সংলগ্ন রেললাইনের পাশে ৪/৫টি কাহার পরিবার বসবাস করে। কাহারগণ একটি বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায় যারা শিবিকা বা পালকি বাহক হিসেবে পরিচিত। এদেরকে 'বেহারা'ও বলা হয়। কুমিল্লায় লাকসাম ছাড়া আর কোথাও কাহার সম্প্দ্রায় নেই বর্তমানে লাকসামরে কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স্ক দু'চারজন এখনো বেঁচে আছেন যারা এক সময় পালকি বাহকের কাজ করতেন। সময়ের বহমান স্রোতের সাথে পালকির ঐতিহ্য আজ উঠে গেছে। বাধ্য হয়ে এখানে কাহারগণও তাদের এই প্রাচীন পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা ধরেছেন।

৬. মুচি

নাঙ্গলকোটে বিশেষ সামাজিক শ্রেণিতে হাড়ি, ডোম, নাগারচি বা কৈবর্ত নেই। ঢালুয়া, বক্সগঞ্জ, দায়েম ছাতি, নাঙ্গলকোটে কিছু রবিদাস সম্প্রদায়ের লোকজন আছে। এরা মূলত মুচি। জুতা সেলাই করাই তাদের পেশা। হিন্দু ধর্মে তাদেরকে অন্ত্যজ শ্রেণিতে বিচার করা হলেও ধর্মীয় বিধি বিধান তাদের হিন্দুর মতই। এমনকি বিবাহের রীতিনীতিতেও খুব একটা পার্থক্য করা যায় না। দূর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, বিশ্বকর্মা, গণেশ পূজা, সবই তারা পালন করেন। এছাড়া তাদের মধ্যেও লোকাচার ব্রত, একাদশী, বিয়ের অধিবাস, জামাই ষষ্ঠী, বরণ কুলা, বধূবরণ, স্বাদ ভক্ষণ, ভোগ ইত্যাদি প্রচলিত।

নাপিত বা শীল আছে কিছু। এদের অবস্থান ঢালুয়া, দক্ষিণ শ্রীহাস্য, নাঙ্গলকোট, দায়েমছাতি, বক্সগঞ্জ, মন্নারা মক্রবপুর, ইলেকশান বাজার, শান্তির বাজার, প্রভৃতি

স্থানে। এখানে ফুলমালি আছে নাপিত বা শীলের সমান। নাঙ্গলকোটের ফুলমালিরা পেশা হিসাবে নাপিতের কর্ম বা ব্যবসাকে বেছে নিয়েছে। মুইয়াই (মইশাই) ও দৌলখারে কিছু কুমার (পাল) পরিবার আছে। তাও এদের সংখ্যা ৪/৫ ঘরের বেশি হবে না। এরা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পেশাও পাল্টে ফেলেছে তবে পদবি পাল্টায়নি। কর্মকার পরিবার আছে সর্ব সাকুল্যে ৮/১০টি। এরাও তাদের পদবি বা পেশা পাল্টায়নি।

৭. ফুলমালি

এক সময় এদের কাজ ছিল রাজার বাগানে কাজ করা। ফুল তোলা, মালা বানানো। কাল পরিক্রমায় এ পেশার বিবর্তন ঘটে। এরা কেউ পরিণত হয় বাদ্যকরে। কেউ জীবিকার প্রয়োজনে অন্য পেশা গ্রহণ করে। তবে বেশিরভাগ গ্রহণ করে ক্ষৌরকর্ম অর্থাৎ চুলকাটা, নখকাটা, দেহ পরিচর্যা ইত্যাদিতে। ঢালুয়া উত্তর বাজারে এমন পরিবার আছে ৪টি। এর মধ্যে তিনটি পরিবারেরই বাজারে সেলুন আছে। লক্ষণ চন্দ্র দাসের সঙ্গে কথা বললাম। তার গ্রাম ঢালুয়া। কবে থেকে এ পেশায় আছেন এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বাপ দাদার আমল থেকেই। তার ভাষ্যমতে ঢালুয়াসহ নাঙ্গলকোটের অন্যান্য স্থান মিলিয়ে ১৫টি পরিবার আছে। তবে সবাই এ কাজ করে না। কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যও করে।

ঢালুয়াতে কয়টি পরিবার আছে।

পাঁচ পরিবার।

এর মধ্যে তিন পরিবার করে সেলুনের কাজ, দুই পরিবার ব্যবসা। তার পাশেই রয়েছে বিপ্লব চন্দ্র দাসের সেলুন। বিপ্লব চন্দ্র দাস ও লক্ষণ চন্দ্র দাসের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা একটু বিব্রত হলেন। বললেন, এ তথ্য কেন নিচ্ছেন? আমাদের বিপদ হবে না তো? নাকি কিছু দিবেন আমাদের? আমি বললাম ভয় নেই। আপনাদের অবস্থানটাই শুধু জানতে চায় বাংলা একাডেমি। কিছু দেবার সামর্থ আমার নেই। তারপর দুই জনের ছবি নিয়ে ফিরে এলাম কর্মকার গলিতে। পশ্চিম বাজারে একটি ছোট পরিপাটি টিনের ঘর। ৩টি ভাগ এর। সম্ভবত একই পরিবারের সম্পত্তি। একটি দরজা খোলা ছিল। সেখানে কাজ করছিলেন স্বপন কর্মকার, পিতা : মৃত চন্দ্র মোহন কর্মকার। বয়স ৫৫/৫৬। তিনি জানালেন ঢালুয়াতে কর্মকার পরিবার আছে মাত্র ৩টি। এরা মূলত একই পরিবারের অংশ। কবে থেকে থাকেন এখানে। উত্তরে বললেন বাপ দাদার আমল থেকে। কোন সমস্যা হয়?

না, কখনো এমন মনে হয়নি।

এ কাজ করে সংসার চলে?

চলবে না কেন? অবশ্য কিছুটা গৃহস্থি আছে। ৩০/৪০ মণ ধান পাই, চলে যায়। আর দুটি পরিবারের নাম বলবেন? লিখুন। রসময় কর্মকার, পিতা : মৃত-মথুরা মোহন কর্মকার, আর তৃতীয় জন কেশব কর্মকার, পিতা : মৃত- দুর্গামোহন কর্মকার।

কী কী দ্রব্য সামগ্রী আপনারা তৈরি করেন?

দা, বটি, ছেনি, চিপটি, হাতা, কাঁচি, ছুরি, কুঠার, কোদাল, শাবল ইত্যাদি।

কেমন দাম পড়ে এসবের?

পাত্র বুঝে পাত্রি খুঁজি, অর্থাৎ যার যা সামর্থ আছে।

আপনাদের বিয়ে সম্পর্কে কিছু বলবেন?

কী জানতে চান বলুন?

বিয়ে কিভাবে হয়?

হিন্দুর বিয়েতে যা যা হবার কথা সবই। প্রথমে বিয়ে ঠিক হওয়া, তারপর অধিবাস।

ঠিকুজি বিচার হয় না?

আগে হত, এখন হয়না। এত কিছু বাছবিছার করার বিধান এখন সমাজে নেই। সমাজই তো নেই আবার বাছবিছার। মেয়ে পছন্দ হলে কি করতে হয়?

ছেলের বাড়িতে উলুধ্বনি দিতে হয়। আশে পাশের হিন্দু প্রতিবেশীদের জানালে তারা এসে উলুধ্বনি দিয়ে পান চিনি খায়। মেয়েপক্ষ ও প্রতিবেশিদের মিষ্টিমুখ করিয়ে উলুধ্বনি দেয়।

আর কী কী হয় একটু সংক্ষেপে বলবেন?

সংক্ষেপেই বলতে হবে। হাতে অনেক কাজ। পান চিনির পর বিয়ের একদিন আগে গায়ে হলুদ, মঙ্গঁল ঘট বসাতে হয়। জল ভরতে হয় বিয়ের দিন ভোরে। এদিন সূর্য উঠার আগে সধবা রমণীরা সাতঘাট থেকে জল আনে। এ জলের কলসির মুখে একটি আমপাতা দিয়ে ঘরের কোনে রেখে দেওয়া হয়।

কেন করা হয় এটা?

নিয়ম, তাই আগের আমল থেকেই হয়ে আসছে।

মঙ্গল ঘটের সাথে কিছু কী দেয়া হয়?

একটা কলা গাছ মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। এরপর আছে সোহাগ মাগা। মেয়েদের জন্য নিয়মের শেষ নেই। তবে ছেলেদের এত কিছু লাগে না।

লাগে না কেন?

এত কিছু তো জানি না। তবে লাগে বিয়ের পর।

তখন তো সব কিছুরই দায়িত্ব ছেলের। মেয়েকে বাড়িতে আনার পর তার সব দায়দায়িত্ব ছেলেরই।

বিয়ের দিন ছেলেকে কী করতে হয়?

বরযাত্রার আগে মঙ্গঁলবরণ। এদিন সকালে বরের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে বরণডালা পাঠাতে হয়। একটা নকশা আঁকা ডালা, পান, সুপারি, কাঁচা হলুদ, একটা আঁশযুক্ত মাছ ইত্যাদি।

আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়?

তা হচ্ছে তবু বলুন আর কি জানতে চান?

এই তো ধরেন বিয়ে বাড়িতে ছেলের আগমন বিয়ের আসর, বিয়ে শেষের অনুষ্ঠানাদি।

সে তো অনেক নিয়ম। হিন্দুর বিয়ে সাত পাকে বাঁধা, অনেক কষ্ট। বিয়ের দিন বর বা কনে জল ছাড়া কিছুই ছুঁতে পারবে না। বিয়ের কাজ শেষ হলে বাসর সজ্জা, সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে মেয়েকে ছেলের হাতে তুলে দেয়া ইত্যাদি।

সাথে কিছু দিতে হয়।

একটা কলসিতে চিড়া, মুড়ি, খই, লাড্ডু, ইত্যাদি। মেয়েকে খালি হাতে পাঠানোর নিয়ম নাই।

অন্যান্য হিন্দুদেরও একই নিয়ম?

'হ' এসব নিয়মে তেমন পার্থক্য নেই। বিয়ের আসর, বউ ভাত, সব কিছুতেই এক নিয়ম। আড়্যাইল্যাতে এসে ছেলে মেয়ের আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়।

ধন্যবাদ দাদা আপনি অনেক সময় নষ্ট করলেন।

আপনাকে ও ধন্যবাদ।

এখান থেকে গেলাম কালাচান রবিদাস এর দোকানে। পিতা- হারাধন রবিদাস। বয়স ৪৫/৪৬। তিনি নতুন জুতা বানাচ্ছিলেন জিজ্ঞাসা করলাম নাঙ্গলকোটে আপনাদের সম্প্রদায় আর কতঘর আছে?

বেশি না সব মিলে ২০/২৫ ঘর হতে পারে।

ঢালুয়ায়?

৫ ঘর। মানিক রবিদাস, রঘু রবিদাস, সুমন রবিদাস। কোথায় কোথায় আছে আপনাদের সম্প্রদায়। সব বাজারেই ২/১ ঘর আছে তবে এরা নাঙ্গলকোটের বাসিন্দা নয়। কেউ এসেছে লাকসাম থেকে, কেউ চৌদ্দগ্রাম, আপনারা কী পূজা পার্বন করেন?

হ্যাঁ করব না কেন। তবে নাঙ্গলকোটে দূর্গা পূজা হয় খুব কম। কোন গ্রামেই বেশি হিন্দু নেই। তাই এ ব্যয়বহুল পূজা করতে কেউ আগ্রহী নয়।

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

সুপ্রাচীন কাল থেকে গ্রাম বাংলার লোকচিকিৎসা প্রচলিত। কালের বিবর্তনে জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটার সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটলেও গ্রাম বাংলায় লোকজচিকিৎসা ধরে রেখেছে তার শক্তিশালী অবস্থান।

লোকচিকিৎসায় বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় উপাদান বিদ্যমান। বস্তুগত উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়– মৃত প্রাণীর হাড়, হাড্ডি, ফুল, বীজ, পাতা-মূল, এবং নানা প্রকার তেল। প্রয়োজন মনে হলেই লোক চিকিৎসক প্রকৃতি থেকে তার নানা উপকরণ আহরণ করে থাকেন। লোকচিকিৎসার বস্তুগত ব্যবহারের কিছু নমুনা নিম্নে প্রদর্শন করা হলো,

১. পেট ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয় পান পত্র ও সরিষার তেল।

২. বুকে ও পিঠে ব্যথার উপশম ঘটাতে সরিষার তেলে রসুন গরম করে সেক দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

৩. আমলকি, হরিতকী, বহেরা এই তিনটি ফল ত্রিফলা নামে পরিচিত। রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহারে পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪. সর্দি কমানোর জন্য কালোজিরা বেটে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৫. হৃদরোগের চিকিৎসায় রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৬. হাত-পা ভেঙে গেলে মাণ্ডার তেল মালিশ করার বিধান দেওয়া হয়।

৭. ডায়াবেটিস বা মেহ রোগের জন্য মেহগনি গাছের তিক্ত ফলের রস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৮. কাশির মহোত্তম ঔষধ হিসেবে বাচ্চাদের তুলসী পাতার রস এবং বড়দের বাসক পাতার রস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৯. যৌনরোগ ঘঠিত নানা কাজে সাদা লজ্জাবতী গাছের মূল বা কাণ্ড গুড়া করে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১০. গুটি বসন্তে নিম পাতার ছাল বেটে গায়ে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

১১. শ্বাস কষ্টের জন্য উটের দুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১২. বাতের ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হিসেবে শিয়ালের মাংস এবং কেঁচোর তেল পানের বিধান দেওয়া হয়।

১৩. হাত পা কেটে গেলে দ্রুত রক্তপাত বন্ধ করতে গাঁদা ফুলের পাতার রস অথবা মাকড়সার জাল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৪. কৃমিনাশক হিসেবে চিরতা গাছের ছাল ব্যবহার করতে বলা হয়।

১৫. বোলতার দংশনে ক্ষতের উপর চুনের প্রলেপ দেয়ার বিধান দেয়া হয়।

গ্রামীণ এই চিকিৎসাগুলো বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসার পাশে বেমানান মনে হতে পারে তাই বলে এই চিকিৎসা বা চিকিৎসা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা এখনও গ্রাম্য সমাজে বিলীন হয়ে যায়নি। প্রাচীন কালে এসব লোকচিকিৎসার জন্য নানা প্রকার শ্লোক প্রচলিত ছিল যার কিছু কিছু শ্লোক এখনও লোকমুখে শোনা যায়। যেমন,

কানে কচু, চোখে তেল
তার কাছে বৈদ্য না গেল।

লোকচিকিৎসার অবস্তুগত উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের আলোকে নানা প্রকার তাবিজ, মাদুলী। এই লোকচিকিৎসাগুলো সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এবং পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসের উপর এগুলো এখনও টিকে আছে।

পীর, ফকির, ওঝা, বৈদ্য কবিরাজ লোকচিকিৎসার অবস্তুগত উপাদান লোক সমাজে সরবরাহ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অবস্তুগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো বস্তুগত উপাদানের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা প্রার্থীদের হাতে পৌছায়। গ্রামে প্রচলিত লোক বিশ্বাস হতে জানা যায় অসাবধানতা বশত চলাচলের জন্য মেয়েদের গায়ে আলগা বাতাস লাগে। এই আলগা বাতাস বেশ ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। আলগা বাতাস থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাই ঝাড় ফুঁক, তাবিজ, কবজ দিয়ে থাকে লোক চিকিৎসকগণ।

অনেক ক্ষেত্রে লোকচিকিৎসকদের তাদের কাছে আসা চিকিৎসা প্রার্থীদের শারীরিক ভাবে নির্যাতন করতে দেখা যায়। আলগা বাতাস লাগা রোগীদের তারা প্রথমে ঝাড় ফুঁক করে থাকেন তার পর কখনো নাকের সামনে শুকনো মরিচ পুড়ে ধরেন, কখনো বা তাকে ঝাড়ুদিয়ে পেটানো হয়। তেল পড়া, পানি পড়া, চিনি পড়া ইত্যাদি এ চিকিৎসায় ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। শুধু গ্রামেই নয় শহরেও এ চিকিৎসার চল দেখা যায়।

আধুনিক ঘরানার চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা তৈরি হলেও গ্রামের মানুষ এখনো বিশ্বাস করে আলগা দোষ। জিন ভূত আছে। আর এমন কিছু অসুখ আছে যা ঔষধ দিয়ে ভাল করা যায় না।

নাঙ্গলকোটের সর্বত্রই এ বিশ্বাস ছিল, আছে। হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সেই বলেছে সব গ্রামের মধ্যেই ২/১জন করে গুণীন, ওঝা বা বৈদ্য আছেন। এরা নিজস্ব পদ্ধতিতে জিন ধরা, পেটব্যথা, লিভার, জণ্ডিস, দুঃস্বপ্ন দেখা, বাচ্চা নষ্ট হওয়া, বাচ্চা না হওয়া ইত্যাদির চিকিৎসা করেন। নিম্নে কয়েকজনের পরিচয় তুলে ধরা হলো,

জলিল হুজুর (৮০) সিঙ্গুরিয়া, নাঙ্গলকোট : ঝাঁড়ফুক ও পানি পড়া। টাকার বিনিময়ে করেন না। ছোট ছেলে মেয়ের গায়ে বাতাস লাগলে, পেট ব্যথা করলে, স্বপ্নে ভয় পেলে ঝাঁড়ফুক করেন ও পানি পড়া দেন। মানুষ বিশ্বাসের সাথেই তা গ্রহণ করে এবং ফলও পায়।

তফুরা খাতুন (৩৮) বায়েরা, নাঙ্গলকোট : ইনি গাছগাছালির রস দিয়ে এক ধরনের ঔষধ তৈরি করেন। এতে যেসব রোগের কাজ হয় তা হলো জণ্ডিস, হাঁপানি লিভার, কোমর ব্যথা, স্বপ্নদোষ। মানুষ উপকার পায়।

মনা কবিরাজ (৬০) মোগরা, নাঙ্গলকোট : ইনি গাছগাছালি থেকে এক ধরনের মালিশ তৈরি করেন। এতে অর্শ্ব, দাঁদ, হাঁপানী রোগের চিকিৎসা হয়।

জৈতনের নেছা (৭৫) চাঁন্দলা, সিজিয়ারা, নাঙ্গলকোট : ইনি সাপে কাটলে ঝাঁড়ফুক করেন। বাতজনিত ব্যথায় ঝাঁড়ফুক করেন এবং মহিলাদের বাচ্চা না হলে গাছগাছালির তৈরি ঔষধ দেন। বহুদিন যাবৎ এ চিকিৎসা করছেন। বিনিময়ে ঔষধের খরচ নেন কিন্তু এ নিয়ে কোন দাবি থাকে না।

সুবল চন্দ্র সূত্রধর (৪০) বড়কালী, নাঙ্গলকোট : ইনি বিভিন্ন ধরনের বাতের ব্যথার যেমন কোমর, ঘাড়, পিঠ ব্যথার জন্য নিজের হাতের বানানো বনাজী ঔষধ দেন। তার ঔষধে জণ্ডিস ও লিভারেরও কাজ হয়। ঔষধের খরচ নেন, তবে দাবি করে নয়। যে যা দেয় তাতেই তিনি খুশি।

তথ্যসূত্র : আব্দুল আহাদ, পিতা : আবদুল আউয়াল, বড়কালি, হুক্কা মিয়া

কবিরাজ মাহবুব হক (৬০) চান্দগড়া, নাঙ্গলকোট। ঝাঁড়ফুক করেন। সাধারণত তিনি হাঁপানী রোগের ঔষধ দেন।

তথ্যসূত্র : হাছিনা আক্তার সীমা, পিতা : মোঃ আলী আক্কাছ মজুমদার, চান্দাইশ, নাঙ্গলকোট

সফিক মিয়া (মুক্তিযোদ্ধা), দুর্গাপুর উত্তরপাড়া : পিতা : কালু মিয়া, ইনি মূলত বনাজী চিকিৎসা করেন। পেট ব্যথা, জণ্ডিস, মুখে অরুচী ইত্যাদি তার চিকিৎসার বিষয়। তবে তিনি একসঙ্গে ২/৩ জনের বেশি চিকিৎসা করেন না।

তথ্যসূত্র : মোঃ এনামূল হক, বড় আলমপুর, কুমিল্লা

রশিদ মাস্টার (অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক) : তার চিকিৎসার বিষয় যাদুটোনা জিনভূত ধরা। এ জন্য তিনি পানিপড়ার সাথে তাবিজ কবজও ব্যবহার করেন।

মাওলানা ফরিদ দূর্গাপুর সদর : তিনি মূলত পাগল চিকিৎসক। এলাকাবাসী জানায় মাওলানা ফরিদের বাবাও পাগল চিকিৎসা করতেন। তার পিতা ছিলেন গাইবান্ধার বাসিন্দা। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে মারা যান। আমি প্রায় ২ ঘন্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পেলাম না। তাই তথ্য দাতার উপর নির্ভর করতে হলো। আমার পরিদর্শনের দিন দুর্গাপুর পাগলা গারদে মোট ১০ জন মানসিক রোগী ছিল। এর মধ্যে ৯ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা। মহিলাকে রাখা হয়েছে ১টি পৃথক ঘরে। তাদের সবার হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা। ৯ জন পুরুষের মধ্যে ২ জন প্রতিবন্ধী, অশিক্ষিত মা-বাবার সন্তান। এই বিশ্বাস থেকে পাগলের গারদে দিয়েছে যে, যদি হুজুরের দোয়ায় ভাল হয়ে যান। তাদের সাথে কথা বললাম। না, ফরিদ সাহেব মারধর করেন না, ইনি চিকিৎসা করেন পানিপড়া ও বনাজী ঔষধ দিয়ে। প্রচুর বোঝান, ৩০/৪০ বৎসর যাবৎ তার এ নিয়েই কাটছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির সাহেব পাগলদের জন্য একটি দালান তৈরি করে দিয়েছেন। এখানে যারা চিকিৎসারত ছিলেন তারা হলেন–

১. মোসলেম, পিতা : আব্দুস সামাদ ভূইয়া, সামপুর বুড়িচং।
২. শাহ হোসেন ভূইয়া, পিতা : আব্দুস সামাদ ভূইয়া, সুন্দরপুর, দাউকান্দি।
৩. সেলিম কাওছার, পিতা : মৃত- ইদ্রিস মিয়া, হাড়িখোলা, চান্দিনা।
৪. শফিউল সরকার, পিতা : আব্দুল কাদের, ভরাসার, চান্দিনা।
৫. কাওসার হামিদ, পিতা : ছবির মিয়া, মধ্যম আশ্রাফপুর।
৬. ছোটন মিয়া, পিতা : আব্দুর রহিম।

৭. হাফিজুর রহমান, পিতা : আব্দুল হাই, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৮. তান্না বিষ্ণুপুর, মৌলভীপাড়া।

বাকি তিনজনের তথ্য নেয়া যায়নি। তাদের একজন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই গান গাইছিল, একজন ঘুমাচ্ছিল আর একজনের বক্তব্য ছিল, "আমারে ১০টা ট্যাহা দেন, মুড়ি খামু"। ভাষায় মনে হচ্ছিল কুমিল্লাতেই হবে তার নিবাস।

তথ্যসূত্র : বিমল চন্দ্র সরকার, কালির বাজার

আব্দুল ওহাব যশপুর, ফকিরবাড়ি : পিতা : মৃত- ঝাড়ু মিয়া, তিনি তেলপড়া, পানিপড়া, ঝাড়ফুঁক এর মাধ্যমে যাবতীয় আলগা দোষের চিকিৎসা করেন। প্রতিদিন ১০/১৫ জন মানুষ তার কাছে চিকিৎসা নিতে আসে।

তথ্যসূত্র : জসিম উদ্দিন মিয়া, মাঝিগাছা, সদর

চারু মিয়া কবিরাজ : পিতা : নাজিম উদ্দিন মিয়া, মাঝিগাছা, বর্তমানে মাঝিগাছা বাজারটি কবিরাজ বাজার নামে পরিচিত। চারু মিয়া কবিরাজ ছিলেন একজন ভাল গুণীন। তিনি ১১৪ বৎসর জীবিত থেকে ২০০৪/০৫ সালে মারা যান। বর্তমানে চিকিৎসা করেন চারু মিয়া কবিরাজের নাতি জসিম উদ্দিন মিয়া। চারু মিয়া কবিরাজের সন্তান অহিদ মেম্বারের ৪ ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রথম সন্তান তিনি। তার চিকিৎসা পদ্ধতি তাবিজ ও পানিপড়া। এটা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ। প্রদত্ত তাবিজ ও পানিপড়ার মাধ্যমে আলগা সমস্যা, পেটে ব্যথা, বাচ্চা হয়ে মারা যাওয়া জিন ধরা ইত্যাদির সমাধান হয়। জসিম ভাই জানালেন এখানে সারাদেশসহ পার্শ্ববর্তী ভারত থেকেও লোকজন আসে। এখানে ভুল চিকিৎসা করার সুযোগ কম। যদি তাবিজ কবচ ও পানিপড়ায় কাজ হবে বুঝি তাহলেই চিকিৎসা করি। এখনো পাঁচ ভাই কবিরাজি করেন।

লোকচিকিৎসার একটি কালো অধ্যায় সম্পর্কে এবার আলোকপাত করব। এ কালো অধ্যায়টি হলো কালো যাদু বা যাকে ইংরেজিতে বলে ব্ল্যাক আর্ট। এই যাদুর মাধ্যমে মানুষের নানাবিধ ক্ষতি করা হয় যেমন– কাউকে বান মারা, গর্ভবতীর সন্তান নষ্ট করা, গাছে বান মারা, জিন চালান দেওয়া, বান মেরে পুকুরের মাছ নষ্ট করা, এ জাতীয় আরও অনেক প্রকার ক্ষতি সাধন করে এই কালো যাদুর মাধ্যমে।

ওঝা, ফকির, খনকার যে মানুষের শুধু ক্ষতিই করে তা নয় তারা মানুষের নানা প্রকার উপকারী বিধানও দিয়ে থাকে। যেমন–স্বামী/স্ত্রীর মিল, শ্বাশুড়ি-পুত্র বধূর মিল, হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে বের করা, দুষ্ট গ্রহের প্রভাব হতে মুক্ত করা আলগা বাতাস লাগলে তা থেকে মুক্ত করা।

রূপসী রমণী বশীকরণ, যোগিনী সাধন, ডাকিনা সাধন, জিন-ভূত-প্রেত প্রভৃতি আদিভৌতিক ছায়া থেকে মুক্ত করা এ ধরনের ভায়াবহ কাজও তারা করে থাকেন। ধর্মীয় গ্রন্থের নানারূপ তন্ত্র-মন্ত্র-বাণী প্রভৃতি উল্টা করে লিখে তাবিজ ও মাদুলী তৈরি করে তারা এসব বিধান দিয়ে থাকেন।

তাবিজ মাদুলী তৈরি ও এক প্রকার গুপ্ত বিদ্যা। এসব বিদ্যার চর্চা সারা বাংলাদেশে অল্প-বিস্তর চলে আসছে দীর্ঘ দিন যাবৎ। কুমিল্লা ও এর উপজেলাগুলো এর ব্যতিক্রম নয়। হোমনা অঞ্চলে ও আড়ালে অন্তরালে চলে এসব কালো/গুপ্ত বিদ্যার কারসাজি। গুপ্ত বিদ্যার ফল ভালো কী মন্দ তা যাচাই না করেই আমাদের দেশের

মানুষ কবিরাজ, ওঝাদের স্মরণাপন্ন হয়। আজও এসব যাদু বিদ্যার চাহিদা আমাদের দেশে চোখে পড়ে।

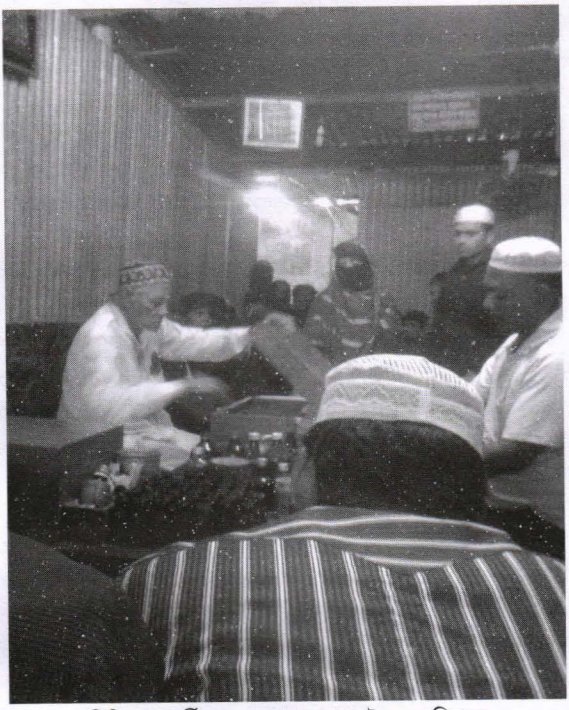

চিকিৎসাপ্রার্থীদের সেবায় ব্যস্ত জনৈক কবিরাজ

লোকচিকিৎসা গ্রাম বাংলায় ছিল, আছে থাকবে। প্রচণ্ড পেটব্যথা, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠা। অহেতুক ভয় পাওয়া, রাতে ঘুমের মধ্যে হাটা। বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়া, ঘরে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটা, ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়, জীবন সম্পর্কে আগ্রহ হারায় তখনই কুসংস্কার তাকে আঁকড়ে ধরে। এ অবস্থায় মানুষ অলৌকিক শক্তি, বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়। পানি পড়া তেলপড়া, পান পড়া দিয়ে কারো ক্ষতিসাধন, কাউকে বশ করা যায় কিনা তা তারাই জানেন, গ্রামীণ জীবনে এমন গল্প চালু আছে।

গাছের শিকড়, নারীর মাথার চুল, মুকুটের ফুল হাতের নখ, শাড়ির কোনা ইত্যাদি বিশেষ নিয়মে ব্যবহার করে তাকে বশীভুত করা যায় বা তার ক্ষতি সাধনও করা যায়। এ ছাড়া আছে টোটকা চিকিৎসা। এগুলো আসলে লৌকিক আচার। বিষাক্ত কোন পোকা, সাপ, শিং মাছ, কুকুর বা শিয়ালে কামড়ালে ঝাড়তে হয় এবং ব্যথার স্থানে ঔষধি বৃক্ষের পাতা বা ছালের রস ব্যবহার করা হয়। এ জন্য বিষ নামানোর ব্যথা

নাশের বা রক্ত প্রবাহ বন্ধের বনাজী চিকিৎসা সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো প্রচলিত আছে। খাবার, শরীর বা ফল ফসলের উপর নজর পড়লেও নাকি মানুষের ক্ষতি হয়। এ ক্ষেত্রে শনি বা মঙ্গলবারে পানিপড়া এনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উপকরণের উপর ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

পানিপড়া, তেলপড়া লোকজীবনের এক সাধারণ বিশ্বাস। প্রতিটি গ্রামেই এমন কিছু হুজুর ওঝা ও গুনীন থাকেন যারা যখন খুশি তেলপড়া, হাতের কাছে থাকা গাছগাছালি দিয়ে ঔষধ বানিয়ে দেয়া, পানিপড়া দিয়ে নানা রোগের চিকিৎসা করেন। আবার জণ্ডিস, একজিমা, বাতজ্বর, গাঁটব্যথা, লিভার ইত্যাদির জন্যও কেউ কেউ বনাজী ঔষধ দেন। চৌদ্দগ্রামে লোক চিকিৎসা বিষয়ক যে তথ্যগুলো পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ–

হারাধন মুচি (রবিদাস) : কনকাপৈত ইনি একজন ভাল গুনীন। প্রতিদিন কেউ না কেউ তার কাছে আসে। বস্তুত হারাধন বাবু চিকিৎসা করেন না, মন্ত্রপুত তাবিজ দেন এবং তা অশান্তি, স্বামী স্ত্রীর অমিল, সন্তান বখে পাওয়া থেকে রক্ষা যাওয়া, পোয়াতী রমণীর আলগা দোষ দূর করতে সাহায্য করে। কারো কিছু চুরি হলে হারাধন মুচির ডাক পড়ে। তিনি বাটি চালান দিয়ে, বলে দিতে পারেন চুরিটা কে করেছে এবং কী অবস্থায় আছে। তবে এ চালান দিতে হয় তুলা রাশির জাতক দিয়ে।

প্রিয়বালা শীল : বুদ্ধিন, চৌদ্দগ্রাম। বয়স ৬০ হতে ৭০ বৎসর। ইনি কর্পূর দিয়ে তৈরি একটা বিশেষ বড়ি দেন যা জণ্ডিসের কাজে লাগে। এ পর্যন্ত শত শত মানুষ তার এ ওষধি ভাল হয়েছে বলে এলাকার মানুষের বিশ্বাস। প্রিয় বালা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেন বনাজী ঔষধি বৃক্ষের ছাল, লতা পাতা বা ফল। তার ঔষধ নিতে হবে শনি বা মঙ্গলবারে। অন্য সময় তিনি ঔষধ দেন না। প্রিয় বালার ঔষধে আরো যে রোগের চিকিৎসা হয় তা হলো লিভার, একজিমা, খোস পাঁচড়া, বাঁত ব্যথা, দাঁত ব্যথা, পেট ব্যথা ইত্যাদি। চিকিৎসার বিনিময় টাকা ঐচ্ছিক। যে খুশি হয়ে যা দেয় তিনি তা নিয়েই খুশি থাকেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামের বা দূরবর্তী কোন স্থানের ২৫/৩০ জন লোক প্রিয়বালার কাছে আসে।

মরিয়মুন্নেছা : কনাকাপৈত। সাপ, বোলতা, কুকুর বিড়ালের আঁচড়, ভীমরুলের হুল ফুটানো শিং মাছের বিষ নামানোর জন্য ঝাড়ফুক করেন ও ধুল পড়া দেন এতে মানুষের উপকার হয়। এছাড়া শরীরে আঁচিল হলে তিনি এর জন্য কলাপড়া দেন। এতে আঁচিল শরীরের সাথে মিয়ে যায় বা শরীর থেকে খসে পড়ে। কোন বাচ্চা যদি দুধ না খায় তার জন্যও তিনি কলাপড়া দেন। এটা মরিয়মুন্নেছার পেশা নয়। প্রতিদিন ২/৪ জন তার কাছে আসে। তিনি কাউকে ফেরান না।

তথ্যসূত্র : ফের দাউস আক্তার, কনকাপৈত

মাহবুব রহমান : শ্রীপুর, ইনি এলাকায় জিন মাহবুব নামে খ্যাত। এ ছাড়া পেট ব্যথা মুখ দোষ, বিষাক্ত কোন পোকার কামড়, কুকুরের কামড়ের জন্য ঝাড়ফুক করেন। তাবিজ কবচও তিনি দেন। বহু দিন যাবৎ জিন মাহবুব এসব করে আসছেন। সাধারণ মানুষের ধারণা ভালো।

আখতার কবিরাজ : হিলালনগর, কাশিনগর। এলাকার লোকজন এক ডাকে তাকে চিনে। ভাল হলে পয়সা নেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি ঝাড়ফুক করেন। তবে এ

জন্য কারো উপর জোর খাটান বা টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে যা দেয় তা নিয়েই খুশি। তার কাছে বনাজী ঔষধ আছে এবং প্রতিদিনই দূরদুরান্ত থেকে মানুষ এসে তাবিজ, কবজ বা বনাজী ঔষধ নিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র : অধ্যাপক জুলফিকার আহম্মেদ

উমেশ চন্দ্র সিংহ : কিংকাসনাই, চৌদ্দগ্রাম। ইনি গরুর কবিরাজি, সন্তান লাভের জন্য তাবিজ, জিন-ভূতের জন্য তাবিজ কবচ করেন।

লোকজ জনগোষ্ঠী তাদের বিশ্বাস দিয়ে যে চিকিৎসাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে তা আমাদের গ্রামীণ ও বিত্তহীন মানুষের জীবনের এক অনন্য সম্পদ। এখনো গ্রাম বাংলার আশি হতে নব্বই ভাগ মানুষ আধুনিক চিকিৎসা হতে বঞ্চিত। তাদের ছোট খাট রোগ নির্ণয়ে তারা নিজেদের তৈরি বনাজীই খায়। জ্বর হলে গরম জলে কাগজি লেবুর রস, কেটে গেলে তৃণ জাতীয় কিছু হাতের তালুতে ঘষে লাগিয়ে দেয়, আমাশয় হলে চাউল ভাজা পুরে ভিজিয়ে খাওয়ান, পেটে ব্যথা হলে পানিপড়া এখনো এদেশের সিংহভাগ মানুষের সাধারণ চিকিৎসা। বিত্তহীন বাঙালির অমানবিক জীবনে লোকচিকিৎসা হলো অবৈজ্ঞানিক এবং অশিক্ষিত ও মূর্খ্য মানুষের চিকিৎসা। বাস্তবতা হলো লোক সমাজ কখনো যাদু বিদ্যার ধনন্তরী মন্ত্রের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, পারবেও না। মানব জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বা লোক সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা মানে না। এমনই কিছু লোক চিকিৎসক কবিরাজ এর নাম নিচে দেয়া হলো,

হাজী মো. ছাদেক : পিতা : হাজী আব্দুল মজিদ। বয়স ৭০ বৎসর ইনি বৃটিশ আমলে ম্যাট্রিক পাশ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ নানা প্রকার বনাজী পাতা ও দোয়া দরুদ পড়ে চিকিৎসা করেন। পেটে ব্যথা, আলগা দোষ, খারাপ স্বপ্ন দেখা, বাচ্চা কাচ্চা না হওয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা করেন বনাজী ঔষধ বা দোয়া দরুদ দিয়েই। উপকার হয় উপকার না হলে এত বৎসর একই পেশায় থাকতেন কিভাবে। দেখলাম দোকানটাতে প্রচুর প্রাচীন আমলের বৈয়াম ডিবি ভর্তি বিভিন্ন ধরনের ভেষজ। হাদিয়া ঐচ্ছিক কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে যা দেয় তাতেই খুশি কোন চাহিদা নেই। বললেন আল্লাহ চালিয়ে নিচ্ছেন তো কোন অসুবিধা হয় না। বহু সাংবাদিক বহুবার এসেছে নানাভাবে হয়রানি করার জন্য পারে নি। ধোকা দিয়ে চিকিৎসা করিনা এবং লোক দিয়ে ফুসলিয়ে কাউকে আনি না। যারা আসে বিশ্বাস থেকেই আসে।

মূল চিকিৎসা : হাড় ভাঙ্গা

ঔষধ বনাজী ও বিশেষ ঘরনার ব্যান্ডেজ।

হাজী হেকিম আবু হোসেন সওদাগর : বয়স ৬০ বৎসর পিতা : মৃত হাজী হেকিম জয়নাল আবেদীন সওদাগর। এটা মূলত স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ। দাদা ওছমান আলী সওদাগরের আমল থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আসে কুকুর ও শিয়ালে কামড়ের ঔষধের জন্য। এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে চিকিৎসা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রায় দেড়শ বছর হলো ময়নামতির কুকুরের কামড়ের চিকিৎসার বয়স। আমি পরিচয় দিলে তিনি হেভি আপ্যায়ণ করে বসালেন। বললেন বলুন আপনি কী জানতে চান? আমি সলজ্জ চিত্তে বললাম, মানুষ এখনো বিশ্বাস করে। সওদাগর সাহেব এক গাল মুচকি হেসে বললেন, মানুষের বিশ্বাসের উপর

আল্লাহ ছাড়া কারো হাত নাই। তারপর একটি খাটি বাংলা প্রবাদ বল্লেন, "বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলে, তর্কে বহুদূর"। বোঝলাম লোকটা শুধু চিকিৎসকই নন জ্ঞানীও বটে। তিনি আরো জানালেন স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের উপরই আমার চিকিৎসা করিনা। এখানে হেকিমি মত আছে। ভেষজ ঔষধের চাহিদা এখনো আছে তাই আমরা স্বপ্নের সাথে যুক্তির সমন্বয় করেছি। অর্থাৎ হারবালের ব্যবহার করছি যা মানবদেহের কোন ক্ষতি করে না। জিজ্ঞাসা করলাম এই যে, এতদিন চিকিৎসা করেন, প্রশ্নের মুখোমুখি হননি। বললেন, হয়েছি মানে প্রতিনিয়ত হই, কিন্তু পরোয়া করিনা কারণ এখানে ভেজাল জিনিষ বিক্রি করা হয় না, কাউকে জোর করেও আনা হয় না। যারা আসে তারা জানে বলেই আসে নতুবা একটা বিশ্বাসের উপর কোন প্রতিষ্ঠান ১৫০ বৎসর টিকে থাকতে পারে না।

তথ্যসূত্র : হাজী হেকিম আবু হোসেন সওদাগর, বয়স-৬০, পিতা : মৃত- হাজী হেকিম জয়নাল আবেদীন সওদাগর, দাদু-ওছমান আলী সওদাগর (ইনিই প্রথম চিকিৎসক)

মাওলানা যোবায়ের আহমেদ : পিতা : হাজী মোহাম্মদ ছাদেক। ইনিও বাবার নিকট থেকে হাড়ভাঙ্গা চিকিৎসাটা শিখেছেন। বাবার অনুপস্থিতিতে ২/৪ জন রোগী তিনিও দেখেন এবং একই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

হাজী সুলতান মিয়া (গোপীনাথপুর বুড়িচং) : মুলত পানিপড়া দিয়েই চিকিৎসা করেন। এ ছাড়া মন্ত্রপূত তাবিজ দেন মহিলাদের বাচ্চা নষ্ট না হওয়ার জন্য। মানুষ উপকার পায় বলেই আসে। কানে না শোনা, গাভীর দুধ না দেয়া, বা কমে যাওয়া বাচ্চার নাভি নড়ে গেলে ফলপড়া দিয়ে নাভি ঠিক করে দেন। এসব হয় মূলত দোয়াদরুদ পড়ার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র : শিরিন আক্তার বয়স-৪৭, বুড়িচং

শাহ আলম কবিরাজ, কালিকৃষ্ণ নগর : ইনি মূলত সাপ ধরেন তাবিজ কবজ বেঁচেননা। কাউকে সাপে কাটলে বনাজী ঔষধ দেন।

তথ্যসূত্র : মোঃ এনামূল হক, মীরপুর, ছয়গ্রাম, বুড়িচং

শহীদ ফকির : দক্ষিণ গ্রাম, বুড়িচং, ইনি কেরোসিন ও পানি মিশিয়ে চিকিৎসা করেন। যে যে কাজের জন্য যায় সে কাজের জন্যই পানি ও কেরোসিন পড়ে দেয়া হয়। প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ জন লোক আসে। নির্দিষ্ট হাদিয়া নেই।

ল্যাংটা জালাল শাহ : পাইকোটা, বুড়িচং। প্রায় ১৭/১৮ বৎসর যাবৎ পানি পড়া দোয়াদরুদ ও তাবিজ কবজ দিয়ে আসছেন। মানুষের যত উপকার তো কিছু হয়, নতুবা প্রতিদিন ১০০/১৫০ লোক আসবে কেন। তবে তার অধিকাংশ রোগীই মহিলা।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

মন্ত্রের মধ্যে জাদুশক্তির ধর্ম আছে। ধর্মের ব্যর্থতার পর্যায় থেকে জাদুবিদ্যার সূত্রপাত। জাদুর রূপ মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। জাদুর প্রাচীনত্বের বিচারে মন্ত্র লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীনতম শাখা। মন্ত্র উচ্চারণ করে আনুষঙ্গিক আচার-আচারণ পালন করলে মন্ত্রশক্তি কাজ করে। গুণী বা ওঝা, কবিরাজ, পুরোহিত, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালী প্রভৃতি লোক আমাদের দেশে মন্ত্রের চর্চা করে।

মন্ত্র সম্পর্কে বড় কথা হলো তা গুপ্তবিদ্যা হিসেবে স্বীকৃত। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে মন্ত্র শিখতে হয়। নির্ভুল উচ্চারণ করতে হয়। প্রতিকার ও নিরাময় লাভ, প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার তাগিদ, লাভ ও প্রাপ্তির আশা, বিনাশ ও ক্ষতি করা, বন্দী ও বশীকরণ, উদ্ধার ও শনাক্তকরণ ইত্যাদি কাজ হাসিল করতে মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে বাঘ ও সাপের মুখ খিলাতে, শরীর বন্ধ করতে, ঘর বন্ধ করতে, বড়শিতে মাছ ধরতে, বিষ মারতে, ভূত-পেত্নীর আছর ছড়াতে, ফসলের ক্ষেতে নজর লাগাতে, পিঠা নষ্ট করতে, চোর বন্দী করতে, রমণী বশীকরণে, হারানো জিনিস উদ্ধার করতে মানুষ মন্ত্র জানা লোকদের শরণাপন্ন হয়।

সারা পৃথিবীতেই ভারত তন্ত্র মন্ত্রের জন্য বিখ্যাত। আর ভারতের সীমান্ত এলাকায় বর্তমান কুমিল্লা তথা পূর্বের ত্রিপুরা জেলা অবস্থিত। কাজেই খুব সহজেই কুমিল্লা অঞ্চলে মন্ত্রের ব্যবহার সঞ্চারিত হয়েছে। নিম্নে কিছু মন্ত্র প্রদত্ত হলো,

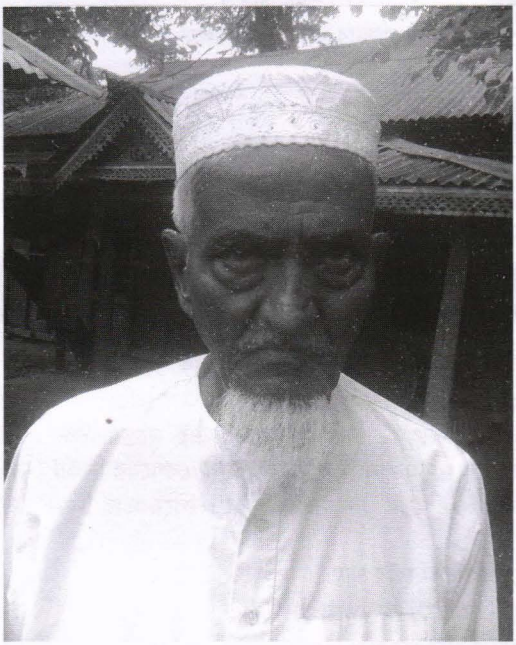

মো. শওকত আলি (তান্ত্রিক), জাঙ্গালিয়া বরুড়া, কুমিল্লা

সাপে কাটার মন্ত্র

আছর ছামল সূর্য ছামল
ছামল গুণের ভাত
সাত সতিনে পোড়ে লাড়ে

সৈরব তলার ঘাট
ঘাটে ঘাটে জন্মে সমুদ্রের পাড়ে
ঐ দেখ কোণে উকি ঝুকি চায়
দাঁত লড়ে মাথা লড়ে
যদি বিষ পড়ে
শিবের জুতা খসে
মহাপার্বতীর পায়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র : জনাব শওকত আলী মাস্টার, গ্রামঃ জাঙ্গালিয়া, ডাকঘর : মহেশপুর, বরুড়া, কুমিল্লা

হঠাৎ আগুনে পুড়ে গেলে সাথে সাথে ফোস্কা না ওঠার মন্ত্র

আগুনি যোগুনি বর্ষার ভাগ
পাখি ছানা, পুকিছানা কাল হয়ে থাক।

তথ্যসূত্র : জনাব শওকত আলী মাস্টার, গ্রাম : জাঙ্গালিয়া, ডাকঘর : মহেশপুর, বরুড়া, কমিল্লা

পিঠা নষ্টের মন্ত্র

খোলাপিঠা নষ্ট করতে হলে-
খোলাপিঠা কই, খোলাপিঠা কাই
যদি খোলাপিঠা সিদ্ধ হস
তোর ধর্মের দোহাই।

যে পিঠা নষ্ট করতে হবে সেখানে খোলাপিঠার স্থলে ঐ পিঠার নাম বসাতে হবে।

তথ্যসূত্র : জনাব শওকত আলী মাস্টার, গ্রাম : জাঙ্গালিয়া, ডাকঘর : মহেশপুর, বরুড়া, কমিল্লা

চোরের উপদ্রব হতে ঘর রক্ষার মন্ত্র বা চোরবন্দী মন্ত্র

আগের দিনে ঘরবাড়ি ছিল ঠুনকো অবকাঠামোর, আর অভাবের কারণে চোরের সংখ্যা ছিল বেশি। এ জাতীয় বাস্তবতা সামাল দিতেই এই মন্ত্রের উদ্ভব। মন্ত্রটি সংগ্রহ করা হয়েছে বরুড়া উপজেলার মির্জানগর গ্রামের রফিয়া বেগমের নিকট। তাঁর বয়স ৩৬/৩৮ বছর। মেয়েলী গীত ও বিয়ের গান সংগ্রহ করতে গিয়ে তার নিকট থেকে এই মন্ত্রটিও পাওয়া যায়,

চোর চোরানী বইলের মাতা
যেই চোর আইয়ে কাড়ুম মাথা
খাট দুয়ারী খাট মোহনী
চোর দুয়ারি বান্ধিয়া
চোরার মাউগ মরে বান্ধিয়া
উগুর তলে ক্ষুদের আড়ি
চোরার মাউগ দুপুইরা বাড়ি।
চোরা তোর যাত্রা তোর
নিষ্পর, শুনিয়াকে শরিবা ও

দু'চোখেতে কারিশ বাও
পুবে যা পশ্চিমে যা
আমার ঘর-বাড়ি
রইক্তা কইরা যা।

তথ্যসূত্র : রফিয়া বেগম, বয়স-৩৮, মির্জানগর, বরুড়া, কুমিল্লা

প্রয়োগ-পদ্ধতি

মন্ত্রটি পড়ে দরজা বন্ধ করে দরজার মধ্যে দু'দিকে দুটি ফুঁ দিয়ে শুইলে চোর চুরি করতে এসে ঘুরতে থাকে, কোন দিকের দিশা পায় না।

নজর পড়লে/পেট কামড়ালে/মাথা কামড়ালে

নজর পড়া, পেট কামড়ানো, মাথা কামড়ানো বা মাথা ব্যথা ইত্যাদি অসুখে নিম্নের মন্ত্র পড়ে পানি খেতে হয়। মন্ত্রটি হলো,

করাত করাত মোয়া করাত
সরবন তাইলে হরত (করাত)
মোর করাতে কী কাডে (কাটে)
আইতে কাডে যাইতে কাডে
নাম লক্ষ্মীর পূজা কাডে
বান কাডে, টোনা কাডে
নজর কাডে, দৃষ্টি কাডে।

কাড়িয়া কুড়িয়া বান টোনা
শিয়া নজর দৃষ্টি করলাম ছারখার
দোহাই আল্লাহর দোহাই খোদার
দোহাই তক্ত সোলেমান
বাদশার দোহাই।

তথ্যসূত্র : কাদির হোসাইন, বয়স-৭২, শিক্ষা-দশম শ্রেণি, গ্রাম : রাকাশের পর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

সাপে গাভীর দুধ না খাওয়ার মন্ত্র ও পদ্ধতি

হাপ (সাপ) হাপা (স্ত্রী সাপ)
আমি তোর বাবা
যদি আবার বাইনতলে বাইরে যাস
মদিনা শরীফের করাতে পড়স
দোহাই আল্লাহর দোহাই খোদার
দোহাই তক্ত সোলেমান বাদশার দোহাই।
[মহিব উল্লাহ, হাটিরপাড়, মৈশাতুয়া, মনোহরগঞ্জ]

প্রক্রিয়া পদ্ধতি : পরিমাণ মত ইঁদুরের মাটি সংগ্রহ করতে হবে। তবে দশ বছরের পুরনো ইঁদুরের মাটি হলে ভাল। শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে মাটি নিয়ে এসে গরু যেখানে থাকে অর্থাৎ গোয়াল ঘরে সেখানের চার দিকের কোনা বন্ধ করতে হবে। মাটি

পড়ার পর খাঁটি আগুনের কোন অর্থাৎ সূর্যের যে মুখ সেখান থেকে শুরু করে চারদিকে পড়া মাটিগুলো দিয়ে বন্ধ করতে হবে। তাহলে আর সাপে দুধ খেতে পারবে না।

তন্ত্রমন্ত্র এমন এক ধরনের লৌকিক ক্রিয়ার অংশ যার উৎপত্তি ঘটেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কিছু মানুষের প্রতি হিংসাবৃত্তি থেকে। তন্ত্রমন্ত্র গ্রামের সাধারণ মানুষের এমনকি শহুরে শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি হলেও এগুলো এখন লোকসাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তন্ত্রমন্ত্রগুলো সাধারণত অন্ত্যমিল যুক্ত স্বরবৃত্ত অথবা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়ে থাকে, আবার এর সাথে থাকে নানান ধরনের উপমা যা এগুলোর সাহিত্যিক মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তন্ত্রমন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার–শুক্ল জাদু ও কৃষ্ণ জাদু। প্রথম জাদুটিকে বলা হয় মঙ্গলজনক এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় অমঙ্গলজনক বা ধ্বংসাত্বক।

তন্ত্রমন্ত্র

শুক্ল জাদু	কৃষ্ণ জাদু		
ঝাড় ফুঁক	মারণ	সর্পবন্ধন	তদবির ব্যর্থ করার তদবির
টোটকা	উচাটন	শরীর বন্ধন	বানমারা
বটিকা	বশীকরণ	সাপের মুখখিলানী	বন্যা প্রতিরোধ
ভেষজ হালুয়া	হাতিবন্ধন	গৃহবন্ধন মন্ত্র	বিচ্ছেদের তদবির
ভেষজ শরবত	অগ্নিবন্ধন	বিষবেদনার ঝাড়া	বিভেদ সৃষ্টির তববির

তন্ত্রমন্ত্র জাদু বিদ্যার সাথে যারা জড়িত তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, তান্ত্রিক, সাধু-সন্নাসী, পীর ফকির, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালী প্রভৃতি। ব্রাহ্মণপাড়ায়ও বেশ কজন পীর ফকির, ওঝা, বৈদ্য কবিরাজ এ জাতীয় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

তাদের অনেকে নিজেদের কামেল পীর বলে থাকে, অনেকে নিজেদের ভারতের আসাম রাজ্যের কথিত জাদুনগরী কামরুপ কামাখ্যা ফেরত অব্যর্থ তান্ত্রিক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেক সময় তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন তাদের প্রচার প্রসঙ্গে। শুক্ল জাদুর বিষয়টি যেমন প্রকাশ্য কৃষ্ণ জাদুর বিষয়টি তেমনি গোপনীয়। এ অঞ্চলে প্রচলিত কিছু তান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিচয় তুলে ধরা হলো,

ঝাড় ফুঁক : পাতলা পায়খানা, মাথা ব্যথা, বাতের ব্যথা, মুখে ঘা, চোখ ওঠা সহ আরো নানান চিকিৎসার উপায় হিসেবে নানান ধরনের ঝাড় ফুঁক প্রচলিত আছে।

থাল পড়া : এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। কুকুরে কামড়ালে থাল পড়া দেওয়া হয়। কুকুরে কামড়ানো রোগীকে হাটু ভেঙে মাটিতে বসানো হয়। তারপর তার পিঠে একটি পিতলের থালা বসানো হয় এবং মন্ত্র পড়া হয়।

থাল থাল পিতলের থাল
থাল নিলগা চোরে
বিন্দাবনে আগুন লাগলে
কে নিভাইত পারে।

কড়ি চালান : কড়ি চালন করা হয় সাপে কাটা রোগীদের শরীর থেকে বিষ নামানোর জন্য। কড়িতে মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিলে কড়ি সাপের মাথায় গিয়ে বসে এবং সাপটিকে ব্যাকুল করে তোলে রোগীর শরীর থেকে বিষ টেনে আনা জন্য। প্রধানত হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সর্প দেবী মনসা, তাই সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য মনসা দেবীর দোহাই দেওয়া হয়।

বান মারা : এক ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা মূলক কর্মকাণ্ডের নাম বান মারা। বান মারা সময় কবিরাজ/পীর/ফকির একটি পুতুল তৈরি করে। তারপর মন্ত্র/সূরা উচ্চারণ পূর্বক পুতুলের বুকে সুঁচ ফুটিয়ে দেয়। সাথে সাথে কাজ করতে থাকে যার উদ্দেশ্যে বান মারা হয়। বানগ্রস্থ লোক বুকে ব্যথাসহ আরো নানা উপসর্গে ভুগতে ভুগতে দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বিচ্ছেদ ও মিলনের তদবির : স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ, পক্ষান্তরে মিলনেরও তদবির হয়ে থাকে। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের বাণী উল্টো করে লিখে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নারী ও পুরুষের মাঝে বিচ্ছেদ ও মিলনের তদবির করে থাকে।

তন্ত্রমন্ত্র হলো এমন এক লৌকিক ক্রিয়ার অংশ যার উৎপত্তি ঘটেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কুসংস্কার ও প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোবৃত্তি থেকে। এটি যাদুবিদ্যার অংশও বটে যা লোকভাষায় প্রকাশ করা হয়। যাদুবিদ্যা অতি প্রাচীন বিশ্বজনীন বিদ্যা।

সাপের কামড়ের ব্যথানাশ মন্ত্র : সাপের কামড়ে রোগীর চিকিৎসার স্থানীয় বেদে-বেদেনী এই মন্ত্র পড়ে থাকে। রোগীর মুখে গাছের শিকড় দিয়ে বার বার মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। মন্ত্রটি নিম্নরূপ,

বিষ মান্দাইলের ছেপে দিয়া
মনসার দোহাই দিয়া
নাম, বিষ নাম পাতাল নাম
বান ছাইড়া উপড়ে যাচ্
মা মনসার মাতা খাছ
ঈশ্বর মহাদেবের মাতা খাচ।

রূপসী রমণী বশীকরণ : উঠতি বয়সী আবেগী ছেলে-মেয়েরা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পীর ফকিরের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে বশীকরণ তাবিজের জন্য। কামেল পীর ফকিররা এসব তাবিজ, কবজ, মাদুলী দিয়ে থাকে। অনেক সময় পান পড়া ও চিনি পড়া দেওয়া হয়ে থাকে তাদের মন জয় করার জন্য।

বোলতার দংশনে ঝাড়া : বোলতার কামড়ে প্রচণ্ড ব্যথা হলে ব্যথা কমাতে নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় ৩বার,

দক্ষিণে উজান ধল, উত্তরে ঠাকুই
সর্বহরির কিরা দিলাম
বিশ বেদনা উড়ুই।
পূবে পাইল্লা, পশ্চিমে ছাইল্লা
বিমের বুকে দিলাম তুইল্লা
একশ একটা আইল্লা।

বিশ বেদনা উড়াই
ছোঃ ছোঃ

পেট ব্যথার উপশম : পেট ব্যথা থেকে দ্রুত উপশম পাওয়ার জন্য রোগীর নাভীতে পান তেল দিয়ে উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়,

ছাতা পাতা আগা ধরা,
নাইল্যা পাতা তেনা ঝাড়া।
উনাপেনায় বাড়ে জ্বালা
জ্বালার বুহ লাগক তালা।
দোহাই বিষ হরির দোহাই।

পিঠা নষ্ট হওয়ার মন্ত্র : পিঠা তৈরির সময় পিঠা নষ্ট করার যাদু বা মন্ত্র প্রচলিত আছে যা কালো যাদু নামে পরিচিত। গ্রামে একে মুখ লাগানো বলে। পিঠা নষ্ট করার মন্ত্রটি হলো,

আওলা চালের বাওলা পাক
যেমুন পিডা তেমুন থাক।

১. **বাঘবন্দী করার মন্ত্র**
আবের ভাই আতশ
আতশের ভাই ছাই
মারলাল বজ্র
আমার কাছে কুন বাঘের ভয় নাই
শত্রুর ভয় নাই, কুন ভয় নাই।
এই বলে তিনবার তালি দিলে বাঘ মাথা
নিচু করে চলে যায়।

২. **শরীরবন্দী করার মন্ত্র**
মা ফাতেমা ফতে গর
মা কালী রক্ষা কর
ফাং ফাং ফাং
ছাং ছাং ছাং
বাড়িতে সাং
ঘরেতে ছাং
উঠানে ছাং
কুর কুর কুর
লাল গুল্লা লাল
দুহাই বিসমিল্লাহ

৩. **সাপে কাঁটলে কবিরাজি ঔষুধ**
আধা মালতি মূল, পাতা, বাইট্টা যাওয়াতে হইবো।

তারপর জলের তলের তিনটা আমপাতা।
কালো তিনটা কেঁচো, আঠ পোয়া আখের গুড়া
খাওয়ালে বমি হইয়া বিষ বাইর হইয়া যাইবো।

তথ্যসূত্র : এই মন্ত্রগুলো সুরেশ কবিয়াল থেকে প্রাপ্ত। তাং-১৩/১০/২০১১ (রাত-৯টা), গ্রাম : ডুমুরিয়া, থানা-চান্দিনা, বয়স-৮০, শিক্ষা-চতুর্থ শ্রেণি

তন্ত্রমন্ত্র ও এর কর্মপদ্ধতি : তন্ত্রমন্ত্র এর ক্রিয়া পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় তাই এ সম্পর্কে কবিরাজ পীর/ফকির খুব বেশি মুখ খুলতে চান না। এক সময় তন্ত্রমন্ত্র এর ব্যবহার ছিল পরহিতে কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের প্রতিহিংসা বৃত্তির বিকাশ ঘটায় তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবহারিক অর্থাৎ প্রায়োগিক বিধির পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এসব তন্ত্রমন্ত্র এখন মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশি ডেকে আনে।

লোকচিকিৎসাগত বিশ্বাস

১. মৌরির জল দুই ঝিনুক
ত্রিশ ফোঁটা চুনের জলে
লেবুর রস দিয়ে খেলে
বদ হজমে সদ্য ফলে।
ব্যাখ্যা : আগের দিনে ঝিনুকে তরল পদার্থের মাপ ঝোক চলত। মৌরি মসল্লা ভিজানো দুই ঝিনুক পানি ত্রিশ ফোঁটা চুনের পানির সাথে মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে খেলে বদ হজম ভালো হয়ে যায়। এ চর্চা প্রচলিত আছে।

২. সন্তান প্রসবের সময় নারী কষ্ট পেলে
পুষ্পহীন তেঁতুল গাছ এক নিশ্বাসে একটানে উপড়ে এনে গর্ভবতীর চুলে বেঁধে দিলে ভাল হয়ে যায়।

৩. গরুর প্রসব ও প্রসব পরবর্তী যত্নগত বিশ্বাস
গরুর তাড়াতাড়ি 'ফুল' পড়নের লাইগ্যা রাঙা পাতা খাওয়াইতে অয়। ফুল পড়ার আগে গরুডার লেজ থাইক্যা মাথা পর্যন্ত মাইপ্যা সাত গাছি কলমিলতা গরুরে খাওয়াইয়া দিলে গরুর দুধ বেশি পাওয়া যায়। তারপর ছিঁড়া জালের টুকরাতে কাছিমের খোল, কড়ি, ঝাঁটার টুকরা একসঙ্গে বাইন্দা গাইয়ের গলায় ঝুলাইয়া দিলে এই গাইয়ের দুধ কেউ চালতে পারে না।

৪. চিনির সঙ্গে এলাচ দানা খেলে হিক্কা আর থাকে না পোস্তদানা তালমিছরি বেটে নিয়ে জলে শুষ্ক কাশি উঠে আসে চেটে চেটে খেলে।

ধাঁধা

ধাঁধা হলো হেঁয়ালী বা প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্ন। একটি বিষয়কে ঢাকা দেওয়ার জন্য পরোক্ষ ভাষায় বাতাবরণ তৈরি করা হয় ধাঁধার মধ্যে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে অলংকার শাস্ত্রের উপমা, রুপক ও প্রতীকের আশ্রয় নেয়া হয়। প্রত্যেকটি ধাঁধার নিজস্ব উত্তর থাকে। এই উত্তরও ধাঁধার অংশ। যেমন—সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস/মায়ে ছুলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ! এটি একটি ধাঁধার প্রশ্নের অংশ। এর উত্তর 'লবণ' কে নিয়েই ধাঁধাটি পূর্ণতা পায়। লোকসাহিত্যের অন্যান্য ফর্মে আবেগানুভূতি থাকলেও এতে আবেগের স্থান নেই। ধাঁধার ভাষা পদ্যধর্মী। সাধারণ পরিসর দুই-ছয় চরণ। তবে গদ্যের ধাঁধাও রয়েছে, যেখানে অপরপক্ষকে গদ্যে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হয়। বড় আকারের কাহিনিমূলক ধাঁধায় গদ্য অপরিহার্য।

আমরা দেখেছি, প্রাচীন কালে দানব-মানব ও লৌকিক-অলৌকিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছিল ধাঁধার মাধ্যমে। সেখানে ছিল জীবন-মরণের বাজি। বর্তমানে দেখা যায় বিবাহ অনুষ্ঠানে বরপক্ষ-কনেপক্ষ ধাঁধার চর্চা করে থাকে বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য। সাধারণ সাদৃশ্যবোধক রূপ-রঙ-গুণ-ধর্ম ক্রিয়াদি দ্বারা ধাঁধার উপমা প্রতীক-রূপক চিত্রকল্প রচিত হয়। ধাঁধাকে আচার-অনুষ্ঠানমূলক (সাধারণ বিয়ে), চ্যালেঞ্জসূচক, শাস্ত্রীয় তথ্যমূলক, অঙ্ক ও সংখ্যামূলক ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে বিশেষজ্ঞগণ উত্তর ধরে নিম্নোক্ত শ্রেণিকরণ করেছেন। যেমন, ক. মানুষ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিষয়ক, খ. পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নরনারী, গ. প্রাণী ও প্রাণী অঙ্গ, ঘ. উদ্ভিদ, লতাপাতা, ফুল-ফল-মূল, ঙ. প্রকৃতি ও নিসর্গ, চ. খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র, ছ. অঙ্ক ও সংখ্যা, জ. বাদ্যযন্ত্র, ঝ. ভাব ও ক্রিয়া।

ধাঁধা এক প্রকার রহস্যপূর্ণ রচনা। এর আরেক নাম হেয়ালি। ধাঁধায় এমন কিছু শব্দ থাকে যার সাথে উপমা রুপক প্রতীক ব্যবহার করে একটি প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তর থাকে ধাঁধার ভেতর লুকিয়ে। কিছুদিন পূর্বেও বয়োজেষ্ঠ্যরা কনে দেখতে গেলে কনের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য ধাঁধা ধরতেন তাদের।

উদ্ভিদ ও ফলমূল বাচক

জঙ্গল থাইক্কা আইল দুইত্তা
পাতে দিলো মুইত্তা।

উত্তর : লেবু।

তিন আত গাছটা
ফুল ধরে পাঁচটা।

উত্তর : বেগুন।

ঘরের মইধ্যে কুড়া

এক কুবানে বুইড়া।

উত্তর : কলা গাছ।

আতির দাত, ময়ূরের পাখ
এই শুল্লুক ভাঙ্গাইত না পারলে তে গাদার জাত

উত্তর : মুলা।

পাকাতে তুল তুল
কাঁচাতে দল।
লেংডা অইয়া হাডে যায়
জিব্বায় অইয়ে জল। রতন কুমার শীল, দূর্গাপুর।

উত্তর : তেতুল।

চাইর খান কাডা কুড়া
মইদ্যে একটা লাল বেডা। মোতালেব মিয়া, ভিটিকান্দি।

উত্তর : আনারস।

এই পাড় লাইল, হেই পড়া লাইল
কেমনে খেত জুয়াড় আইল। যোগেন্দ্র নাম, গৌরীপুর।

উত্তর : ডাব।

উডান কোনাইচ্চা হেজা যায়
হেজার মাংস নুন দিয়া খায়। প্রাণতোষ সাহা, গৌরীপুর।

উত্তর : আনারস।

ভূমিতে জর্ম তার
ডাঙ্গায় করে বাস।
শুভতে কামে লাগে
সে অইল ফাঁস।

উত্তর : হলুদ।

মামার বাইত গেলাম
খেঢ় বিছাইয়া ঘুমাইলাম।

উত্তর : তরমুজ বা চিন্দাইর ফল।

ধয়ানে গোসল ধেয়ানে ভোজন
এক লগে তিন কাম করে কোনজন?

উত্তর : মাছরাঙা পাখি।

পেট দিয়া খায়, তারগাল দিয়া ছাড়ে
এমন কি জিনিস আছে এই ধরার পড়ে?

উত্তর : যাঁতা।

ডাক দিয়া ডর দেহাই
আলো দিয়া পথ দেখাই।

উত্তর : বিদ্যুৎ চমক।

প্রাণী ও তার অঙ্গবাচক

তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে।
মইধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
আকাশেতে উড়ে।
উত্তর : চিল/চিতল।

উপরে উড়তে পারে
মুখ খানা তার লম্বা
দেহটা সাদা তার
পুকুরেতে প্রাণটা।
উত্তর: বক পাখি।

এক বেডির নাম পার্বতী
নাচতে নাচতে অয় গর্ভবতী।
উত্তর: শালিক পাখি।

ইডের গুড় গুড় বৈগর নাগর
বিনা বৈডায় যায় সে সাগর। মহিন্দ্র নাম, জিয়ারকান্দি।
উত্তর : কাছিম।

ইংরি বিংরি, তিংরি ভাই
চোখ দুইডা তার মাতা নাই। মেঘী রানী দাস, মজিদপুর।
উত্তর : কাকড়া।

ছোট্ট একটা প্রাণী
দশে ধরে পাঁজনে মারি। মোতালেব মিয়া, ভিটিকান্দি।
উত্তর : উকুন।

এক শিং বারো ঠ্যাং
কোন প্রাণীর আছে
জলেতে জন্ম যার
ডিম পারে গাছে। গোলাম হোসেন, গৌরীপুর।
উত্তর : চিংড়ি।

বাঘের মতো লাফায়
কুকুরের মতো বসে
এমন কোনা প্রাণী আছে
এই ধরার পরে। প্রীতম নাথ, জিয়ারকান্দি।
উত্তর : ব্যাঙ।

জলেতে জর্ম তার
মুখ ভরা দাড়ি
ওঝা নয় বৈদ্যা নয়
জলে ঘর বাড়ি। বিবি মরিয়ম, মজিদপুর।

উত্তর : চিংড়ি।
এক বাইত তিন বউ
এক পলাইলে রান্না যোও।
উত্তর : চুলা/উনুন।
ধেয়ানে গোসল ধেয়ানে ভোজন,
এক লগে তিন কাম করে কোন জন?
উত্তর : মাছরাঙা পাখি।

খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র বাচক

এক গাছ টান দিলে
বেত গাছ লরে
কক্কায় ডিম পাড়লে
গঙ্গায় ভাসে।
উত্তর : মাখন।
রাঙা বউটি হাটে যায়
থাফরা খাইয়া জীবন যায়।
উত্তর : মাটির হাড়ি।
ঘরের ভিতরে ঘর
তার ভিতরে কইন্যা আর বর।
উত্তর : মশারি।
তুমি থাকো খালে বিলে
আমি থাকি ডালে ডালে।
তোমার আমার দেখা হবে
মরণের কালে। আরতী রাণী বালা, রামভদ্র।
উত্তর : মাছ ও মরিচ।
শুর দিয়ে করি কাজ
নই আমি হাতি।
করি আমি পরের উপকার
তবু খাই লাথি। জিমলা খাতুন, সাতানী।
উত্তর : ঢেঁকি।

বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক

কান্দ আইয়া কান্দ যাই
বিনা দোষে মাইর খাই।
উত্তর : ঢোল
তালে চলে দুই আতে তারা দুই ভাই
বাইদ্য লগে নিত্য দেহে সন্দেহ যে নাই,

মধুর ধ্বনি তার প্রথম অক্কর ক
মর্হদ্যের জোড়ার খবর কইব নাকো।
উত্তর : করতাল।

প্রকৃতি ও নিসর্গ বাচক

মামা ডাহে মামা কয়
বাপেও ডাহে তাই।
পুতে কয় মামা তারে
না সে মায়ের ভাই।
উত্তর : চাঁদ মামা।

যতই কাটবা তুমি যাইব তত বাইড়া
জল যদি দেও তাতে ছুটব তেইড়া।
উত্তর : নদী।

এক থাল সুপারি
গুণতে পারে কোন ব্যাপারী?
উত্তর : আকাশের তারা।

একই ডাইলে দুইডা ডিম
একটা গরম একটা হিম।
উত্তর : সূর্য ও চন্দ্র।

থাল থাল পিতলার থাল
থাল নিলগা চোরে
বিন্দাবনে আগুন লাগাইলে
কে নিভাইত পারে?
উত্তর : সূর্য।

একটা থালা জ্বলে আকাশের তলে
কইতে পার কী কোন ছলে?
উত্তর : চাঁদ।

সকালে জর্মলাভ, বিকালে মরণ
তার অভাবে সর্বজীবের বিফল জীবন। জ্যোতি বালা সাহা, কড়িকান্দি।
উত্তর : সূর্য।

অন্ধ বাগান, বন্ধ্যা গাছ
ফুল ফোডে বার মাস। জমির উদ্দিন, জগতপুর।
উত্তর : আকাশের তারা।

কোন পুতের মরণ অইল
নিজ পিতার আইত
সেই পিতারে হিন্দু জাতি
প্রণাম করে প্রাতে। প্রদীম চন্দ্রশীল, কড়িকান্দি।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ।

অক্ষর ও সংখ্যাবাচক

কালিদাস পণ্ডিতে কয়
কইল্য কালের কথা।
নয় লক্ষ তেতুল গাচে
কয় লক্ষ পাতা? হরিপদ নম, বলরামপুর।

উত্তর : আঠারো লক্ষ পাতা।

দিন গুনি সপ্তাহ গুনি
আর গুনি মাস
এমুন কইরা কাডাই বারোমাস। যোগেন্দ্র নাথ, গৌরীপুর।

উত্তর : ক্যালেন্ডার।

কালিদাসের ফাঁকি
আড়াইশ মেইক্কা।
পাঁচ পঞ্চাশ গেলে
কত থাহে বাকি। সুনীল চন্দ্র শীল, সাতানী।

উত্তর : শূন্য।

এক গাছে এক বুড়ি
চোখ তার বারো কুড়ি। সুকান্ত চন্দ্র রায়, মাছিমপুর।

উত্তর : আনারস।

আতুরা বাডাল বাইশটা
চোরে নিলগা তিনডা
আর থাহে কয়ডা? মোতালেব মিয়া, ভিটিকান্দি।

উত্তর : একটাও না।

ভাব ও ক্রিয়াবাচক

এই পাড়ে কল, হেই পাড়ে কল
মইদ্যে খানে লাল। আরতী রানী সরকার, বলরামপুর।

উত্তর : সিথীতে সিদুর।

তিন মাথা দশ পাও
তারে চিইপ্পা রস খাও। জরিনা খাতুন, কলাকান্দি।

উত্তর : দুধ দোহন করা

দুই আড়ু ফাগাইয়া
মইধ্য খানে লাগাইয়া।
যাতা দিলে কাম অয়
যা বুঝ তা নয়। আরতী রাণী সরকার, বলরামপুর।

উত্তর : সুপারী কাটা।

দিবার কালে কষাকষি

ভিতরে গেলে মন খুশি।
যদি ধর ভণ্ড
পঁচিশ ট্যাহা অইব দণ্ড।
উত্তর : মেয়েদের হাতে চুড়ি পরানো।
দুই পাশে ঢাল
মইধ্যে খানে খাল,
তার মইধ্যে লাল
বরযাত্রী হেয়ালী কয়
যা ভাবছ তা নয়।
উত্তর : গাই দোহন করা।
কোন সাগরে নাইযে পানি
কও তো দেহি আমি হুনি।
উত্তর : বিদ্যাসাগর।

সংগৃহীত ধাঁধা

হাত নাই পা নাই, গায়ে খাড়ু
মুখ নাই, জিহ্বা আছে, খায় শুধু লাড়ু।
খোদার সৃষ্টি নয় জীব হিংসা করে
নাভি ধরে টান দিলে ভীষণ শব্দ করে।
উত্তর : বন্দুক।
[জহিরুল হক, কর্মচারী, মহেশপুর হাই স্কুল, মহেশপুর, বরুড়া]
জন্মে সাদা, কর্মে কালা
গলায় লোহার হার
লাফ দিয়ে আহার করে
লম্বা লেজ তার। [উত্তর : জাল]
[জহিরুল হক, মহেশপুর হাইস্কুল, বরুড়া]
লাল মিয়া হাটে যায়
সব মানুষের থাপ্পড় খায়।
উত্তর : মাটির হাড়ি পাতিল।
সেজেগুজে যায় নারী
পরপুরুষের কাছে
একটুকানি দিলে নারী
উসবিস করে
সবটুকুন দিলে নারী
ইচ্ছে ইচ্ছে করে।
উত্তর : নারীর হাতে চুড়ি পরানো।
[মফিজ, মহেশপুর, বরুড়া]
এক গাছে তিন তরকারি

গাছের আগায় লাল ব্যাটারি।

উত্তর : কলাগাছ ও তার থোড়।

ছয় পায়ে আসে
চার পায়ে বসে
দুই পায়ে ঘষে

উত্তর : মাছি।

[সুফিয়া বেগম, মহেশপুর, বরুড়া]

দেখে আইলাম অন্তার বিলে
নিজের মাথা নিজে গিলে।

উত্তর : কচ্ছপ।

কালিদাস পণ্ডিতের কথা
নয় হাজার তেঁতুল গাছের
কয় হাজার পাতা?

উত্তর : আঠারো হাজার পাতা।

ব্যাখ্যা : উঠা অবস্থায় দুই পাতা ধরে নিয়ে।

আমার একটা লোহার গাই
যত দোহাই তত পাই।

উত্তর : নলকূপ ও তার পানি।

কাটা যায়, বাটা যায়
দেওয়া যায়, কিন্তু খাওয়া যায় না।

উত্তর : তাস।

দশজনে দৌড়ায়
দুইজনে ধরে
তালেবপুরে বিচার হয়
নক্ষীপুরে মারে। [সংগ্রহ : কাশেম মাস্টার, মহেশপুর, বরুড়া]

উত্তর : উকুন।

ব্যাখ্যা : উকুন ধরার পর হাতের তালুতে রাখা হয় বলে তালেবপুর বলা হয়েছে এবং নখে রেখে মারে বলে লক্ষীপুর বলা হয়েছে।

বন থেকে আইলো বুতি
বুতি বলে তোর পাতে মুতি। [উত্তর : লেবু ও লেবুর রস]
মুখ দিয়ে বমি করে
রক্ত তার কালো
তোমার আমার সবার কাছে
এই জিনিসটা ভালো। [উত্তর : কলম।]
নাই মুখ নাই মাথা
টিপ দিলে বলে কথা। [উত্তর : রেডিও।]
খুললে ঘর, বন্ধ করলে লাঠি= (ছাতা)

কালো মেয়ে আকাশে চলে
কলসি থেকে পানি ফেলে=মেঘ
কাগজে আছে কলমে আছে
পৃথিবীতে নাই
ঢাকায় আছে, চাকায় আছে
নোয়াখালীতে নাই। = ক অক্ষর।
পাহাড়ে গ্যালাম, পর্বতে গ্যালাম
নল ভাইসা জল খাইলাম= আখ/ইক্ষু খাওয়া।
নাক ধরতেই ধরে কান
বল এ কোন রসিক চান= চশমা
সবুজ বুড়ি হাটে যায়
ভদ্রলোক চিমটা খায়= লাউ।
শোলো গরুর কয়টি ঠ্যাং= চারটি

ব্যাখ্যা : এখানে ষোলটি গরুর পায়ের সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়নি। বোঝানো হয়েছে যে একটি গরু শুয়ে আছে।

হারাইলে খুঁজি তারে
পাইলে নেইনা তারে।
উত্তর : পথ/রাস্তা।
এক সারিতে দুই ভাই
কারো সাথে কারো দেখা নাই।
উত্তর : দুই চোখ।
ভেবে চিন্তে বল ভাই
কোন গ্রামে মানুষ নাই?
উত্তর : টেলিগ্রাম।
চামড়ার ওপর চামড়া
এই শুল্লুকটা না ভাঙ্গাইতে পারলে
শ্বশুর বাড়ির দামড়া।
উত্তর : কলাগাছ
এক গাছের বার ডাল
তিরিশটি তার পাতা
এক পিঠে সে কালো
অন্য পিঠ তার সাদা।
উত্তর : বছর, মাস, রাত-দিন।
চার অক্ষরে জেলার নাম
প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিলে সবজির নাম
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে সংখ্যার নাম
উত্তর : সাতক্ষীরা।

মাটির নিচে বাড়ি, পরণে লাল শাড়ি
বলতো কী?

উত্তর : পেঁয়াজ।

জন্মদাতা জন্ম দিল না, জন্ম দিল পরে, যখন ছেলের জন্ম হল মা ছিল না ঘরে। বলতো কী?

উত্তর : হাঁস।

আমি যারে আনতে গেলাম, তারে দেখে ফিরে এলাম, সে যখন চলে গেল, তারে আমি নিয়ে এলাম।
বলতো কী?

উত্তর : বৃষ্টির পানি।

জোয়ানের একবার,
বুড়ার চার বার।
বলতো কী?

উত্তর : সুঁই।

সাগরেতে জন্ম আমার,
সাগরেতে বাস,
মায়ের ছোঁয়া মৃত্যু
আমার, এই কি সর্বনাশ
বলতো কী?

উত্তর : লবণ।

আমি থাকি খালে কী বিলে
তুমি থাক গাছের ডালে,
দুইজনের মিলন হবে
মরণের ও কালে।
বলতো কী?

উত্তর : মাছ এবং মরিচ।

খাল বিল শুকিয়ে যায়,
গাছের আগায় পানি রয়ে যায়।
বলতো কী?

উত্তর : ডাব।

উঠান ঠন ঠন, বৈঠক মাটি
কোন কুমারে গড়েছে ঘটি?
বিনা দুধে হইলো দই
এমন কুমার পাই বা কই
বলতো কী?

উত্তর : চুন রাখার পাত্র।

কোঠা কোঠা নব্বাই কোঠা
বেত লাগে আশি মোটা,
সোনার কামনা ভাই,
কোঠাতে কেন বান নাই?
বলতো কী?

উত্তর : মৌমাছির বাসা।

তিন অক্ষরে নাম যার
খাইতে লাগে তিতা,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
খাইতে লাগে মিডা?
বলতো কী?

উত্তর : করলা।

গাছ কালো
ফুল সাদা
গাছের নাম রক্তমালা
বলতো কী?

উত্তর : পাটিপাতা গাছ। (গাছটির প্রকৃত নাম জানা যায়নি)

চার পাশে চারটি খুঁটি
মাঝখানে খালি বিটা
তার মাঝে সাদা পানি।
বলতো কী?

উত্তর : গরুর দুধ।

একটা রুপা দুইটা ছাল,
বেত দিইয়া নামাইলাম কোন কাল।
বলতো কী?

উত্তর : কলার গাছের বরগ।

এক বন থেকে বের হল এক বুঁড়ি
চোখ তার আঠারো কুঁড়ি।
বলতো কী?

উত্তর : আনারস।

চলিতে চলিতে যার চলা হল ভার,
মাথাটা কাটিয়ে দিলে চলে
সে আবার।
বলতো কী?

উত্তর : কাঠপেন্সিল।

গাছের নাম হিরা,
কেউ বলে পান, কেউ

বলে সুপারি
কেউ বলে জিরা।
বলতো কী?

উত্তর : কদম গাছ।

আট পা
ষোল হাটু,
তার নাম
রাম কাটু
বলতো কী?

উত্তর : কাঁকড়া

লাল বুড়া বাজারে যায়
দুই গালে দুই চড় খায়।
বলতো কী?

উত্তর : মাটির কলসি।

শিশুকালের বড় লেজ, বয়সকালে ঘসে
বাঘের মত লাফ দিয়ে, কুত্তার মত বসে

উত্তর : ব্যাঙ।

দেইখ্যা আইছি কাজীর হাটে
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে

উত্তর : দরজার খিল

গাছ নাই পাতা
মুখ নাই বলে কথা

উত্তর : বই।

পাঁচজনে ধরে
বত্রিশ জনে করে
এমন করা করে
রক্ত নিয়া ছাড়ে-

উত্তর : পান খাওয়া

হাত নাই পা নাই পেটটা হলো সার
সারা জীবনে করেছে একবার আহার

উত্তর : বালিশ।

এমন একটা কাঠের গাই
বিকাল পানায়, সকালে দোয়ায়

উত্তর : খেজুর গাছ।

চার কলসি দুধে ভরা
ঢাকনা ছাড়া উবুত করা

উত্তর : গাভীর বাট।

টানলে কমে, কাটলে বাড়ে কোন দুই জিনিস (বিড়ি ও পুকুর)
রাত হলে দিতে হয়
না দিলে ক্ষতি হয়

উত্তর : দরজা।

শিশুকালে কাপড় পরে
বউ হয়ে থাকে
বড় হয়ে কাপড় খুলে
ল্যাংটা হয়ে নাচে

উত্তর : বাঁশ।

চিৎ করে ফেলে
উপুড় হয়ে করে
এমন করন করে
গহনা সহ নড়ে

উত্তর : শিল-পাটায় মরিচ বাটা।

কালিদাস পণ্ডিতের ফাঁকি
উনচল্লিশ থেকে তিনশ গেলে কত থাকে বাকি?

উত্তর : ছত্রিশ।

ব্যাখ্যা : এখানে ৩৯টি ব্যঞ্জন বর্ণ থেকে ৩শ অর্থাৎ 'শ' 'ষ' 'স' এক কথা বলা হয়েছে।

তিন অক্ষরে নামটি তার
রয়েছে এশিয়াতে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
বড্ড ঝাল লাগে

উত্তর : শ্রীলঙ্কা নামক দেশ।

এখান থেকে ফেললাম ছুরি
ছুরি গেলো মামার বাড়ি।

উত্তর : চিঠি।

সমুদ্রে জন্ম নয় / জন্ম হইল খালে (চামড়ায়)
বিধির বিমতি হইলে/ টপকে ওঠে গালে (জুতা)

ব্যাখ্যা : এখানে খাল কথাটি দিয়ে ইংরেজি Canal বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে চামড়া।

হলুদের চকচক / দুধের শর
এই শুল্লুকটা না ভাঙ্গইতে পারলে/শালীর হাতের চড়

উত্তর : ডিম।

ব্যাখ্যা : সাধারণত বিয়ের গেইটে শালীরা দুলাভাইকে এ ধাঁধা ধরে।

আমার একটা পাখি আছে, যা দেই তা খায়/পানি দিলে মইরা যায়

উত্তর : আগুন।

এক গাছে তিন বান/কইতে পারলে মুসলমান

উত্তর : মরালাশ।

সরালি সরালি ডিমা (ডিম) পাড়/পাইড়া আইছি শতে শতে/গণতে (গুণতে) পারতো না তোর বাপের গুতে

উত্তর : তারা।

৩৫ গ্রামে তিন বিরা পান ভাগ করে দিতে হবে তবে প্রত্যেক গ্রামেই ১ বিরা পান দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : এটি একটি অঙ্কমূলক ধাঁধা। ১ বিরা দিতে হবে কুড়িগ্রামে (২০গ্রাম), আর এক বিরা দিতে হবে চৌদ্দ গ্রামে (১৪গ্রাম), অপর পানের বিরাটি দিতে হবে চট্টগ্রামে (১গ্রাম)।

ডালডায় (ডালটিতে) পাতা, মহিরমের গাছ/ফুল হয় না, ফল তার ধরে বার মাস

উত্তর : পান।

এম এম এম/কান্দ (কাঁধে) কইরা ন্যাম (নেব)
এই শুল্লুকটা ভাঙ্গাইতে পারলে / পাঁচশ টাকা দ্যাম

উত্তর : মরা লাশ।

পরিস্থিতি : বাড়িতে মায়ের অসুখ, গাছ থেকে লেবু আনা দরকার, আনতে গিয়ে দেখা গেল গাছের গোড়ায় বসে আছে সাপ এবং গাছে বসে আছে বানর। সাপকে না তাড়িয়ে কীভাবে লেবু আনা যায়?

সমাধান : বানরকে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে আঘাত করতে হবে। বানর তখন গাছের লেবু দিয়ে আঘাত করার জন্য লেবু ছুঁড়ে মারবে।

তারা বাপ-পুত, তারা বাপপুত
নারকেল পড়ল ধুপাধুপ
নারকেল হল তিনটা
জনে পায় কয়টা

উত্তর : একটি করে।

উপরে ছাদ, মইধ্যে গাতা (গর্ত), ভিতরে মাথা

উত্তর : শামলা।

আমার ধর্ম হলো ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা রাখি গরমকে গরম রাখি। আমি কে?

উত্তর : ফ্ল্যাক্স।

এক চিলের দুই পা/চার চিলের (চাচির্লের) কয় পা? (২টি)

ব্যাখ্যা : এখানে চার্চিল (চার চিল) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী।

এক ছাগলের তিন মাথা/ছাগলে খায় দুনিয়ার লতাপাতা

উত্তর : চুলা উনুন।

এত কাঁটার ভেতর বেত কাঁটা/তার ভেতরে সাহেব বেটা

উত্তর : আনারস বা কাঁঠাল।

বিয়ে অনুষ্ঠানের ধাঁধাঁ

প্রশ্ন কর্তা : এগার বার তের/এই গ্লাসটি কেন ধর?

উত্তর দাতা : এক, দুই, তিন/আজকে আমার ধরার দিন।
সাজাইলে সাজে/বাজাইলে বাজে/পানিতে থাকে, মাছ
আসমান সবুজ/জমিন ভরা/তাদের ভেতরে গুল্লি ভরা
উত্তর : কাঁচা পেঁপে।
চার পায়ে বসি আমি/আট পায়ে হাঁটি/বাঘ ও নয় ভাল্লুকেও নয়/আস্ত মানুষ গিলি
উত্তর : পালঙ্ক।
মাটির হাড়ি, কাঠের গাই/বছর বছর দোয়াইয়া খাই
উত্তর : খেজুর গাছ ও তার রস।
গাছ কালা/ফুল ধলা (সাদা)/গাছের নাম রক্তমালা
উত্তর : মুর্তা গাছ ও তার ফুল।
হরির ওপরে হরি/হরি শোভা পায়/হরিকে দেখিয়া হরি/হরিতে লুকায়
ব্যাখ্যা ও সমাধান : এটি একটি সাহিত্যিক ধাঁধা। বাংলাতে হরি শব্দের নানা রকম অর্থ হয়। পানির ওপর অনেক হাঁস (হরির ওপরে হরি) এবং পদ্মফুল ফুটে আছে (হরি শোভা পায়)। তারপর সাপ দেখে একটি ব্যাঙ (হরিকে দেখিয়া হরি), পানিতে ঝাঁপ দেয় (হরিতে লুকায়)।
ওগুর তলে মুগুরটা/তের হাতি লেঙ্গুরটা (লেজটা)
উত্তর : জাল (খেপলা)।
এক বিরা পান/পনের বিরা বান এই শুল্লুকটা ভাঙ্গাইতে পারলে/পাক্কা মুসলমান
উত্তর : কোরান শরীফ।
এমন একটি দেশের নাম বল যার মাঝের অক্ষর বাদ দিলে দুটি ফলের নাম হয়?
উত্তর : বেলজিয়াম (মাঝের 'জি' বাদ দিলে বেল এবং আম)।
একটি গাছে ৪টি আম। ১টি ভর্তা, ১টি গুড়গুইড়, ১টি উইড়া, ১টি গাছে রইছে। কোনটি খাইবেন?
ব্যাখ্যা ও সমাধান : এখানে একটি গাছ হলো মানুষ। এখানে গাছের ৩টি আম হলো মানুষের বর্জ্য যা যথাক্রমে গু, মূত্র ও পাদ। অর্থাৎ আম গাছেরটি খাওয়ার কথা বলাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।
সীতার অপর নাম জান কী?
উত্তর : জানকী (প্রশ্নেই উত্তর)
আট পাও ষোল আড়ু (হাঁটু)
তার নাম নিমাই ঠাড়ু
শুকনায় পাতিয়া জাল
মাছ খায় চিরকাল
উত্তর : মাকড়সা ও তার জাল।

পুকুরের এই পাড়ে হেই পাড়ে আমাইলতি গাছ/ফুল ও না, কড়া ও না, ধরে বার মাস

উত্তর : পান।

ঘরের পিছে মোর্তার মুড়া/হাত দিলেই পাই ইছার (চিংড়ি) দুরা।

উত্তর : উকুন।

একটা বিল্ডিং এক তলায়, একটা পাথর দুই তলায়, ৩২টি পাথর ৩ তলায়, ২টি ছিদ্র ৪ তলায়, ২টি ফুটবল ৫ তলায়, আর একটি জঙ্গল এবং জঙ্গলটি পোকা মাকড়ে ভরা। এটি কী?

সমাধান : এটি হলো একজন মানুষের মাথা।

লম্বায় লম্বারে ধরে/লম্বায় বাইট্টারে (খাটটিকে) ধরে / বাইট্টায় মারারে ধরে/মরায় জ্যাতাকে (জীবিতকে) ধরে।

ব্যাখ্যা ও সমাধান : এটি হলো বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। লম্বা ছিপে লম্বা রশি বাঁধা হয়। সুতায় বাঁধা থাকে ছোট বড়শি। বড়শিতে গাঁথা হয় মৃত/জড় খাবার বা আধার। এই আধারসহ বড়শিই জীবিত মাছ ধরে।

একটা পইখের তিনটা ডানা
শীতকালে তার চলতে মানা। আবুল কাশেম, দূর্গাপুর।

উত্তর : পাখা/ফ্যান।

দুই গাছের চিফা দিয়া
প্যাচা যায়গা ভেচকি দিয়া। সাথী রাণী সাহা, গৌরীপুর।

উত্তর : করাত।

দিলে খাই না
না দিলে খাই। মো : তোতা মিয়া, গৌরীপুর।

উত্তর : গরুর মুখ বন্ধনি/কাপাইড়

মুখ দিয়ে বমি করে,
রক্ত কালো কালো।
তোমার আমার সবার আছে
জিনিসটা খুব ভালো। স্বাতী কর্মকার, রামভদ্র।

উত্তর : কলম।

হাত আছে পাও নাই
মাথা তার কাটা।
আস্তা মানুষ গিল্লা খায়
বুক খানা তার কাড়া। রতন কুমার শীল, দূর্গাপুর।

উত্তর : শার্ট।

এই কূল আর, হেই কূলও আরা
মইদ্য খান গাতা,
হরে কৃষ্ণের নাম লইয়া
দাও যাতা। পুষ্প বালা নম, সাতানী।

উত্তর : বিয়ের মৌটুপ।
চাইর পাওয়ে বই আমি
আট পাওয়ে চলি।
বাগও না সিংকও না
আন্তা মানুষ গিলি। কানন বালা সরকার, গৌরীপুর।

উত্তর : পালকি।
তিন অক্ষরে নাম তার
ঘরের ভিতরে রয়
পইলা অক্ষর বাদ দিলে
খাইদ্য বস্তু অয়।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
বিছা তারে কয়
বলতো এইটা কী জিনিস হয়? সৌমিত্র চক্রবর্তী, নারান্দিয়া।

উত্তর : বিছানা।
গাছের আগত হৈলের পোনা
কইরে যাচ ভাই উইড়া কানা? ভগবান দাস, জিয়ারকান্দি।

উত্তর : খেজুর।
মাড়ির তল থাইক্কা উঠছে সাধু
শিকিড় বাকর লইয়া।
সবাইর সামনে রইল,
ল্যাংড়া চোংড়া অইয়া। সুনীল চন্দ্র শীল, সাতানী।

উত্তর : পেঁয়াজ।
উপুইড়া গাঙের মুগুইড়া কই
মুগুইর দিয়া ভাঙে কাডা
এই শুল্লোকটা ভাঙাইতে পাল্লে
জমিদারের ব্যাডা। কানন বালা সরকার, গৌরীপুর।

উত্তর : কাছিম।
এক ছাগলের দুই মাথা, খায় শুধু লতা পাতা

উত্তর : মাটির চুলা।
কালো বাগান কালো ফড়িং।

উত্তর : উকুন।
যাকে আমি আনতে গেলাম তাকে দেখে ফিরে গেলাম যে যখন চলে গেল।
তাকে নিয়ে ফিরে গেলাম।

উত্তর : বৃষ্টি।
বাবা দেয় একবার মা দেয় বারবার

উত্তর : সিঁদুর।
ঘর আছে দুয়ার নাই মানুষ আছে মাত নাই।

উত্তর : কবর

উপরেতে লোহার পেচ তার উপরে আয়না
মাঝখানেতে সাদাগরের লাল টকুটুক কন্যা।

উত্তর : হারিকেন।

উপরে নিচে মাডি
মাঝে একটা তেলতিল্লা লাডি।

উত্তর : বাইন মাছ।

হাত নাই পাও নাই ঘুরে দেশে দেশে অনাহারে খুঁজে পায় শেষে উত্তর টাকা মোবাইলে একটি বিয়ে হল। বছর কয়েক পর স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল এ সন্তানটি কার? স্ত্রী এর উত্তরে বলল যা ভাবছ তা নয় ছেলে কিন্তু আমার নয়।

উত্তর : মেয়েটির ভাই।

তথ্যসূত্র : মোসাম্মৎ খায়রুন্নেছা, হিন্দুলা চৌদ্দগ্রাম

দোনার চিড়া দোনায় খায়/খাইব
আরকা চিড়া লড়বড়াইতো (যার খাবার সে খাবে, রেখে লাভ কী?)
তাইর থাইক্যা তাই ভালা। (অর্থাৎ একজনের চেয়ে অন্যজন আরো ভালো)
কইতরের পা সুন্দর, মেরার (ভেড়ার) ছাও সুন্দর।
ডাক্তার বুড়া হিরার ধার
নাপিত বুড়া কামের ভার
নডি বুড়া গইট্যা সার। (ডাক্তার যত বৃদ্ধ হয় ততো তার অভিজ্ঞতা বাড়ে, নাপিত বয়স হলে চোখে দেখেনা নষ্ট মেয়ে মানুষ বৃদ্ধ হলে তার দাম থাকে না)।

কারণে কারণ খাইছে,
কারণ খাইবা কী দিয়া,
সেই কারণে এই কারণ
কারণ দেওগো ছাইড়া।

ব্যাখ্যা : কারণ এখানে ব্যক্তির নাম, অপর কারণ ব্যবহার করা হয়েছে ছাগল অর্থে। অর্থাৎ কারণ নামে এক ব্যক্তি ছাগল চুরি করে দোকানে মশলার জন্য গেলে দোকানদার তাকে আটকে রাখে। ঐ ছাগলটি ছিল দোকানদারের। তারপর তাকে শর্ত দেয়া হয় সে যে কারণে তাকে আটকে রেখেছে সে যদি তার মুক্তি চায় তাহলে ছাগল ছেড়ে দিতে হবে।

শোলকী ধাঁধা

এই পান আনতে গেলে
হেই পান খায় বাঘে
হেই পান আনতে গেলে
এই পান খায় ছাগে।

পরিস্থিতি : একটি ছোট বাঘ, একটি ছাগল ও এক বিড়া পান নিয়ে বিপদে পড়েছে এক ব্যক্তি। কীভাবে একটি একটি করে নদী পার করলে বাঘ ছাগলকে কিংবা ছাগল পানের বিরা খেতে পারবে না?

ব্যাখ্যা ও সমাধান : প্রথমে পার করতে হবে ছাগলটিকে। তারপর ফিরে এসে নিতে হবে পানের বিড়া। তারপর পানের বিড়া ওই পাড়ে রেখে সেখানে থাকা ছাগলটিকে আবার পূর্বের পাড়ে নিয়ে আসতে হবে। তখন ছাগলটিকে ঐ পাড়ে রেখে বাঘটিকে নিয়ে আসতে হবে। সবশেষে ছাগলটিকে নিয়ে আসতে হবে।

কোন শহরে পাব না?

উত্তর : পাবনা

কোন শহর খালি না থেকেও খালি?

উত্তর : নোয়াখালী

ফ্রান্সের রাজধানী বলতে প্যারিস?

উত্তর : প্যারিস

ব্যাখ্যা : এতে প্রশ্নেই উত্তর রয়েছে।

কোন দেশের নাম উল্টালে গালি হয়?

উত্তর : লাসা (শালা হয়)

কোন ফল খায় না

উত্তর : পরীক্ষার ফল

পোন্দে ঠেলে, মুখে খায়/পেট ভরলে বাইত যায়?

উত্তর : কলস।

কান্দ আই, কান্দ যাই
বিনা দোষে মাইর খাই। জিমলা খাতুন, হোমনা সদর।

উত্তর : ঢোল।

তিন তেরো দিয়া বার
নয় দিয়া যোগ কর।
আমার স্বামীর এই নাম
পার কইরা দেও বাইড়ত যাম। ফজিলাতুননেছা, ঘরমোড়।

উত্তর : ষাইডা গাজী।

রজনীতে জন্ম তার দিবসে মরণ,
বিনা পথে শূন্য পথে করে সে ভ্রমণ। ফাতেমা আক্তার, আসাদপুর।

উত্তর : আকাশের তারা।

ইডের গুড় গুড় বৈগর নাগর
বিনা বৈদ্রায় যায় সে সাগর। বাদল চক্রাবর্তী, হোমনা সদর।

উত্তর : কাছিম।

উকটান বুকটান
কোন জিনিসের তিন কান? মো. ইব্রাহীম, শ্রীমদ্দি।

উত্তর : চুলা

দুই দিকে ঢাল
মইদ্য খানে খাল।
তার মইদ্যে লালা
বর যাত্রী হেয়ালী কয়
যা ভাবছ তান নয়। ফজলু মিয়া, ভাসানিয়া।

উত্তর : সিঁথিতে সিঁদুর দেয়া।

জামাই আইল কামে
কইতে পারি না লাজে।
আমার একটা কাম আছে
দুই ঠ্যাংয়ের মাঝে। জগদ্বীদ চন্দ্র শীল, রামকৃষ্ণপুর।

উত্তর : দুধ দোহন করা।

কোন সাগরে নাইযে পানি
কও দেহি আমি হুনি। মো. তারেক হোসেন, চান্দেরচর।

উত্তর : বিদ্যাসাগর।

কম দিলে ভাল্লাগে না বেশি দিলে বিষ,
শাশুড়ি বলে বউকে আন্দাজ মতো দিস। সুমিত্রা রাণী, রামকৃষ্ণপুর।

উত্তর : লবণ।

বিয়ার সময় দাদা দেয় একবার
সারাজীবন বৌদি দেয় বারবার। চিত্রা চক্রবর্তী, ভাসানিয়া।

উত্তর : সিদুঁর।

সকালে জন্মলাভ বিকালে মরণ,
তার অভাবে সর্বজীবের বিফল জীবন। জোৎস্না রাণী শীল, দুলালপুর।

উত্তর : সূর্য।

এক আত গাছটা, ফল ধরে পাঁচটা। আরতি রাণী দাস, হোমনা সদর।

উত্তর : হাতের পাঞ্জা।

হাত নাই, পাও নাই, পিড দিয়া চলে,
রাইত দিন জরে। রিমন চন্দ্র সাহা, রামকৃষ্ণপুর।

উত্তর : নৌকা।

দেখিতে আশ্চর্য বড়,
মা ছোট তার ছেলে বড়। রুপালী রাণী, নিলখি।

উত্তর : কৈ।

খোদার এমুনই কাম
এক ঘর এক খাম। মতি মিয়া, চন্দের চর।

উত্তর : ছাতা।

ছুট্টু ছুট্টু পোলাপাইন, ছুট্টু ছুট্টু ছাও
পাও দিয়া চেপ্টা করে তা তোমরা খাও। রত্না রাণী শীল, দুলালপুর।

উত্তর : চিড়া।

প্রবাদ-প্রবচন

সমকালস্পর্শী লোকসাহিত্য। আধুনিক যুগের সাহিত্যাঙ্গিক কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদিতে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি। প্রবাদের দুটি অর্থ আছে একটি আক্ষরিক অর্থ (Literary Meaning), অপরটি ব্যঞ্জনার্থ (Inner Meaning) প্রবাদের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও অর্থবহ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন স্পেনের লোককলা বিশারদ Cervantes, তাঁর মতে, "A proverb is a short sentence based on long experience." অর্থাৎ প্রবাদ হলো দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।

প্রবাদ : প্রবাদের বিষয় বৈচিত্রের শেষ নেই। এগুলোতে নদী নালা, গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশু-পাখিময় প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র যেমন আছে, তেমনি নানা শ্রেণি পেশার মানুষ ও তাদের জীবন-যাত্রা, সংস্কার-বিশ্বাস, সংস্কৃতি সম্বলিত জাতিতত্ত্বের ও পরিচয় রয়েছে। প্রবাদকে ক) প্রকৃতি ও নিসর্গ, খ) নারী ও পুরুষ, গ) বৃত্তি ও বৃত্তিজীবী, ঘ) মানব চরিত্র ও স্বভাবধর্ম, ঙ) নীতি ও উদ্দেশ্য, চ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ছ) হাস্য-রস-নিন্দা-কৌতুক, জ) প্রাণী ও জীবধর্ম, ঝ) সমাজ-ধর্ম-দর্শন-অর্থনীতি-রাজনীতি ও ঞ) বিবিধ ইত্যাকার শ্রেণিবিভাগে বিভক্ত করেছেন ড. ওয়াকিল আহমদ।

প্রবচন : প্রবাদ ও প্রবচনকে অনেকেই অভিন্ন এবং সমার্থক মনে করেন এবং লোকসাহিত্যের প্রায় সমস্ত বইয়েই 'প্রবাদ-প্রবচন' নাম দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শুধু প্রবাদের। সেখানে প্রবচন বিষয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। আর বইগুলোতে একই সঙ্গে সংকলন করা হয়েছে প্রবাদ ও প্রবচন। একথা ঠিক যে, বুৎপত্তিগত দিক থেকে প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে প্রভেদ নেই। কেননা, প্রবাদের পদ ও প্রবচনের পদ উভয় ধাতুর অর্থ বলা। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে।

প্রবাদ ব্যঞ্জনানির্ভর, আর প্রবচন হলো বাচ্যার্থনির্ভর এখানেই এদের মূল পার্থক্য। উভয় আঙ্গিকেরই একটি বাচ্যার্থ আছে, কিন্তু প্রবাদের ব্যবহার বাচ্যার্থ অতিক্রমী। প্রবচনের মধ্যে রূপকত্ব দেখা যায় না। এর সরাসরি অর্থ রয়েছে। যেমন—বামুল, বাদল, বান দক্ষিণা পেলেই যান একটি প্রবচন। এই প্রবচনে ব্রাহ্মণ, বাদল ও বানের স্বাভাবধর্মের কথা অন্ত্যমিলের সাথে বলা হয়েছে, গূঢ়ার্থে এর প্রয়োগ নেই। কিংবা যম, জামাই, ভাগনা/তিন নয় আপনা, প্রবন্ধটিতেও জামাই ও ভাগনেকে যমের মতোই পর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রবাদ-সংগ্রহ

গু খাউন্যা গরুর মুখে কাপাইর দিলেও গু খায়।

ব্যাখ্যা : স্বভাবের বদল সহজে হয়না বোঝাতে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের স্বভাব পশু স্বভাবের কাছাকাছি।

কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি অথবা,
কিসের মধ্যে কী নাইল্যা হাগে ঘি।

ব্যাখ্যা : মূল প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে যদি কেউ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা বেমানান কিছুর অবতারণা করে তখন এই প্রবন্ধটি উচ্চারিত হয়।

কানের সোনা কান কাটে

ব্যাখ্যা : ঘনিষ্টজনই নিজের ক্ষতি করে বেশি এমন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

শুঁড়ির সাক্ষী মাত্তাল

ব্যাখ্যা : মন্দলোক মন্দলোকের পক্ষ নেয় বোঝাতে কথাটি বলা হয়।

নিজের নাই খাতালতা
কী কয়াম পরের কথা।

ব্যাখ্যা : নিজের অবস্থান যদি দুর্বল ও নড়বড়ে হয়, তখন পরের বিষয়ে মাথা ঘামানো যায় না।

আমি ও হগির হইলাম, দ্যাশেও কাৎ পড়লো।

ব্যাখ্যা : কেউ সমস্যায় পড়ে যদি অন্যের নিকট থেকে উপকার বা সমাধান না পায় এমন মুহূর্তে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ জাতীয় প্রবাদ উচ্চারণ করে। প্রবাদটি "আমি ও মাঝি হইলাম, গাঙ ও বাঁকা হইল" এ ভাবে ও প্রচলিত আছে।

আমি আইলাম আৎকা
আমারে কয় ভাত খা

ব্যাখ্যা : অপ্রস্তুত অবস্থায় কাউকে কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে তখন সে এই প্রবাদটি ব্যবহার করে।

কইতে এ না বক্স আলী
লেখতে এ না ফাডাফাডি।

ব্যাখ্যা : বলা সহজ, করা কঠিন, অর্থে বরুড়া এলাকায় এই প্রবাদটি প্রচলিত।

বইতে জানলে লড়ে না
খাইতে জানলে পড়ে না।

ব্যাখ্যা : কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা থাকলে কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করলে বিশৃঙ্খলা হয় না বা অপরের কথা শুনতে হয় না।

গুয়ের কোনো পিঠই ভালো না

ব্যাখ্যা : দুর্জন ব্যক্তির মধ্যে ভালোগুন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সেখানে শুধু মন্দ বৈশিষ্ট্যই ভেসে ওঠে, এমন অর্থে কথাটির প্রয়োগ হয়।

হুগুনীর দোয়ায় গরু মরে না

ব্যাখ্যা : নিম্নজন বা কারো ইচ্ছায় উপর প্রকৃতি নির্ভরশীল নয়।

সুফিয়া বেগম সাহায্য করেছেন অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবচন সরবরাহ করে

নাপিত দেখলে নক্কুনী বলে।

ব্যাখ্যা : সুযোগ পেলে মানুষ তার সদ্ব্যবহার করতে চায় এবং আরামপ্রিয় হয়ে ওঠে।

টাকার জন্য কাঠের পুতুলও হা করে

ব্যাখ্যা : অর্থের প্রতি সকলেরই লোভ আছে।

দেশি কুত্তার বিলাতি ডাক

ব্যাখ্যা : মাতৃভাষাকে অবহেলা করে ইংরেজি বা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে আগ্রহী হলে এই কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়। কিংবা প্রান্তজন যদি ভদ্রলোকের মত আচরণ করে তখন এ কথাটি বলা হয়।

ছেলে ভাল, লজিং পায় না।

ব্যাখ্যা : মন্দ কাউকে সরাসরি মন্দ বলতে না পারলে ভাল বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই ভাল বলতে খারাপকেই বোঝানো হয়।

যদি থাকে নসিবে
আপনে আপনে আসিবে।

ব্যাখ্যা : প্রাপ্তির উপায় না থাকলে অদৃষ্টের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে অপেক্ষা করা।

যেই মুরগি ডিম পাড়ে, সেই মুরগির মার্গে জানে।

ব্যাখ্যা : যার নেতৃত্বে বা টাকায় সংসারধর্ম চলে বা কোনো কার্য উদ্ধার হয়, সেই প্রকৃত বাস্তবতা অনুভব করে থাকে। অন্যরা সেটা বুঝতে পারে না।

যে কয় রাম, তার লগে যাম।

ব্যাখ্যা : ব্যক্তিত্বহীন বা নির্বোধ ব্যক্তির অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এই প্রবাদ।

যে পাতে খায় সে পাতে আগে।

ব্যাখ্যা : সাথে সাথে বেইমানি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাইয়ের লাইগ্যা ও কান্দে, হুটকি সালন ও রান্দে।

ব্যাখ্যা : দ্বিচারিণী বা উভয়পক্ষ সমর্থন করলে কিংবা কাজে কথায় স্ববিরোধী মনোভাব পোষণ করলে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়।

বার বাইতে শোনা যায় খাম্বার ডাক
বাইত আইলে কচুর শাক আর ভাত।

ব্যাখ্যা : বাইরে অনেক আড়ম্বর দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে বা গভীরে প্রবেশ করলে অন্তসারশূন্যতা ধরা পড়ে।

কাউয়ায় চিনে ঘাউয়ে কাডল।

ব্যাখ্যা : অদক্ষ বা অপরিপক্ক লোক ভালো বা খাঁটি জিনিস নির্বাচন করতে পারে না।

হাগায় বাঘারে ও ডরায় না।

ব্যাখ্যা : বিপদে পড়লে মানুষ যেকোনো সমস্যাকে মোকাবেলা করে সমাধানের পথ খুঁজে নেয় বা প্রয়োজন পূরণ করে।

বাপে পুতে ডাইক্কা ভাই
দিন চারিক কাডাইয়া যাই।

ব্যাখ্যা : অসময়ে মিলেমিশে দিন গুজরান করার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

হাতি যদি লোদে পড়ে
চানচোরায় পুটকি মারে

ব্যাখ্যা : শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি দুর্যোগে বেকায়দায় পড়লে তখন সকলেই সুবিধা লুটতে চায়।

তোলা দুধে পোলা বাঁচে না।

ব্যাখ্যা : অতিরিক্ত নিয়ম কানুন অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরোপিত বা কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতায় মানুষের মন রক্ষা করা যায় না।

নাদানের আল্লাহ নাই
অথবা, নাদানের কায়দা নাই।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রবাদটি মানুষের প্রাপ্তির সীমাহীন প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

না পারতে খায় হুরি
না পারতে করে চুরি।

ব্যাখ্যা : অভাবে পড়লেই মানুষের স্বভাবের অবনতি ঘটে।

গায়ের জোরে মামিওরি বিয়ে করা

ব্যাখ্যা : ক্ষমতার জোরে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করা।

দ্যাশের কানা থিতে আডে।

ব্যাখ্যা : নিজের এলাকায় বা পরিচিত জায়গায় অন্যের সাহায্য ছাড়াই চলা যায়।

হাগেও না, পথও ছাড়ে না।

ব্যাখ্যা : কোনো লোক যদি দুই দিকেই সমস্যা তৈরি করে রাখে তখন এ কথাটি বলা হয়।

ডুস খাইলে হুস হয়।

ব্যাখ্যা : সমস্যায় পড়লে মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যা : অযাচিত/অপাঙক্তেয় ব্যক্তির অনাকাঙ্খিত অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হাইট্রার ভাতে লাস নাই
বউয়ের মুখে লাজ নাই।

ব্যাখ্যা : সব কিছুতে ভেজাল এবং মানুষের মাঝে নীতি নৈতিকতার লোপ পাওয়া প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গব কইছনা লো নানি হড়ি
দেইক্কা আইছি তর বাপের বাড়ি।

ব্যাখ্যা : অতিরঞ্জিত করে গল্প না বলার জন্য এক মহিলা আরেক মহিলা সম্পর্কে একথা বলছে কারণ তার কাছে ঐ মহিলার বাড়ি ঘরের দশা অজানা নয়।

ঠ্যাডা পইড়া বগা মরছে
হগিরের কেরামতি বাড়ছে।

ব্যাখ্যা : ঘটনাগুলো সহজাত/স্বাভাবিক কারণেই ঘটে থাকে কিন্তু ফকির দরবেশ বা তাদের অনুসারীগণ তা ফকিরের কেরামতি বলে চালিয়ে দেয়।

দুই দিনে বৈরাগী
ভাতেরে কয় অন্ন।

ব্যাখ্যা : হঠাৎ করে প্রভাব প্রতিপত্তি এলে মানুষের অহংকার বেড়ে যায়।

কম দুককে কাতর
আর অতি দুককে পাততর।

ব্যাখ্যা : দুঃখের মাত্রা ব্যক্তির বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশে সহায়ক।

কড়ি দিয়ে কিনলাম দই
গয়লানী মোর কিসের সই।

ব্যাখ্যা : যখন অর্থই হয় বিনিময়ের উপায় তখন ক্রেতা আর বিক্রেতার মাঝে কেন দর কষাকষি হবে না এ প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে।

মাছের মইদ্যে কৈ
আনাজের মইদ্যে ছৈ!

তথ্যসূত্র : অশোক কুমার ভৌমিক (৬৫) কোরবানপুর

আজাইরা থাকলে গজাইরা গীত

তথ্যসূত্র : গঙ্গাচরণ সূত্রধর (৭০) কোরবানপুর

আমি অইলাম রাঁড়ি
আইল রাঙা শাড়ি।

তথ্যসূত্র : দিপালী রাণী দাস (৭০) কোরবানপুর

ব্যাখ্যা : উপযুক্ত সময়ে কোন কাজ বা উপকরণ না পাওয়া প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়েছে।

রাহে আল্লাহ মারে কে?
একবার মল্লে ডরায় কে?

তথ্যসূত্র : শামসু ব্যাপারী (৫০) কোরবানপুর

বাঘিনীর এক পুত,
হিয়ালনীর হাত পুত।

তথ্যসূত্র : পরিপদ চক্রবর্তী (৬০) দৌলতপুর

কুত্তার লেজ বার বছর ঘি দিয়া ডললেও সোজা অয়না।

তথ্যসূত্র : আব্দুল লতিফ সরকার (৬৭) কামাল্লা

গাইনা কিনতে দুয়ানী
হাত পুতের পর কইন্যা সেয়ানী।

তথ্যসূত্র : মোঃ রুশমত আলী (১০৫) জাহাপুর

ব্যাখ্যা : অতি উৎসাহী লোক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাতর, আবার সাত ছেলের পর মেয়ে হলে সৌভাগ্যের প্রতীক।

নিম নিম বজ্জাত
কথা কয় আবজাত (আড়ালে, অনুকারে)।

ব্যাখ্যা : আড়ালে বা একাকী বা গোপনে অকাজ-কুকাজ করা। তুলনীয় ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

হাস্তা (সস্তা) কাডলের (কাঁঠালের) তিন দোষ না অয় ভোতা না অয় কোষ।

ব্যাখ্যা : সস্তায় পাওয়া জিনিস অনেক সময়ই নিম্নমানের হয়।

তুলনীয় : সস্তার তিন অবস্থা।

জুইতের (সুবিধার) লাইগ্যা হুইতে (শুইতে) পারে না।

ব্যাখ্যা : বেশি সুবিধা বা আরাম পেয়ে আরও বিলাসী হয়ে ওঠা।

মোটাতাজা বেপতার (বেআক্কেল, নির্বোধ) ও ভালা (ভাল)।

ব্যাখ্যা : সরস ও স্বাস্থ্যবান জিনিসের প্রতি মানুষের সমর্থন বেশি থাকে।

কোথায় রাজরাণী, কোথায় বিছনায় মুতুলী (বিছানায় প্রশ্রাব করে)।

ব্যাখ্যা : তুলনায় ভুল হলে মানুষ এ প্রবাদ ব্যবহার করে।

বেড়া ক্ষেত খায়

ব্যাখ্যা : রক্ষকই ভক্ষক হয়।

ভাত খাইতে পায় না, পিঠা পিঠা করে।

ব্যাখ্যা : অতিরিক্ত বিষয়ে মনোযোগী হওয়া।

ডিমা (ডিম) পাড়ে আসে (হাঁসে) খায় বাগদাসে।

ব্যাখ্যা : পরিশ্রম করে একজনে ফল ভোগ করে অচেনা মানুষ।

দুধ দেউন্যা (দেয় এমন) গাইয়ে লাইথ্যানো (লাথি দেওয়া) ভাল।

জামাইল যে লায়েক (উপযুক্ত) বউয়ের খোঁপ দেখেই বোঝা যায়।

যার নাই কাম তে (সে) খাইতো পারে হিন্দুইরা গাছের আম।

আমতলায় আম মাঙ্গা।

ওজন বুইজ্জা ভোজন করা

ব্যাখ্যা : পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা

কইলে মায় মাইর খায় খায়

না কইলে বাপে হারাম খায়

ব্যাখ্যা : দু'দিক থেকেই সংকট তৈরি হলে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

চোরে চোরে হালি

এক চোরে বিয়া করে

আরেক চোরের শালি।

ব্যাখ্যা : খারাপের সাথে খারাপের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়।

যাক জাতি, থাক পিরিতি

ব্যাখ্যা : ক্ষতি মেনে নিয়ে সম্পর্ক ভাল রাখা

বেশি খাইতে গেলে অল্পের নাগালও পায় না

ব্যাখ্যা : বেশি লোভ করতে গেলে অনেক সময় হারাতে হয়।

কথা কস নাকি খ্যাঁতা (কাঁথা) সিলাস।

ব্যাখ্যা : প্রসঙ্গের বাইরে কেউ অবান্তর বিষয় উপস্থাপন করলে তাকে তাচ্ছিল্য করে এ প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যাইব পাঁচশ, আইব (আসবে) হাজার।

ব্যাখ্যা : বিনিয়োগের চেয়ে সব সময়ই লাভের সম্ভাবনা বেশি।

হালিকের (শালিকের) হোগায় তেল অইলে মোল্লা বাড়িত বাসা বাঁধে

ব্যাখ্যা : ক্ষমতাবান সব সময় ক্ষমতাবানদের সাথেই থাকে।

উলুসের (ছারপোকা) গায়ে ততা (গরম) পানি পড়া

ব্যাখ্যা : দোষীকে উচিত কথা বলে জব্দ করা।

পাইয়া পাইয়া হর

এক ঝি বিয়া দিছে তিন জামাইর ঘর।

ব্যাখ্যা : সুযোগেও সুবিধায় মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। পাওয়ার পর আরো পেতে চায়।

লাঙ (পরপুরুষ) ধরনি রইল বালা (ভাল)
দুয়ার ধরনি বাইন্দা হালা।

ব্যাখ্যা : অনেক সময় অন্যায়কারী পার পেয়ে যায়, তার বদলে সাজা ভোগ করে নিরীহ সাধারণ মানুষ।

আমরা তো আর ভাই না
চাইলেও পাই না।

ব্যাখ্যা : অন্যের ঘনিষ্ঠভাজন না হলে তার কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

চোরে নেয় হুওরে (শুকরে) খায়, গিরস্তরে আল্লায় দেয়।

ব্যাখ্যা : অসৎ পথের অপহরণ বৃত্তি দিয়ে জীবন চলে না, তেমনি এভাবে যার সম্পদ খোয়া যায়, তারও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

সাউয়ার (যোনী) লগে দেহা নাই, ধোন (পুংলিঙ্গ) লইয়া টানাটানি।

ব্যাখ্যা : কাজের প্রধান বস্তুর ব্যবস্থা না করে গৌন বস্তু নিয়ে মেতে থাকা।

সারারাত হাপ (সাপ), পিটলাম, সকালে উইট্টা দেই (দেখি) দড়ি।

ব্যাখ্যা : অনেকটা যত গজে তত বর্ষে না'র মতো। বুঝে শুনে কাজ না করলে ঠকতে হয়। কিংবা আড়ম্বর বেশি, প্রাপ্তি সামান্য। তুলনীয়: 'পর্বতের মূষিক প্রসব'।

ঘর তোলাইছে (বানিয়েছে) দেড় হাত
জামাই বউ দুইজনে হোতলে (শুইলে)
পেট লাইগ্যা থায় বেড়াত (বেড়ার মধ্যে)।

ব্যাখ্যা : কিপটেমি করে প্রয়োজন পূরণ হয় না, এমন কাজ করলে তা সব সময় সমস্যা তৈরি করে।

হোক (পশ্চাদ্দেশ) মাইরা নমস্কার
হোকে করে আবিষ্কার।

ব্যাখ্যা : ক্ষতি করে পরে কৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখানো

জানে না ছইয়ের দানা
নাম দিয়া রাইখছে মুন্সিয়ানা।

ব্যাখ্যা : প্রকৃত জ্ঞান না থাকলেও জ্ঞানীর ভাব দেখানো।

এই নি কথার হের
গাইয়ে খায় না খেড় (খড়)

ব্যাখ্যা : কোন কথার তাৎপর্য বা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যক্তির উপলব্ধিতে ধরা দিলে এ কথা প্রযুক্ত হয়।

হুওরের (শুকরের) কপালে সিন্দুর (সিঁদুর) লাগে না।

ব্যাখ্যা : অযোগ্য লোক ভালো জিনিস লাভ করতে পারে না। সম্মানের ও গৌরবের থেকে বঞ্চিত হয়।

এত গিয়া ভিজা বিলাই (বিড়াল) আরও পড়ছে হেনে (মাড়ে)।

ব্যাখ্যা : নিরীহ ও সহজ সরল মানুষের ঝামেলায়/বিপদে পড়া।

যার নাই কোন গতি সে করে হোমিওপ্যাথি

ব্যাখ্যা : উপায়ান্তর না দেখে যেনতেন ও নিম্নমানের কাজ করা।

বিলাই (বিড়াল) ছিক্কার (শিকার) লাগল (নাগাল) না পাইলে কয় আমার

ব্যাখ্যা : তুলনীয় : আঙ্গুর ফল টক।

'পোন্দের হুরকি' (পায়ুপথের ছিদ্র) দিয়া আসমান দেখা।

ব্যাখ্যা : অসম্ভবকে সম্ভব ও মামুলি ব্যাপার মনে করা।

কথাখান লেহা লেহা

'বাল' (যৌনকেশ) খান 'বেহা' (বাঁকা) বেহা।

ব্যাখ্যা : কথা বার্তায় ও আচরণে অপরিপক্ক মনে হলেও আসলে সবই জানে।

গুয়ে বাড়ি দিয়ে গাবড়ানো (নোংরা করা)।

ব্যাখ্যা : নোংরা জিনিসের সংস্পর্শে এসে নিজেকে নোংরা করা; খারাপের সংস্পর্শে এসে নিজেকে পঙ্কিলতায় ডোবানো।

সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

ব্যাখ্যা : সুখী হয়ে ও অসুখীর ভান করা

হাগা নাই পুটকির বাঘা ডাক।

ব্যাখ্যা : অবস্থা শোচনীয় হলেও ক্ষমতার দাপট দেখানো।

তুলনীয় : পঁচা আদার ঝাল বেশি

খাচলত দোষে মুখ লড়ে

ঝোনড়বা বাইয়া 'হেন' (মাড়) পড়ে।

ব্যাখ্যা : স্বভাব দোষেই মানুষকে পতিতাবস্থায় থাকতে হয়।

মরছে মরছে, অল্পের জন্য চোখটা রইছে।

ব্যাখ্যা : প্রবাদটির অর্থ এইরকম; অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু রোগী মৃত।

হেইদো হাঙ্গা (দ্বিতীয় বিয়ে) বইলি।

রাইতে এসে করলি

ব্যাখ্যা : প্রেমে রাজি না হয়ে সময় 'নষ্ট করে পরে ঐ কাজ করা।

যার হয় না নয়েতে, তার হয় না নব্বইতে।

ব্যাখ্যা : অল্প বয়সে সুলক্ষণ দেখা না দিলে পরবর্তীতেও তার সম্ভাবনা থাকে না।

মোততে (প্রশ্রাব করলে) ছাগি ধরে না, পরে দৌড়াইয়া লাগল পায় না

ব্যাখ্যা : সময়ের কাজ সময়ে না করলে, পরে সংকট তৈরি হয়।

থাকতে পাইছিনা ছিরি (শ্রী) আংটি

মরলে দিব কামরাঙা পাটি।

ব্যাখ্যা : বর্তমানে লাভ না করলে পরে পাওয়ার / লাভের সম্ভাবনা বৃথা।

হাই মরুক, পুত মরুক

খোঁপার জুত না লড়ুক।

ব্যাখ্যা : সব কিছুর বিনিময়েও নিজের ঠাটি বজায় রাখার চেষ্টা।

হাই পায় না আবার কাচ-খাড়ু।

ব্যাখ্যা : প্রধান বস্তু না পেলে, গৌণ বিষয় বা বস্তুর প্রশ্ন ওঠে না।
গু খাইয়া পাদেরে ঘিনায়।
ব্যাখ্যা : বেশি খারাপ জিনিসের সাহচর্যে থাকার পর কম খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকার প্রবণতা দেখানো।
আমনার (আপনার) চেয়ে পর বালা।
পরের চেয়ে জঙ্গল বালা
ব্যাখ্যা : আপন মানুষ অপেক্ষা পরই অনেক সময় কাজে আসে বেশি।
দাঁড় কাউয়ার মুখে হিন্দুইরা আম।
ব্যাখ্যা : অযোগ্যের কাছে যোগ্য জিনিস হস্তগত হওয়া।
আইজ (আজ) মরলে কাইল (কাল) দু'দিন।
ব্যাখ্যা : ক্ষণবাদী দর্শনের সমর্থনপুষ্ট একটি প্রবাদ।
একে নাচুনি বুড়ি, তার ওপরে ঢোলের বাড়ি।
ব্যাখ্যা : খারাপকে প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা।
গুরুরে জিগাইয়া হাল চয় (চাষ করে) না।
ব্যাখ্যা : নির্বোধ অধীনস্থকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ হয় না।
নিজের চ্যাট (পুরুষাঙ্গ) কালসাপ হইয়া ঠোড় (দংশন) দেয়া
ব্যাখ্যা : নিজের মানুষ দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।
চুরিতো চুরি, আবার সিনাজুরি।
ব্যাখ্যা : অপরাধ করে বীরের ভাব দেখানো।
চোখকে বলি দেখ, কানকে বলি শোন, মুখকে বলি চুপ।
ব্যাখ্যা : প্রতিবাদহীন ও ধৈর্যধারণ করে কোন রকম দিন পার করা।
মাথাত রাখিনা উকুনে খাবে, মাটিতে রাখিনা পিঁপড়ায় খাবে।
ব্যাখ্যা : কারো প্রতি যত্নের আধিক্য দেখানো।
যে করে পরের আশ, সে কাটে বনের ঘাস।
ব্যাখ্যা : অন্যের আশায় থাকলে পরে ঠকতে হয়।
বুদ্ধি থাকলে ঘর জামাই থাকতে হয় না।
ব্যাখ্যা : জীবনের হিসাব জানা থাকলে কারো অধীনে থাকতে হয় না।
ব্যাঙও চায় ঠ্যাং মেলতে।
ব্যাখ্যা : দুর্বলও আঘাত করতে চায়।
মাগনা পেলে আলকাতরা খায়
ব্যাখ্যা : সুবিধায় বা বিনা পয়সায় মানুষ খারাপটাও গ্রহণ করে।
যে দিকে বৃষ্টি পড়ে, সেদিকে পাতলা ধরে।
ব্যাখ্যা : পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা।
ভাঙে তবু মচকায় না।
ব্যাখ্যা : দৃঢ় অবস্থায় থাকা, কোন ক্রমেই টলে না এমন।
মা মরলে বাপ তালই, ভাই হয় বনের বারুই।
ব্যাখ্যা : সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের স্বভাব বদলে যায়।
পাডারে (পাঠা, খাসী) বলি দেয় পাড়িয়ে হাসে

রক (সবুর কর) পাডি (মেয়ে ছাগল) তোর জন্যও বরকা ঈদ আছে

তুলনীয় : কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস।

যার জন্য আছে হুদা (খালি) বাইত (বাড়িতে) আছে
যার জন্য নাই বিয়ে বাইতও নাই।

ব্যাখ্যা : মানুষ ব্যক্তিভেদে আচরণ করে থাকে।

খেইনের মইধ্যে খেইন, এর মইধ্যে আইলো তেইন।

ব্যাখ্যা : একটি চমৎকার ঘটনা ঘটানোর পর আরেকটি চমৎকৃতি তৈরি হলে এ প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

হারা দিনে কাম কির
হারে পাঁচ আনা
বাইত গেলে মাগি কইব
সাবান আনছনা। মো. বাছির (৬৬) মজিদপুর।

ব্যাখ্যা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান জনিত হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে।

হাইয়ের প্রসাদে দেখছিনা যেদ্দুর
পুতের প্রসাদে দেখছি
কাউইল। রাজীনাত পুর। হরিপদ নমঃ (৬০) বলরামপুর।

ব্যাখ্যা : ছেলের অত্যাচার ও নির্মমতা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

আছিল কালানী ছালানী
স্বামী ছুইলে বিবি সাহেবিনী। আবু নারিস (৪২) কলাকান্দি।

ব্যাখ্যা : মেয়েরা তাদের স্বামীর মর্যাদায় সম্মানিত হয়ে থাকে।

মরত মরত আত করে
যম দেখলে ডর করে। আরতী রাণী বালা (৫৫) রামভদ্র।

ব্যাখ্যা : মরি মরি যারা করে তারাই যমদূতকে বেশি ভয় পায়।

ধানের মইদ্যে খামা
আত্মীয়ের মইদ্যে মামা। প্রদীপ চন্দ্র শীল (৫০) কড়িকান্দি।

ব্যাখ্যা : সব হাতের মধ্যেই ভালো মন্দ গুনাগুন আছে।

পুটকিত্ত নাই ছড়
রামকৃষ্ণ ধর। হরিপদ নমঃ, বলরামপুর।

ব্যাখ্যা : সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ প্রসঙ্গে বলা হয়।

শালার ঝি মাঐ,
দাদা আইলে পিডা-চিড়া
আমি আইলে নাঐ।

ব্যাখ্যা : আত্মীয়তার ব্যক্তির গুরুত্বই তার মূল্য নির্ধারণ করে।

যেই ডালে ভর করি,
হেই ডাল ভাইঙ্গা পড়ি। মোতালেব মিয়া, ভিটিকান্দি।

ব্যাখ্যা : ভরসা করলেও প্রায়ই নিরাশা এসে হানা দেয়।

অভাইগগার লক্ষণে
চান যায়গা দক্ষণে। পুষ্প বালা নম, সাতানী।

ব্যাখ্যা : হতভাগা যেদিকে তাকায় সেদিকেই সব শূন্যতা নেমে আসে।

যেইনা চেহারা
তার নাম পেয়ারা
আবার করে কুয়ারা। রশিদ ব্যাপারী, জিয়ারকান্দি।

ব্যাখ্যা : অযোগ্য ব্যক্তির যথার্থ নাম প্রসেঙ্গ বলা হয়।

ছুতা না বেডির হুতা
হাইয়ে মারছে গুতা। গোলাম হোসেন, গৌরীপুর।

ব্যাখ্যা : বহুসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি চরিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়।

দইক্কা যা গো বুয়ারা
হাইয়ে মাগের কুয়ারা। আবুল কাশেম, দূর্গাপুর।

ব্যাখ্যা : এ কালের স্বামী স্ত্রীদের বেহায়াপনা প্রসঙ্গে বলা হয়।

যা আছে আমার মনে
গোবিন্দই তা জানে। কানন বালা সরকার, গৌরীপুর।

ব্যাখ্যা : মানুষ তার মনের ভাব সব পরিষ্কারভাবে কাউকে বলে না।

বিলাইয়ে নিছে গা ভাজার মাছ
কপালে মারে ঠাস ঠাস। মো. ছগির উদ্দীন, সাতানী।

ব্যাখ্যা : মন্দ কপাল যাদের তারা সব সময়ই বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে।

মরার মাইলা
লগে লগে আইলা। প্রাণতোষ সাহা, গৌরীপুর।

ব্যাখ্যা : ভাগ্য যার যার সাথে যায়।

যার যার ভাইগ্যে
তে তে খায়। আব্দুল বছির শেখ, জগতপুর।

ব্যাখ্যা : মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত থাকে এ প্রসঙ্গে বলা হয়।

ছিড়তারে না মোরগার বাল
নাম কুলায় শেখ দুলাল। যোগেন্দ নাথ, গৌরীপুর।

ব্যাখ্যা : অকর্মণ্য ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন সম্পর্কে বলা হয়।

সুখে দুঃখে সৃষ্টি
মেঘে বানে বৃষ্টি। মো. তোরাব আলী, কলাকান্দি।

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবনে সুখ দুঃখের যুগপৎ অবস্থান সম্পর্কে।

তলে দিয়া তল কাড়ে,
উপড়ে দিয়া পূজা করে।

লাগানী পাড়ানী
তিন চুত মারাণী। সুনীল চন্দ্র শীল, সাতানী।

ব্যাখ্যা : এক চরিত্রে দ্বিসত্তা সম্পর্কে বলা হয়।

কলিকাইল্যা পুলাপাইন
বাপেরে কয় তামুক আন। আবু নাসির, কলাকন্দি।

ব্যাখ্যা : কলিকালের কালের প্রভাব উঠতি বয়সিদের উপর সুস্পষ্ট।

আত থাকলে মোহন বাঁশী
কত রাদা অইত দাসী। সুভাষ চন্দ্র শীল, মাছিমপুর।

ব্যাখ্যা : সামান্য গুণ যুক্ত হলেই অসাধ্য সাধন করতে পারত কেউ কেউ।

আজাইরা থাকলে
গজাইরা গীত। আরজ আলী, সাতানী।

ব্যাখ্যা : যারা সমাজে পরের উপরে খেয়ে অবসর সময় কাটায় তারা অন্যের দোষ ত্রুটি খুজে বের করতে সদা তৎপর থাকে।

কাঁচা না নোয়ইলে বাঁশ
পাকলে করে ঠাস ঠাস। নির্মল চন্দ্র রায়, নাগেরচর।

ব্যাখ্যা : তরুণ সমাজকে উপযুক্ত সময়ে কাজে না লাগালে তারা খুব দ্রুত বিপথে চলে যায়।

হারামের আরাম নাই
বজ্জাতের ভাত নাই। শহীদ সরকার, মাছিমপুর।

ব্যাখ্যা : দুষ্ট প্রকৃতির লোক পরিণামে দুঃখ ভোগ করে।

উচিত কতা কইলে
হাজি সাবের মুখ খারাপ। রেখা সরকার, রামভদ্র।

ব্যাখ্যা : যে সব সময় সত্য কথা বলে থাকে সে সবার শত্রু হয়ে ওঠে।

কামের সময় কামাল
কাম ফুরাইলে চ্যাডের বাল। জমির উদ্দিন, জগতপুর।

ব্যাখ্যা : কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে সবাই উপকারীর কথা ভুলে যায়।

হতিনের মার কাছে কয়
দুঃখের কাহিনি। এলাহী মুন্সী, মাছিমপুর।

ব্যাখ্যা : জগতে সতীন এবং সতীনের মা উভয়ই নির্মম প্রকৃতির লোক সুতরাং তাদের কাছে দুঃখের কাহিনি বলা অর্থহীন।

জাতে মাতাল তালে ঠিক। হরিপদ নমঃ, বলামপুর।

ব্যাখ্যা : জগতে মাতাল এবং মাতলামী শুধু ভাবে বুঝায় কিন্তু নিজের বুঝ মাতাল ও ভালো বুঝে।

নিজের পুটকিত্ত ছ'মুন ঘু
পরেরে কয় পুটকি ধু। প্রদীপ চন্দ্র শীল, কড়িকান্দি।

ব্যাখ্যা : নিজের শত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমাজে কিছু লোক আছে যারা কেবল অন্যের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ান।

ঠ্যাডা পইরা বগা মরছে
হগিরের কেরামতি বাড়ছে। আবু নাসির, কলাকন্দি।

ব্যাখ্যা : সাধারণ ঘটনাগুলোকে নিজের নামে চালানোর অপচেষ্টা।

পরের তেলে বাওন সুন্দর। আরতী রাণী সরকার, বলামপুর।

ব্যাখ্যা : পরের ঘর থেকে আনা সম্পদ নিয়ে ব্রাহ্মণ তার ঘর ভরে।

ধানের মইদ্যে আহারি
কত রঙ্গ দেহাইলি। যোগেশ সাহা, বাতাকান্দি।

ব্যাখ্যা : মানুষের বহুরুপী মনোভাব সম্পর্কে একথা বলা হয়।

খাইচ্চত যায় না ধুইলে
ইজ্জত যায় না মলে। মো. বাছির, মজিদপুর।

ব্যাখ্যা : স্বভাব সহজে পরিবর্তিত হয় না এ প্রসঙ্গে এ প্রবাদ প্রচলিত।

হুগ নাই তেনা,
মিডাই দেয়া খানা। মো. আজিম মিয়া, দূর্গাপুর।

ব্যাখ্যা : সাধ্য না থাকলেও সাধ আছে এ প্রসঙ্গে বলা হয়।

পইসা যার বাজার তার
হুদা মুছে ভেটকি সার। গোলাম হোসেন, গৌরীপুর।

ব্যাখ্যা : অর্থ প্রধান চালিকা শক্তি তা ব্যতীত জগতে চলাই দায়।

সাপ হয়ে কাটে,
আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে।

ব্যাখ্যা : চোরকে বলে চুরি করতে আর গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

সে রামও নেই,
সেই অযোধ্যাও নেই।

ব্যাখ্যা : সেই সময়ও নেই, সেই আচারও নেই।

মরা হাতি লাখ টাকা

ব্যাখ্যা : মহৎ মৃত্যুর পরেও মহৎ থাকে।

সময়ের এক ফোঁড়,
অসময়ের দশ ফোঁড়।

ব্যাখ্যা : সময়মত কাজ করতে না পারলে সে কাজে পরে সময় বা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

বিয়ে করতে কড়ি,
ঘর বাঁধতে দড়ি।

ব্যাখ্যা : উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত অনুসঙ্গ।

যে জেগে ঘুমায় তারে জাগানো দায়।

ব্যাখ্যা : যে না বুঝার ভান করে তাকে বুঝানো যায় না।

যার কাজ তার সাজে
অন্য লোকের লাঠি বাজে।

ব্যাখ্যা : যে যে কাজের উপযুক্ত তার সে কাজই করা উচিত।

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

ব্যাখ্যা : চাওয়ামাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ব্যাখ্যা : মানুষ অভ্যাসের দাস। যেখানেই যাক না কেন অভ্যাস পরিবর্তন হয় না।

চুন খেয়ে গাল পোড়ে,
দই দেখলে ভয় করে।

ব্যাখ্যা : ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

ব্যাখ্যা : কোন জিনিস হারালে তার কদর বোঝা যায়।

আপন নাক কেটে
পরের যাত্রা নষ্ট করা।

ব্যাখ্যা : অপরের অনিষ্ট সাধন করার জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করা।

ঠেকে শেখা আর দেখে শেখা।

ব্যাখ্যা : বাস্তব অভিজ্ঞতা জ্ঞানীর চেয়ে ভালো শিক্ষা দেয়।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে।

ব্যাখ্যা : নির্ভেজাল বা খাঁটি জিনিস বলতে কিছুই নেই।

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী
কথায় কথায় ডিকশ্‌নারি।

ব্যাখ্যা : যারা অল্পবিদ্যার ধারী তারাই তাদের অল্পবিদ্যার বাহাদুরি জাহির করার চেষ্টা করে।

যার লগে আড়ি
তারে দেখতে নারি।

ব্যাখ্যা : যার সাথে শত্রুতা আছে তার পদে পদে দোষ।

পাড়া পুতার ঘষাঘষি
মইচের জীবন শেষ।

ব্যাখ্যা : বড় মানুষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ঘটলে ছোট চুনো-পুটিদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

আত থাকলে মোহন বাঁশী
কত রাদা অইত দাসী।

শব্দার্থ: আত: হাত; রাদা: রাধা; অইত: হইত।

ব্যাখ্যা : সাধ এবং সামর্থের বিস্তর দূরত্ব প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়েছে।

যার লগে যার ভাব
তার হুগা দেখলেও লাভ।

ব্যাখ্যা : যার সাথে কারও ভালবাসা/প্রেম আছে তার শত দোষ থাকলেও তা নজর এড়িয়ে যায়।

ভাত খাইত ভাত পায়না
ছালুন ছালুন করে।

ব্যাখ্যা : সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা নিতান্ত হত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখে।

বাহা থাইক্ বীরশ্রেষ্ঠ
চিহা মাইরা আত নষ্ট।

ব্যাখ্যা : বাঘ শক্তিশালী প্রাণী আর চিকা তুচ্ছ প্রাণী সুতরাং বাঘ মারা সত্যিই দুঃসাধ্য কাজ। যে ব্যক্তি এই দুঃসাধ্য কাজ করে তার কাছে চিকা মারা মানায় না।

জামাই আইয়ে, খায় ভালা ভালা
বুজা যায় হিসাবের বেলা।

ব্যাখ্যা : বাড়িতে জামাই আসলে তাকে আদর আপ্যায়ণের কোন ঘাটতি থাকে না কিন্তু এসব আয়োজন করতে গেলে আয়োজকের বেগ পেতে হয়।

আপনা আত জগন্নাথ।

ব্যাখ্যা : কোন কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকলে তাকে একান্তভাবে নিজের অধিকার রাখার চেষ্টা দেখা যায়।

কলির বাওন দুরা হাফ
সে কইন্যার তেই বাফ।

ব্যাখ্যা : যারা মানুষকে চোখ রাঙাতে পারে তারাই তার কাছে গুরু সদৃশ মর্যাদা পেয়ে থাকে।

আজাইরা বউয়ে কী করে?
ধানে চালে মিশ্যাইয়া বাছে।

ব্যাখ্যা : কর্মহীন লোক অনর্থক কর্ম করে দিন কাটায়।

ভাব আছে যার গায়,
দেখলে পাগল চিনা যায়।

ব্যাখ্যা : ব্যক্তির চালচলনই তার পরিচয় বহন করে থাকে এ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

থাকতে চিনে না হাই
মল্লে কয় রামচন্দ্রপুরে গোস্বাই।

ব্যাখ্যা : সঠিক সময়ে গুণীর মূল্য দিতে না পারার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করা হয়ে থাকে।

নিজের পাগল বাইজা রাহি
পরের পাগল আততালি।

ব্যাখ্যা : মানুষ সাধারণত নিজের দোষ দেখতে পায়না কিন্তু পরের দোষ দেখে বেশ প্রচার করে থাকে।

কুত্তার লেজ বার বছর ঘি দেয়া
ডললেও সোজা অয়না।

ব্যাখ্যা : সাধারণত স্বভাব খুব সহজে পরিবর্তন হয় না এ প্রসঙ্গে।

ভাগের চিড়া ফালাইয়া দিওন ভালা।

ব্যাখ্যা : সমাজের এমন কিছু লোক আছে যারা নিজের প্রাপ্য শত অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও অধিকার ছাড়তে চায়না তখন পেয়ে অযথা ফেলে দিয়েও সুখ পায়। সমাজের সে সব লোক প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়।

হাগ দিয়া ভাত খাইয়া
ঘিয়ের ঢেক দেয়।

ব্যাখ্যা : অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে।

শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি
রাইত ফোয়াইলে পাছায় বাড়ি।

ব্যাখ্যা : শুধু শ্বশুর বাড়িই নয়, যে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বেশিদিন না বেড়ানো প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে।

প্রবচন সংগ্রহ

সতী নারীর পতি যেমন
পর্বতেরই চূড়া
অসৎ নারীর পতি তেমন
ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।

ব্যাখ্যা : সৎ মহিলার স্বামীও পর্বতের মতো অটল চরিত্রের হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে নারী অসৎ হলে তার স্বামীও হয় নড়বড়ে চরিত্রের।

রসিকে রসিক চিনে
ভোমরায় চিনে মধু
অজাত্য ভাঙালে চিনে
খোয়া ভরা কদু।

ব্যাখ্যা : দক্ষ লোক তার চাহিদানুযায়ী উত্তম বস্তুটি খুঁজে নিতে পারে, কিন্তু নির্বোধ মানুষ অধম বস্তু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

পান খাইতে স্বাদ লাগে না
স্বাদ লাগে তার চুনে
সুন্দর কথায় মন ভুলে না
মন ভুলে তার গুণে।

ব্যাখ্যা : বস্তুগত সত্তা কিংবা প্রাণীস্বভাব নিয়েই মানুষ সন্তুষ্ট নয়। জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে হলে, তাতে গুণধর্ম আরোপ করতে হয়। বাহ্যিক চাকচিক্যই বড় কথা নয়, ভেতরে গুণ না থাকলে মানুষের মূল্য নেই।

পোলা বিয়াইলাম বউয়েরে দিলাম
ঝি বিয়াইলাম-জামাইরে দিলাম।
আমি হইলাম বান্দি
রান্দি আর কান্দি।

ব্যাখ্যা : এই প্রবচনে পৌঢ় মায়ের জীবন বাস্তবতা উঠে এসেছে। ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকে প্রত্যেককে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাই বৃদ্ধা মায়ের খোঁজ কেউ নেয় না।

এক পুত পুত নয়
এক ক্ষেত ক্ষেত নয়।

ব্যাখ্যা : এক পুতের ভরসা নেই, মারা গেলেই শেষ, এক ক্ষেতও তেমনি, এই প্রবচনে এই সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

বুকে লোম মমিনের
কানে লোম কমিনের
ঘাড়ে লোম গাউড়ার
পোন্দে লোম মাউড়ার।

ব্যাখ্যা : এখানে মানুষের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গজানো পশম দেখে মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করা হয়েছে।

কাকের ডিম সাদা
শিক্ষকের ছেলে গাধা।

ব্যাখ্যা : এখানে একটি বৈপরীত্য নিয়ে প্রচবনটি তৈরি হয়েছে। কাক দেখতে কালো হলেও ডিমের রং সাদা। আবার শিক্ষক জ্ঞানী হলেও অনেক সময় দেখা যায় তার নিজের সন্তানই মূর্খ্য।

চৈতাইল্যা লাউ বৈতালে খায় না।

ব্যাখ্যা : চৈত্র মাসের লাউ স্বাদ লাগে না। পাপিষ্ঠরাও এ সময় লাউ খেতে চায় না।

অল্প বয়সে পিরিত করা
কাঞ্চা বাঁশে ঘুঁনে ধরা

ব্যাখ্যা : অল্প বয়সে প্রেম করলে কাঁচা বাঁশের মতোই জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

মোল্লার পেট খোদার তাগারি
যত ঢুকায় তত ঢুকে।

ব্যাখ্যা : এখানে মোল্লাদের বেশি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মায়ে দেখে পেটটা
বউয়ে দেখে গাইটটা

ব্যাখ্যা : মায়ের ভালোবাসা আন্তরিক হলেও বউয়ের ভালোবাসা স্বার্থযুক্ত।

কাজের শত্রু ঢিল (ঢিলেমি)
জমির শত্রু নীল।

ব্যাখ্যা : এই ছড়াটিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতা আছে। ইংরেজদের নীল চাষে কৃষকদের বাধ্য করার প্রেক্ষিতে এই প্রবচনটির জন্ম হয়েছে।

বইয়া (বসে) যদি খায়
রাজার ভাণ্ডারও ফুরাইয় যায়।
বাপ ভাল তার বেটা ভাল
মার গুণে তার ঝি
গাই ভাল তার বাছুর ভাল
দুধ ভাল তার ঘি।

ব্যাখ্যা : ভাল রূপ থেকেই তার সুন্দর ও ভাল প্রতিরূপ তৈরি হয়।

পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে ফলা, দক্ষিণে খোলা।

ব্যাখ্যা : এখানে গৃহের কোন পাশে কী করলে সুন্দর ও মসলাময় হয় তা বলা হয়েছে। পূর্বে হাঁস বলতে পুকুরের কথা বলা হয়েছে।

বল বল বাহুর বল
ছায়া ভালা ছাতির তল

ব্যাখ্যা : নিজের শক্তি সামর্থ ও সক্ষমতাই আসল। এতেই ভরসা করা ভালো

সাথি চড়ে নাহি লাজ
আমার নাম কবিরাজ।

ব্যাখ্যা : কবিরাজি পেশা টিকে আছে প্রতারণার ওপর। এজন্য অনেক সময়ই তাদের হেনস্তা হতে হয়।

লাখ টাকার দাঁত মাজে পাহালের (চুলার) ছালি (ছাই)
দেড়শো টাকার জুতার লাইগ্যা লন্ডনের কালি।

ব্যাখ্যা : এ বাস্তবতাটি আমাদের গ্রামীণ সমাজে দেখা যায়। মূল্যবান দাঁতের যত্ন নেয় না অনেকেই, কিন্তু পায়ের জুতাতে দামি কালি লাগায়।

জাবিন (জামিন) হয় ভরতো, গাছে ওঠে মরতো।

ব্যাখ্যা : কারো টাকার জামিন হলে সেটা নিজে পরিশোধ করতে হয়, গাছে উঠলেও মরবার সম্ভাবনা থাকে।

মায়ের মাত, অন্যের ভাত।

ব্যাখ্যা : মায়ের মুখের কথায় এবং অন্যের ভাত খাওয়ানো সমান।

কাঁস-পিতল ভাঙলে যায় কাঁসারির দোকানে
ঝি-ঝিয়ারি অচল অইলে যায় মা-বাবার দোকানে।
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনাইয়া আইয়ে কাছে
কথা দিয়া কথা লইয়া পরাণে মারে শেষে।

ব্যাখ্যা : এই প্রবচনে দুষ্ট লোকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রথমে একটি কথার টোপ দিয়ে ভেতরের কথা বের করে আনে।

আয় হুতার (সূত্রধর), ব্যয় কামার।

ব্যাখ্যা : কাঠমিস্ত্রিকে কাঠ একটু বড় সাইজে কাটতে হয় আর কামারের বেলায় লোহার সাইজ ছোট রাখলেও চলে, একটু বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

আল্লাহ দিলে পাওন, মাউগে (বউয়ে) দিলে খাওন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কৃপাতেই কিছু পাওয়া যায় আর বউ যেহেতু রান্নাবাড়ার দায়িত্বে থাকে সে আন্তরিক হলেই খেতে পাওয়া যায়।

আমার গোলার ধান/কেরি পোকে খায়
আমার শালা বড়গিরি/দুপুইরা উপাস যায়।

ব্যাখ্যা : আমাদের সমাজে এরকম বাস্তবতা প্রায়ই দেখা যায়।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষের মনে ও আচরণে এক ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার লক্ষ করা যায়। এই বিশ্বাসের বলয় ও সংস্কারের সীমানা বেশ বিস্তৃত। চারপাশের জীবজগৎ ও জড় জগতের অজস্র উপকরণ অনুষঙ্গ নিয়ে এই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের জগৎ গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এসব বিশ্বাস ও সংস্কারের রেওয়াজ বেশি প্রচলিত। মানুষের মনের দুর্বলতা থেকে এর জন্ম। মূলত মানুষের প্রতিদিনের অনিশ্চিত জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার যে কামনা-বাসনা তা থেকেই লোকবিশ্বাস জনমানসে প্রোথিত হয়। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এক নয়। বিশ্বাস অনেক সময় পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার আগ্রহ মন থেকে দূর হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাস যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে ক্রিয়াকাণ্ড ও আচরণাদির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় সংস্কার। লোকবিশ্বাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধ্যান ধারণা পোষণ করে। কিন্তু লোক-সংস্কারের ক্ষেত্রে এতে কিছু আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন, শুভ কাজে রওয়ানা দিয়ে যাওয়ার পথে কেউ যদি হোঁচট খায় তখন ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে একটু বসে পরে নতুন করে যাত্রা করে। নতুবা ঐ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে না বলে সে বিশ্বাস করে। এটাই সংস্কার এসব বিশ্বাস ও সংস্কারের পেছনে প্রায়শ ধর্মীয় প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকে।

অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা থেকেই বিশ্বাস ও সংস্কারের জন্ম হয়। স্বাভাবিক নিয়মে, যুগের পরিবর্তনে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার একসময় সমাজের চোখে বেমানান ঠেকে, তখন তা হয়ে ওঠে কুসংস্কার। বলা বাহুল্য নানা জনপদে কুসংস্কারও গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে।

বরুড়া অঞ্চলে প্রচলিত লোকবিশ্বাসগুলো নিম্নে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লিপিবদ্ধ করা হলো আঞ্চলিক ভাষায় : বিলাই (বিড়াল) মারণ (মারা) বালা (ভাল) না। মারলে বিলাইর ওজনের হাসান (সম পরিমাণ) নুন (লবণ) দেওয়া লাগে।

হরার (ডাকনী) উপর কিছু বাইখ্যা খাইলে বউ পলাইয়া যায়।

ভাত খাওনের সময় আপন মানু (মানুষ) স্মরণ কল্লে (করলে) নাহেমুহে (নাকে-মুখে) ওঠে।

কথা বলার সময় যদি টিকটিকি ডাইক্যা ওডে, তাইলে সে কথা সইত্য (সত্য) বলে ধরতে অয়।

বালিশ ডেইয়া গ্যালে (উপর দিয়ে গেলে) ঐ লোকের গেডি (ঘাড়) ব্যথা করে।

ভাত খাইয়া লগে লগে (সাথে সাথে) শরীল টানাটানি দিলে ভাত কুত্তার প্যাডে চাইল্যা যায় এবং অজম (হজম) অইয়া যায়।

রাতে আয়না দিয়া মুখ দেহন বালা না, দেখলে অমঙ্গল অয়।

ঘর থাইক্কা বাইরে যাওনের সময় জোড়া হালিক (শালিক) দেখলে বালা, কিন্তু খাইল্যা কলসি দেখলে অমঙ্গল অয়।

কিছু খাওনের সময় জিহ্বায় কামড় পড়লে বুঝতে হবে কেউ তাকে গালি দিতেছে।

যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, হেই লোক যদি ঐ সময় আইসা হাজির অয়, তাইলে আগন্তুক লোকের হয়েত (আয়ু) বাড়ে।

নিজের পরণে কাপড় যাহা অবস্থায় ঐ কাপড় সিলাইলে অমঙ্গল অয়।

বিয়ানোর পর পোলা (পুত্রের) কান ছিদ্র কইরা দিলে এই পোলা আর যমে নিতে পারে না।

রাত্রে ঘরের বাইরে ওড়া, ঝাড়ু রাখতে নাই। রাখলে চোরের যাত্রা অয়।

শিশুরা পোন্দের নিচে দিয়ে চাইলে বাবা মা চিন্তিত অয়, কারণ এতে শিশুর অসুখ হবার সম্ভাবনা।

চউখকে (চোখে) এন্না (আঙ্গুলি) উঠলে জোড পোলার লিঙ্গ চোয়াইলে চইলা যায়।

ব্যালামুহি (সূর্যের দিকে) পেশাব করলে মাথা ব্যথা করে।

গর্বিতা (গর্ভবতী) নারীর বিশেষ কোনো খাবারে লোভ অইলে তা খাওয়াইতে অয়। নতুনবা সন্তানের মুখ দিয়ে লালা ঝরে।

ঘর থাইক্কা বাইর (বের) হইয়া হিজড়া দেখলে অশুভ হয়।

যাত্রাকালে এক শালিক দেখলে অমঙ্গল অয়।

ছিড়া গেনজি গায় দেয়া গরিবের লক্ষণ।

রাস্তায় চলার সময় বাঁশ পইরা (পড়ে) থাকলে তা ডিঙ্গাতে গেলে বিপদ উপস্থিত হয়।

দাঁত দিয়া নউখ (নখ) কাটতে নেই।

ব্যাখ্যা : আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিশ্বাসটি সত্য। নখের ময়লা জীবানু মুখে প্রবেশের সুযোগ পায় তাতে।

ধান খুইট্যা খাইলে মুখের মইদদে ঘা অয়।

ব্যাখ্যা : এই বিশ্বাসটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা রয়েছে।

পোয়াতি মহিলাকে মিরকা মাছ (মৃগেল) খাইতে দিতে নাই।
খাইলে পোয়াতির মিরকি বেরা (মৃগী রোগ) হয়।
পরীক্ষার দিন ডিমা (ডিম) খাইয়া যাওন বালা না।
খাইয়া গ্যালে পরীক্ষার খাতায় আণ্ডা (ডিম) পায়।
রাতে ঘর ঝাড়ু দেওন বালা না।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বাড়িতে কাক ডাকলে আথলি আসে। হাটতে গিয়ে মাটিতে হোঁচট খেলে সেখানে থুথু ফেলা এবং লাথি মারার বিধান দেওয়া হয়। গায়ে প্রজাপতি বসাকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়।

ফসলের বা সবজি খেতে কালা পাতিল বা জোতা (জুতা)
লটকাইয়া দিতে অয়, নতুবা মুখ লাইগা ফসল নষ্ট অয়।
শনিবার দিনটি সুবিধার না, কাজ কর্মে শনির আছর পড়ে।
শিশুকে এক সঙ্গে দুই নলা (লোকমা) ভাত না খাওয়াইলে এই শিশু পানিত পইড়া মরে।
জন্মের পর সন্তানের কান ছেদা (ছিদ্র) কইরা দিতে অয়, তাইলে এই সন্তান বাঁচে।
রাত্রিকালে সূচ বিক্রি করলে অমঙ্গল হয়, ব্যবসার লক্ষ্মী চলে যায়।
মায়ের মতো ছেলে এবং বাপের মতো মেয়ে হইলে তারা ভাইন্যমান (ভাগ্যবান) অয়।
যাত্রার সোম, (সময়ে) মাইয়া মানুষদের খোলা চুলে বইয়া (বসে) থাকতে দেখলে অমঙ্গল অয়।
গরুর চোখ দিয়ে পানি ঝরলে বাড়ির কেউ মারা যায়।
গাভীর দুধ মাটিতে পড়লে দুধ কইম্যা যায়।
ভিখারিদের বাড়ির ভিতর ভিক্ষা দিতে নাই, বাড়ির বাইরে থেকে ভিক্ষা দিতে অয়।
ঘুমন্ত শিশুকে আদর করতে নেই, করলে ঐ শিশু জেদি অয়।
ঘুম থাইক্যা উঠনের পর আঁটকুইড়ার মুখ দেখলে সারাটা দিন খারাপ যায়।
দুইটা ঝাড়ু একসঙ্গে রাখলে ঝগড়া অয়।
হলদে রঙের কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে অতিথি আসে।
খাই খাই করলে অসুখ অয়।
পাটের ওপর বইয়া চুল কাটলে চুল লম্বা অয়।
গোছল কইরা চুলের আগা দেখা বালা না। বলা হয়, যেই বেডিয়ে (মহিলায়) গোছল করে কেশের আগা চায় ছয় মাসের আয়ু থাকতে স্বামী মারা যায়।
গোবর হালাইতে (ফেলতে) ঘিনড়বা করলে গরুর অমঙ্গল অয়।
বই মেইল্যা রাখন বালা না, পড়ার জেন শক্তি কইম্যা যায়।
বাড়ির উডানের গাছে হলদে পইখ (পাখি) বইলে এ বাড়িতে মেমান (অতিথি) আসে।
হাইনজা বালা (সন্ধ্যার সময়) ঘরে বাতি না দিলে ঘরের লক্ষ্মী চইলা যায়।
দোকান খোলার পর পইলা (প্রথম) বিক্রিতে বাকি দিলে সারাদিন রোজগার খারাপ অয়।
বড়শিতে মাছ না লাগলে মনে করা হয় 'মুখ লাগছে'।
আগুনে ছেপ (থু) পড়লে গলা ফুইল্যা যায়।
গর্বিতা (গর্ভবতী) নারী ঝাল বেশি খাইলে সন্তান রাগী অয়।
ঘন ঘন দাড়ি চাঁচলে দাড়ি তাড়াতাড়ি পাইক্যা যায়।
ব্যাখ্যা : এই বিশ্বাসটিতে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ রয়েছে।
পানিতে খাড়ইয়া মুতলে (পেশাব করলে) ধ্বজভঙ্গ রোগ অয়।
হাপে (সাপে) কাটার পর মা বাপে ছুঁইলে সেই বিষ আর নামানো যায় না।
ছোট পোলাপাইনের মাণিক (দাঁত) উঠলে মাণিক্যা পিঠা দিতে অয়।

ভাইয়ে বইনে গরু-ছাগল বর্গা নিলে হয় না, অসুখে পশু শুকাইয়া যায়।
কাঁচা চাউল চাবাইয়া খাইলে 'পাওয়াইর‍্যা' (পাউরিয়া) ব্যারাম অয়।
চোড পোলাপাইনের মাথায় ঠোকনা (হাতের আঘাত) দিলে ঐ রাতে সে ঘরে মুতে।
ভাত খাইয়া গায়ে তেল দিলে গায়ে তেলেঙ্গা অয়।
বিষ কাডালি গাছ দিয়া ঝাড়লে শিং মাছের ঘাইয়ের বিষ কইম্যা যায়।

লোকবিশ্বাস মূলত একটি মানসিক ব্যাপার। ব্যক্তির মানসিক দূর্বলতা বিশ্বাস, অবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্খা ইত্যাদি থেকে লোকবিশ্বাসের উদ্ভব। দুর্বল চিত্তের মানুষের মাঝে এর প্রভাব বেশি চোখে পড়ে। সাধারণত দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত কোন লোকবিশ্বাস সদৃশ ঘটা খুঁজতে গিয়ে কোন কারণ বা খণ্ডিত কারণ পেলে লোক বিশ্বাসের প্রতি তার বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। যার উল্লেখযোগ্য কয়টি নিচে তুলে ধরা হলো,

ভয় পেলে দায়ের আগার লবণ খেতে বলা হয়।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বাড়িতে কাক ডাকলে অতিথি আসে।

ফলন্ত গাছে অনেক সময় ছেড়া জুতা, পুরনো ঝাড়ু, কচ্ছপের মাথা বেধে রাখা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে তাতে গাছটা মানুষের কুদৃষ্টি এড়িয়ে ভাল ফল দিবে।

রাতে মহিলাদের চুল খোলা রেখে না চলাফেরা করার বিধান হয় এই বিশ্বাস থেকে যে অরিয়া আত্মা ভর করতে পারে।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দাঁত পড়ে গেলে তা ইদুরের গর্তে ফেলা হয় এই বিশ্বাসে যে সে ইঁদুরের মতোই শক্ত দাঁত ফিরে পাবে।

মরা সাপকে তাজা গোবরের মধ্যে ঢেকে দিলে সাপ প্রাণ ফিরে পাবে।

বড়কামতা পানচাষীদের পৌরাণিক বিশ্বাস ও পদ্ধতি

বড়কামতা গ্রামটি প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত। প্রাচীন সমতট অঞ্চলের রাজধানী ছিল এই বড়কামতা। সে সময় প্রায় সকল পেশার পেশাজীবীরা এই গ্রামে বাস করতো। বড়কামতা পানচাষীরা অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে ছিল। তাদের ভাষ্যমতে প্রায় আড়াইশ বছর আগে থেকে এই অঞ্চলে পান চাষ শুরু হয়। পানচাষীদের রয়েছে কিছু নিজস্ব পৌরাণিক বিশ্বাস ও পদ্ধতি।

এই গ্রামের পানচাষীরা পানকে বলে হুনাই। পানের আগায় শুন এর মতো তাই এই নাম। তারা দুর্গা দেবীকেও হুনাই দেবী বলে। তাদের আরাধনা ও আধারের প্রধান দেবী দুর্গা। সেটা হিন্দু ধর্মের অন্যান্য অধিবাসীদের মতো নয়। তাদের বিশ্বাস এই দুর্গা দেবীই তাদের হুনাই দেবী। এই হুনাই দেবী তাদের উপর খুশি থাকলেই তাদের পান চাষে ফলন ভাল হবে। তাই তারা ক্ষেতে পান তোলা, পরিচর্যা করার সময় হুনাই দেবীকে স্মরণ করেন।

তবে তাদের পানের বরজে কখনো নারীরা প্রবেশ করতে পারে না। আর করলেও পান ছিঁড়তে পারবে না। তবে ব্যতিক্রম বৃদ্ধ নারী ও কন্যা শিশুদের। এর অন্যতম

কারণ তারা মনে করে যে নারীদের ঋতুচক্র হয় তারা অশুদ্ধ। তাই সে নারীরা বরজে প্রবেশ করলে ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে।

তারা দুর্গা পূজার নবমীর দিন দুর্গা দেবীর একটা পূজা করে। সেটাকে তারা বলে হুনাই পূজা। এই পূজার পুরোটাই পানচাষী নিজেই করে। পূজার প্রক্রিয়াটা এরকম- একটি ক্ষেত্রে কলা, বেলপাতা, দূর্বা ফুল, আম্রপল্লব, ফল দিয়ে নৈবদ্য সাজায়। ক্ষেতের মাঝখানে একটি মাটির ঘট বসায়। তারপর সেখনে এগুলো দিয়ে সাজায়। তারপর সোনা রূপার জল ছিটিয়ে দেয় ক্ষেতে। তারপর ধূপবাতি জ্বালানো হয়। তারপর একটা চালকুমড়া বলি দেয়।

তারপর জোরে জোরে জমির মালিক যিনি-তিনি কিছু গাঁথা বলতে থাকেন। যেমন–

১. লাউয়ের আগা ভেরনের মাতি, হুনায় করে রাতারাতি।
২. যে কয় হইছে তার মারে তে খাইছে।
৩. যে চায় চুহি দিয়া নাক কাইটটাম ছুরি দিয়া।
৪. হুনাই মাগো উষা বালি ধুপো ধাপে পূজা করি।
৫. আইসেন গো মা উষা বালি তেল সিন্দুরে পূজা করি।
৬. যদি হুনাই বুঝে বাপের ধার পুতের ধার এক বছরেই হুজে।
৭. এক বিঘতে দুই বিঘতে হুনাই বাড়ে লকলকাইতে।
৮. মাতরা গাধা মাইরা একটা বাড়ুই বানাইছ।
৯. পূজা করি তোমারে বর দিবা আমারে।
১০. আষান দুধ বর্ণ পান খা মেঘ বর্ণ।
১১. লাউয়ের আগা ঘন গিট্টা দোকানদার আইয়ে দুয়ার আইট্টা।
১২. উগুরের তলে খুদের খাড়ি চোরায় মায় বুইড়াধারি।

এই গাঁথাগুলো জোরে জোরে আবৃত্তি করে। তারপর সেই ক্ষেত থেকে বের হয়ে যায়। সেইদিন আর পান পাড়া হয় না। কেউ সেদিন পানের বরজে যায় না। মনে করে, হুনাই দেবী সেদিন পান ক্ষেতে এসে পান খায়। তাদের বিশ্বাস হুনাই পান ক্ষেত্রে এলেই এ বছর সেই ক্ষেতের পান ভাল হবে।

এছাড়া তারা ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা মনে করে অন্য কারো নজর লাগলেই পান গাছ নষ্ট হয়ে যায়। তাই এই গাঁথাগুলোতেও সেই ব্যাপারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারা পান ক্ষেতে পাঁচবার বা সাতবার ঘোরেন। তারপর নমস্কার করেন। তারা মনে করে হুনাই দেবীর রূপ কখনোই দেখা যায় না। তবে তারা এই একদিনই পানের বরজে আসে। সেদিন তারা কোন পান বিক্রিও করে না। আর যারা পূজা করেন তারা সারাদিন এই পোশাকেই উপবাস করেন। তারপর সূর্য ডুবলে খাবার খান। এটাকে তারা বর পূজাও বলে। কারণ তাদের ধারণা এই দিনে ভাল পানচাষের বর পান চাষীরা।

লোকধর্ম : গৌণ লোকধর্মের মধ্যে আছে সর্ব্বধর্মবাদ, বাউল, আধ্যাত্মিক সাধক বাবা লোকনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী। এদের প্রত্যেকের তিরোধান ও আবির্ভাব বার্ষিকীতে বিরাট বিরাট আয়োজন হয়। এসব আয়োজনে একদিকে যেমন থাকে গুণকীর্তন, অপরদিকে থাকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, লীলাকীর্তন, খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাখের উপুস ইত্যাদি।

সমগ্র কার্তিক মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ঈশ্বর পাঠশালায় রাখের উপবাস উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হয়। এতে প্রতিটি রাখের দিবসে দুই হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনকারী অংশ নেয় আর তাদের সাথে উৎসব স্থলে হাজির হয় হাজার হাজার ভক্ত, অনুসারী ও আত্মীয় স্বজন। ফলে গোটা কার্তিক মাস হয়ে উঠে ঈশ্বর পাঠশালা উৎসব স্থান। বস্তুত কার্তিক হতে পৌষ মাস পর্যন্ত ঈশ্বর পাঠশালায় বিভিন্ন আবির্ভাব ও তিরোধান বার্ষিক লেগেই থাকে।

সর্বধর্ম মিশন : বাদুরতলাস্থ ফয়জুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে তালপুকুর পাড় যেতে যে মন্দিরটি পড়ে এটি শ্রী শ্রী জয়দূর্গা আশ্রম। এক সময় এটি ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির ছিল। বর্তমানে এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে শ্রী মৎ লব চন্দ্র পাল গুরু মহারাজ এর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সর্বধর্ম মতবাদ। বৃহত্তর কুমিল্লাতে দয়াময়ের অনেকগুলো আশ্রম রয়েছে। ১৯২৩ সালে স্থাপিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত এ মিশনের মন্দির ও সংঘগুলো কুমিল্লা সদর, চান্দিনা, বরুড়া, মতলব, প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। কুমিল্লা সদরের অপর মন্দিরটি রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট এর কমলাপুরে। এর নাম কমলাপুর অশোক আশ্রম। ২৫শে আশ্বিন কমলাপুরে এবং ২৫শে পৌষ কুমিল্লার শ্রী শ্রী জয় দূর্গা আশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বধর্ম মিশনের আইন উপদেষ্টা বাবু মতিলাল ভৌমিক জানালেন সারা বাংলাদেশে এ মিশনের সদস্য সংখ্যা লক্ষাধিক। বর্তমানে প্রচুর সংঘ রয়েছে যা অচিরেই মন্দিরে পরিণত হবে। প্রতিটি মন্দির ও সংঘের রয়েছে সহস্রাধিক সদস্য যারা তাদের সর্বস্ব দিয়েও মিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চায়। তারা যেসব গ্রন্থ অনুসরণ করে তাহলো প্রকৃত তত্ত্ব, কর্তা মহারাজ, মলয়া, আশীর্বাদ, সাধনপ্রণালী, ছাত্রগুরু, সর্ব ধর্মসার গ্রন্থ ইত্যাদি। সনাতন ধর্মসহ সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র হতে আগত লোকসমাজ এ মতাদর্শের অনুসারী। প্রতি সপ্তাহে তিনটি দিন তারা বিশেষ প্রার্থনা করে শনিবার লব চন্দ্র গুরু মহাশয় এর নামে, রবিবার আনন্দ স্বামী মহারাজার নামে এবং মঙ্গলবার মনোরমা দেবীর নামে।

সর্ব্ব ধর্ম মিশনের সাধন সংগীত

১. তাঁর কাছে ডেকে আন, তাঁরে কাছে ডেকে আন
যারে দেখলে জুড়ায় পোড়া আখি, ডাকলে জুড়ায় প্রাণ।
ভক্তি ভরে মধুর স্বরে, তাঁরে কাছে ডেকে আন
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে তাঁরে কাছে ডেকে আন।
ডাক দে ডাক দে তাঁরে মমতা মাখিয়া সুরে
শিশুর মত মা, মা, করে যে সুরে হয় প্রাণ জুড়ান
নয়ন রেখে রূপের পানে, টেনে ধর আঁখির কোণে,
প্রাণ সঁপিয়ে প্রাণের টানে, জাগাইয়া তোলে প্রাণ।
চাঁদে চাঁদে মিশামিশি, তগে কান্না ক্ষণে হাসি
মনমোহন কয় ভালবাসি, যে হাসির নাই পুরাণ॥

২. নাম ধরিয়া ডাকলে পরে, উত্তর কী তাঁর পাওয়া যায়?
কথা কী সে কইতে পারে, প্রাণে যারে সদায় চায়?
কখন কী সে স্বরূপ ছেড়ে আমার মতন হতে পারে,

সে আমি না হলে পরে, কিসে বা প্রাণ জুড়ায়।
বেদান্ত করে বিচার, অখণ্ড মণ্ডালাকার,
অনন্ত স্বরূপ তাঁরে ধ্যানে নাহি পাওয়া যায়।
বিফল প্রয়াস তবে, তাঁরে কোথায় পাওয়া যাবে
ভাবুকে কেবল ভাবে, ভাবে যারে পাওয়া যায়॥

৩. থাকলে সেত ডাকলে দেখা দিত আমারে।
নাই বলে সে মোর মনে হয়, যে যত কয় ধাঁধায় পড়ে॥
যে যত করতেছে পূণ্য, সবার ভাগ্য ভিন্ন ভিন্ন
বিচার করে পাপ পূণ্য, অরণ্যে ভ্রমণ করে।
ছিলি শূন্য হবি শূন্য, মিছে দুই চার দিনের জন্য
হিসাব করে পাপ পূণ্য, স্বভাবে ঠেকেছে ফেরে।
ভাবছ ব'সে তুমি তুমি, আমি ভিন্ন কইবা তুমি?
আমার আমি সেও তুমি, তুমি বলে কে কয় কারে।
স্বভাব ছাড়, স্বভাব ধর, আমার আমি নির্দেশ কর;
সাধন সিদ্ধি এই তোমার, আর যত বিপাকে ঘুরে॥

৪. আমার মন পাখি মিশিতে চায়, যেয়ে ওই সব পাখির দলে।
যে সব পাখি, ফাঁকি দিয়ে, ঘুরে বেড়ায় বন জঙ্গলে।
কত করে করিরে মানা, পাখিরে বাসা ছেড় না,
শিকলি কেটে ময়না টিয়া, ওই সব পাখির দলে গিয়া,
আবোল তাবোল বোল, টিয়া বলিয়া, হারা হতে চায় মূলে
হায়রে জংগলা পাখি, আর তুমি দিওনা ফাঁকি।
মনমোহনের মন আঁখি, কেমনে রাখি উলটা চলে॥

৫. বুঝে বুঝলি না তুই মনরে কানা
বাজে খরচ করে কেবল হারাইলি ষোল আনা॥
যা ছিল তা নিলি টেনে, কামকামিনী মদন বানে
আরো যা ছিল বিষয় গুণে, টানতেছে বিপর্যয় টানা।
শোন বলি ও আমার মন, ঠিক থাকে না তোমার ওজন
কামিনী আর পেয়ে কাঞ্চন, আহলাদে হলি আটখানা
চল্লিশ সেরে ঠিক হয় কাঁটা, বুঝিস না তুই পাগলা বেটা
ঘুচায়ে দে সকল লেঠা, ওজন হ'য়ে ষোল আনা।
মনের গুণে মনমোহন, পেল নারে গুরুর চরণ,
গুরুদণ্ড অমূল্য ধন, হলে কেবল কোণে শোনা॥

৬. কলি তোমার কার্য্য, সদা যেন ভাবে মন।
তোমা বিনে নাহি রাজ্য, বিভুতি ভূবন বন।
তুমি হয়ে কর যাহা, আমি হয়ে করি তাহা;
সকলই প্রতিবিম্ব তুমি মাত্র একজন
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম যত, হতেছে- আবশ্যক মত;
লীলা খেলা প্রকটিত, সকলি তব সাধন॥

৭. শোন বলি বাউলের মন (চেতরে বাউলের মন)॥
দেখে ধান্দাবাজী হয়ে রাজি, কারসাজি কর বারণ।
ঘোড়ারে লাগায়ে জিন চোরায় চৌড়ায়া সারাদিন।
দিনে দিনে ফুরাল দিন এক দুই তিন করে গণনা।
বদরঙ্গের হয়ে বেদিশে, বিন্তি কাবার দিলি দৃশে,
জাক্কা রঙ্গে, অবশেষে হবেনা তোর খেলা রাখন।
দুগ্ধের সর গাভীতে খায়, একবার খেয়ে আবার চায়,
সাপ দেখিয়া ময়ূর পালায়, ডেকে চার করিতে ভষণা।
লাল ডিংগি নংগর করে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে,
অনুরাগের বলংগা ধরে, রূপের ঘরে রাখ নয়ন।
রেকাবিতে ঠিক রেখে দাও। মন তুমি ঘোড়া দৌড়াও
যথা ইচ্ছা তথায় যায়, পাছে আছে মনমোহন॥

লোকপ্রযুক্তি

কৃষকের হালের লাঙ্গল, হাতের কাঁচি কোদাল, কুড়াল, কৃষাণীর হাতের কুলা, কুড়ালি, ঢেকি, গাইল, সেকাইট, পাটা-পুঁতা ছাড়া গ্রামীণ জীবন অচল। ঘরে ও বাইরে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক যন্ত্রপাতি যা হয়তো গ্রাম্য কামার, কুমার জেলে তাঁতিরাই ব্যবহার করে। লোকযন্ত্রের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলোকে আমরা দুইভাগে চিহ্নিত করতে পারি। ক. ঘরে ব্যবহৃত খ. বাইরে ব্যবহৃত।

ঘরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/লোকযন্ত্রের মধ্যে আছে দা, বটি, ঢেঁকি, গাইল, সেকাইট, পাটা-পুতা, সরতা, কুড়ানী, মই, চুড়ানি ইত্যাদি।

আর বাইরে ব্যবহৃত লোকযন্ত্রগুলো হল লাঙ্গল জোয়াল, আড়চা, কাচি, কোদাল, কুড়াল, করাত, রেত, শাবল, বেল, পেলোইন জাল পলো, হোঁচা ইত্যাদি।

তথ্যসুত্র : মোঃ আবু বকর, বদরপুর, নাঙ্গলকোট

১. মাছ ধরার যন্ত্র

ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী এলাকা বলে লাকসাম অঞ্চলে স্থানীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লোকজন নানা প্রজাতির মাছ ধরে থাকে। লাকসামের অনেক অঞ্চলেই মৌসুমে জনজীবনে পানি প্রবাহ যুক্ত হয়। সেই সঙ্গে মাছের আনাগোনাও থাকে। দরিদ্র পেশাজীবী ছাড়াও অনেকে শখের বশে বা পারিবারিক মাছের চাহিদা পূরণার্থে পলো, আনতা, চাই, ঝাকি জাল, ভেল, বেড় জাল, ছিপ ইত্যাদির সাহায্যে মাছ ধরে থাকে। এ ক্ষেত্রে যার এলাকায় যে যন্ত্র বা পদ্ধতি দ্বারা মাছ ধরা সহজ সে সেই পদ্ধতি ও উপকরণ বেছে নেয়।

২. পলো

পলো তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। এটি একটি খাঁচা জাতীয় যন্ত্র। পলোর উপরের দিকে গলা আকৃতির সরু মুখ রাখা হয়, যা দিয়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হাত ঢোকানো যায়। গলা থেকে নিচের দিকে তা বর্তুলাকার চাকতির মতো তৈরি করে। পলো উপরের গলা এবং নিচের তলা থাকে খোলা।

বাঁশের চিকন গোলাকার কাঠি, পাতলা চটা, বেত, দড়ি বা তার পলো তৈরির উপকরণ। দা দিয়ে পলোর উচ্চতা অনুযায়ী বাঁশের কালি তৈরি করা হয়। এই কালি থেকে সরু কাঠি বানানো হয়। আবার কিছু মোটা কাঠির ৬-৭টি চাকা তৈরি করা হয়। নিচের চাকার পরিধি সবচেয়ে বেশি এবং উপরের চাকার পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে। এভাবে সরু হতে হতে গলার অংশের পরিধি হয় সর্বনিম্ন। চাকাগুলো পলোর সরু কাঠির সাথে তার বা বেত দিয়ে বাধা হয়। মুখের কাঠির আগা সমান করে কেটে নিয়ে সাইকেলের টায়ার দিয়ে বাঁধা হয়। এই পলো দিয়ে মাছ ধরা ছাড়াও বাড়িতে হাঁস মুরগি আটকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

পলো দিয়ে মাছ ধরার পদ্ধতি : সাধারণত দলগত ভাবে মাছ ধরার ক্ষেত্রে পলো ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র মাসে যখন খাল-বিল পকুরে পানি কমে আসে তখন অনেক জায়গায় একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি জলাশয়ে সকলে মিলে সারাদিন মাছ ধরে। একে জলাশয় ভাঙ্গানো বলে। এদিন গ্রামের জোয়ান প্রবীণ হাতে কাঁধে পলো নিয়ে হাজির হয় মাছ ধরার জন্য। এ পদ্ধতিতে জলাশয়ের এক প্রান্ত সব পলোধারী সারি বেঁধে দাঁড়ায়। পরে সকলে পলো চাপতে চাপতে জলাশয়ের অপর প্রান্তে গিয়ে মাছ ধরা শেষ করে। সকলে মিলে পলো চাপে বলে কারো না কারো পলোর নিচে মাছ পড়েই থাকে। যদি পলোতে মাছ পড়েছে বলে অনুভব হয়, তখন পলোটি এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাত পলোর গলা দিয়ে ঢুকিয়ে মাছটিকে ধরা হয়।

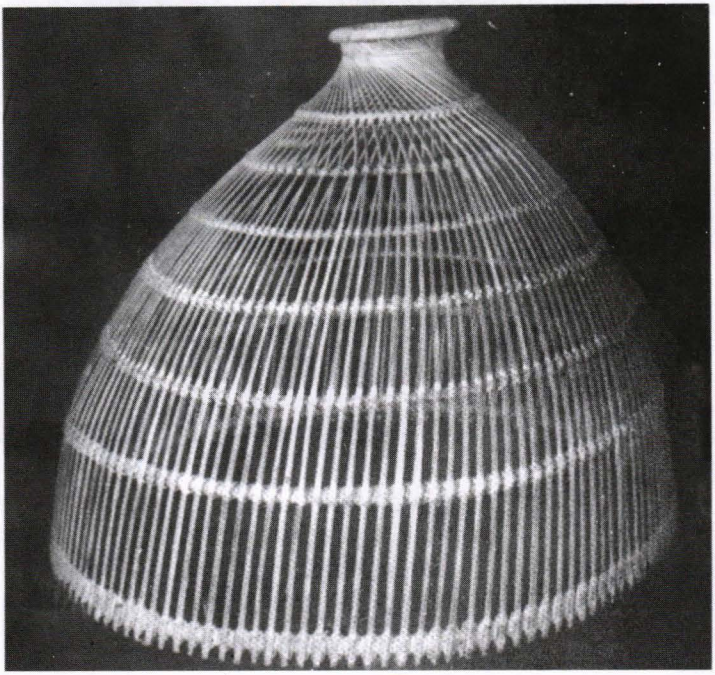

মাছ শিকারে ব্যবহৃত পলো

৩. নৌকা প্রযুক্তি

তিতাস উপজেলার জগৎপুর, মজিতপুর, ভাটিপাড়া গ্রামে বর্ষাকালে স্থানীয় কারিগরেরা নৌকা তৈরি করে থাকে প্রধানত কোশা নৌকাই তারা তৈরি করে থাকে। তবে বিশেষভাবে বায়না দিলে তারা ডিঙি চৈয়া নৌকাও তৈরি করে দেয়। এই তিনটি গ্রাম নৌকা তৈরির জন্য বিখ্যাত এবং মোট ২০টি পরিবার এই নৌশিল্পের সাথে জড়িত। তারা সূত্রধর নামে পরিচিত।

মাছধরার লোকপ্রযুক্তি

নির্মাণ প্রক্রিয়া : নৌকা তৈরির জন্য তারা ব্যবহার করে শাম এবং জারুল কাঠ। প্রথমে কাঠের তক্তাগুলোকে তারা বিশেষ উপায়ে একটির সাথে আরেকটি জোড়া দিয়ে থাকে। জোড়া দেওয়ার সময় তারা কাঠের গায়ে এক ধরনের ক্লিপ ব্যবহার করে থাকে। ক্লিপগুলো একের পর এক কাঠের গায়ে জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হয় নৌকার মূল কাঠামো। নৌকার চারপাশে ভালোভাবে আলকাতরা গরম করে তরল করে প্রলেপ দিয়ে সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেশ ক'দিন রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর নৌকাটি যেমন হালকা হয় তেমনি তা পণ্য পরিবহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

নির্মাণ প্রযুক্তি : নৌশিল্পীরা নৌকা তৈরির সময় কাঠের তক্তাগুলোকে বাকানোর জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে একে বলা হয় বাইন দেওয়া। বাইন দেওয়ার জন্য বেশ কতগুলো কাঠের তক্তা একত্রে সারি করে মাঝ বরাবর একটি শক্ত লোহার রড দিয়ে টানা দিয়ে বাকিয়ে অপর দুটি প্রান্তে আরো দুটি শক্ত লোহার রড দিয়ে টানা দেওয়া হয়। তারপর কাঠের তক্তাগুলোর উপর খড় বিছিয়ে হালকা ভাবে আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর এভাবে বেশ ক'দিন তক্তাগুলোকে রেখে দিলে তক্তাগুলো স্থায়ীভাবেই বাঁকা হয়ে যায় এবং নৌকা তৈরির উপযুক্ত তক্তা হিসেবে তৈরি হয়। কাঠের তক্তাগুলোকে জোড়া দেওয়ার পর দেখা যায় তক্তাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেক সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রগুলো আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তারা বন্ধ করে দেয়।

ব্যবহৃত হাতিয়ার : কাঠের আসবাবপত্র তৈরির যাবতীয় যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে নৌকা তৈরিতে--হাতুড়ি, বাটাল, করাত, রাঁদা, ক্লিপ, পস্নাসসহ যাবতীয় হাতিয়ার।

৪. শীতল পাটি

খুলনা, বরিশাল, সিলেটের শীতল পাটির কদর আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই আছে। কিন্তু কুমিল্লায় শীতল পাটি হয় এটা আমার জানা ছিলনা। ময়নামতি বাজারে গেলাম এখানকার বিখ্যাত হাড়ভাঙ্গা চিকিৎসা ও কুকুরে কামড়ের ঔষধ সম্পর্কে তথ্য নিতে। এখানে ২/১ জন স্থানীয় লোকের কাছে জানতে পারলাম সাবের বাজার (সাহেবের বাজার) এর পশ্চিম দিকে এক কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে যেখানে শীতল পাটি তৈরি হয়। এ তথ্যটা আমি আগেই পেয়েছিলাম বাংলা একাডেমির সংগ্রাহক রতন কুমার ভৌমিকের নিকট থেকে। আমি নিজেও ময়নামতি, কোটবাড়ি এলাকার মানুষ। আনন্দ রাজার বাড়ির পাশে বড় আলমপুর আমার পৈতৃক বাড়ি অথচ জানতাম না আমার বাড়ির ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যে শাহ দৌলতপুর নামে একটা গ্রাম আছে যেখানে বেশ কিছু পরিবার শীতল পাটি বানায়। তাই ময়নামতি নেমেই প্রথমে গেলাম শাহ দৌলতপুর। সেখানে পৌছে দেখলাম প্রায় প্রতিটি বাড়ির বারান্দায় চিকন করে কাটা মোত্তাকের বেত ছড়ানো আছে। এক ভদ্র মহিলা মাটির ঘর লেপছিলেন। নমস্কার দিয়ে বললাম দিদি একটু কথা বলা যাবে।

বলুন

কী নাম আপনার?

সুষমা রাণী দেবনাথ

আপনারা এ মোত্তাক দিয়ে কি বানান?

শীতল পাটি

আর কিছু?

বসার আসন?

এখানে কতটি পরিবার শীতল পাটি বানানোর সাথে জড়িত? ২০/২৫টি পরিবার।

মোত্তাক কী এখানে চাষ হয়?

আশেপাশে অনেক গ্রামেই হয়। মোত্তাকের সবটা কী শীতল পাটির কাজে লাগে?

না, উপরের পিঠটা দিয়েই ভাল শীতল পাটি হয়। উল্টো পিঠ দিয়ে যা হয় তার দাম ভাল পাওয়া যায়না। কীভাবে মোত্তাক থেকে বেত বের করেন?

পাকা মোত্তাকের চামড়াটা আলাদা করে খুব চিকন করে তুলে ফেলি তারপর তা বেশ কয়দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে হালকা ছায়ায় ছড়িয়ে রাখি। এরপর তা দিয়ে পাটি বানানো হয়।

এখানকার শীতল পাটির বাজার কোথায়?

আগে ময়নামতিতেই বিক্রি করা হত। এখন এতটা বানানো যায়না। পুরুষরা এ কাজে আগ্রহ দেখায় না। পরিশ্রম বেশি। কাঁচামালের দামও অনেক।

এক আটি মোত্তাকের দাম কত?

২৫০ থেকে ৩০০ টাকা ৭০/৮০টি মোত্তাক থাকে যা দিয়ে ১টি ভাল ও ১টি মাঝারি পাটি তৈরি হয়।

একজন কারিগর মাসে কতটি পাটি বানাতে পারে?

বেত তোলা থেকে বানানো পর্যন্ত যে সময় যায় তাতে ৪/৫ টার বেশি সম্ভব হয় না। শুধু শীতল পাটি নিয়ে পড়ে থাকলে তো আর হয়না, সংসার ধর্ম করতে হয়।

কত বছর যাবৎ এখানে শীতল পাটি হয়।

বহুবছর আগে অবশ্য এখানকার পুরুষরা তাঁতের কাপড় বুনত। আর মহিলারা বানাত শীতল পাটি।

চরকায় সুতা কাটা হত না?

হত। এখন হয়না তাঁতের কাপড়ের দামও নেই। এ পেশায় কারো আগ্রহও নাই। মহিলারা অবসর সময়ে কাজটা করে। এতে সংসারে দু'পয়সা আসে।

সুষমা রাণী দেবনাথের স্বামীর নাম দিলীপ চন্দ্র দেবনাথ। বাপের বাড়ি পরশুরাম। সেখানেও শীতল পাটি এবং তাঁত শিল্পের প্রচলন আছে বলে তিনি জানালেন। পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন প্রায় নব্বই বৎসর বয়সের মনোলতা দেবনাথ, স্বামী মনমোহন দেবনাথ। তিনিও একসময় শীতল পাটি বানাতেন, এখন চোখে দেখেন কম, তাই ছোট খাট আসন বানান শীতল পাটি বানাতে পারেন না। আমাকে খুব অল্প কথায় জানালেন ৮/১০ বৎসর আগেও এখান থেকে শীতল পাটি জাপানসহ অনেক দেশে যেত। এখন অনেকে আসে কিন্তু যা তৈরি হয় তা আশে পাশের লোকজনই কিনে নিয়ে যায়। এখন শাহ দৌলতপুর গ্রামের যোগী পরিবারগুলো ব্যবসার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। ৮/১০টা ঘর ঘুরে কোন পুরুষ মানুষের দেখা পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কী কোন কুমার আছে?

সুষমা দি বললেন আছে। ২/৩ মাইল দূরে গণ্ডুল নামে একটি গ্রাম আছে এখানে বেশ কিছু রুদ্র পাল আছে যারা মাটির হাড়ি, পাতিল, কলসি, সরা মটকি, খেলনা পুতুল, জীবজন্তু, মূর্তি বানায়।

কুটির শিল্পের কোন কাজ কি এখানে হয়?

না, সূচি শিল্পটা আছে। অনেকেই শখ করে নকশি কাঁথা বানায় কিন্তু তা নিজের ব্যবহারের জন্য বিক্রির জন্য নয়।

বুড়িচং উপজেলার কুটির শিল্পের আরো কোন স্থান আছে কিনা তা জানার জন্য অনেককে জিজ্ঞাসা করা হল। রাজাপুরে একটি নমঃ পরিবার পাওয়া গেছে যারা বাঁশের কাজ করে। ওখানে বেশ কিছু লোকজ পেশার পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল যারা মৎসজীবী, বারুই ও কর্ম্মকার। তাই একদিন সাত সকালে উপস্থিত হলাম শংকুচাইল বাজার, বড় ভাই ছাদেক হোসেন ভুঁইয়ার সাথে পথে দেখা হতেই তিনি তাঁর কলেজে

আমন্ত্রণ জানালেন। আমি দক্ষিণ গাঁ ও শংকুচাইল বাজারে বেশ কিছু মানুষের সাথে কথা বলে মাঠগুলো নির্বাচন করলাম। এর মধ্যে আছে,

১. কৈবর্ত দাস-শংকুচাইল।
২. বমণ (জালো)-পাইকোটা।
৩. বারুই-রাজাপুর
৪. ছুতার-রাজাপুর।
৫. বাঁশ শিল্প (কুটির শিল্প)-রাজাপুর।

কথা হল হারাধন চন্দ্র দাস, সজিত মিত্র, অর্জুন চন্দ্র কর্ম্মকার, শীতল চন্দ্র দাস, হরিমোহন নমঃ প্রমুখের সাথে। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শংকুচাইল পাইকোটা ও রাজাপুরে সামাজিক শ্রেণিগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ,

ক. শংকুচাইল গ্রামে প্রায় ৩৪ ঘর কৈবর্ত আছে। তাদের আদি পেশা ছিল মাছ ধরা ও বিক্রি করা। বর্তমানে অনেকেই অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এখানে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে হরিসভা হয়। রাজাপুর স্টেশনের পাশেই রয়েছে নন্দরাম গোসাইয়ের মন্দির। এখানে মাঘ ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উৎসব হয় উৎসবকে ঘিরে আয়োজিত মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। এক সময় এসব মেলায় পুতুল নাচ হত, নাগর দোলা আসত আর বসত জুয়ার আসর। মূলত এ জুয়ার আসরগুলো হতো মেলার মূল স্থান হতে একটু দূরে এগুলো ছিল স্থানীয় তরুণ ও কিশোরদের এক বড় আকর্ষণ। মেলার পাশে খোলা মাঠে চলত ঘুড়ি উৎসব। ছেলে বুড়ো সবাই অংশ নিত এ ঘুড়ি উৎসবে লাল, নীল, বেগুনি, সাদা, কতরকম ঘুড়ি যে এখানে পাওয়া যেতো তার ইয়াত্তা নেই। এখনো নাগরদোলা আসে ঘুড়ি খেলাও হয় তবে জুয়ার আসর বসেনা। পুতুলনাচেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে।

খ. পাইকোটাতে আছে ৩০/৪০টি বর্মণ পরিবার। এরা মূলত জালো এদের পেশা মাছ ধরা।

গ. রাজাপুর গ্রামে কর্ম্মকার আছে ৩০/৩৫টি ঘর। সবাই কামারের কাজ করে না কেউ স্বর্ণের কাজ করে আর কেউ কৃষি অবশ্য সব পরিবারেরই কৃষির সাথে সম্পর্ক আছে। জায়গা জমি কম তাই আদি পেশার পাশাপাশি অন্য পেশাতেও অংশগ্রহণ করছে কেউ কেউ বর্তমান প্রজন্ম কামারের কাজ ছেড়ে দিচ্ছে যাদের বয়স ৩০ বা এর বেশি এদের একটা অংশ কামারের কাজ করেন। প্রস্তুত করা দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে দা ছেনী, কুড়াল, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, ছুরি, কাঁচি, সরতা চিপটি ইত্যাদি।

ঘ. ছুতার পরিবার আছে ৪টি এর মধ্যে একজনের সাথে কথা হল নাম দিলীপ সূত্রধর পিতা : ননীমোহন সূত্রধর বয়স ৩৭, আগে নৌকা বানাতেন বড় বড় ঘরের কাজ করতেন এখন নৌকার চল নাই বড় বড় চৌচালা ঘর আর হয়না সবাই আধুনিক ঘরবাড়ি তৈরি করে। পাকা বাড়ির প্রতিই মানুষের ঝোঁক বেশি তবে আলমারি খাট নকশা করা দরজা, জানালা ইত্যাদি বানান যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তারা হয়তো আধপাকা বাড়ি নির্মাণ করে ঘরের চালটি টিনের দেয়। তখন কাজ থাকে অনেক

মুসলিম এখন এ পেশায় অভ্যস্থ। সবাই অনিয়মিত নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে আছে, চেয়ার, টেবিল, খাট, জলবেটকি, রুটি তৈরির বেলুন, পিড়ি ইত্যাদি।

ঙ. সঞ্জিত মিত্র, একজন বারুই, পিতা : সুধীর মিত্র তিনি জানালেন, রাজাপুরের ২/৩টি পানের বরজ আছে বারুই পরিবার ৩০/৩৫ ঘর কিন্তু পৈতৃক পেশা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে, চাষবাষ করে না কেউ। একটু বয়োবৃদ্ধ যারা তারা চান্দিনা, দেবিদ্বার বা নিকটবর্তী বাজার থেকে পান এনে স্থানীয় বাজারগুলোতে বিক্রি করে।

চ. কুটির শিল্পের কাজ করেন হরিমোহন নমঃ ইনি রাজাপুরের বাসিন্দা। বাঁশের পাখা, কুলা, ঢুলা, মুরগির খাচাঁ খাড়ি, টুকরি ইত্যাদিই বেশি তৈরি হয়।

বুড়িচং উপজেলার প্রায় প্রতিটি বাজারেই বাঁশ ও কাঠের অনেক রকম কাজ হয় এসব কুটির শিল্পের মধ্যে পড়ে না। তবে এসব লোকপ্রযুক্তি মানুষের প্রয়োজনে আরো বহুদিন টিকে থাকবে।

লোকভাষা

বাংলাদেশের অপরাপর এলাকার মতোই কুমিল্লারও রয়েছে সতন্ত্র আঞ্চলিক ভাষা। এ ছাড়াও যে লোক বৈশিষ্টমণ্ডিত বিশেষ ভাষা রয়েছে তা নিম্নরূপ–

ত্রিপুরাদের ব্যবহৃত ভাষা : টিপরা সম্প্রদায় ককবরক ভাষায় কথা বলে। ককবরক ভাষাটি ১৭৪৯ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল। স্বাধীন ত্রিপুরা ভার ইউনিয়নে যোগ দিলে 'ককবরক' রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হারায়। এ ভাষার নিজস্ব লিপি নেই। দেবনাগরী লিপিতে ককবরকের লেখ্যরূপ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা জাতির ১৮১ তম মহারাজা ছিলেন বীর চন্দ্রমাণিক্য। কুমিল্লা টাউন হলের বীরচন্দ্র গণপাঠাগার আজও তার স্মৃতি বহন করছে। তাদের অনেকেই বাংলা বলায় অভ্যস্ত।

ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষায় কথা বলে, গল্প করে, স্বপ্ন দেখে। নিজেদের মধ্যে তারা এ ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। তবে বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশেপাশে থাকার ফলে এরা বাংলা ভাষাও ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। তাদের ভাষায় রয়েছে তাদের জীবনবাস্তবতাধর্মী গল্প ও কিচ্ছা কাহিনি রয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ রূপকথা ও উপকথা। আর রয়েছে গান তাদের জীবনাবেগের ভাষা। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, রম্যরচনা, রসগল্প ইত্যাদিরও অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ তাদের ভাষায় রয়েছে। এ ভাষায় রয়েছে বাংলা ভাষার শব্দ। ককবরক ভাষায় বাংলা চ ও ং চিহ্নের ব্যবহার বেশি লক্ষণীয়। নিম্নে ককবরক কথার নমুনা হিসেবে নিচের বিশেষ কথাটি উপস্থাপন করা হলো। লালমাই পাহাড়ের জামমুড়া অঞ্চলে বসবাসরত স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা ও তার বোন ঝিনুক রাণী ত্রিপুরা একটি কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলো। আমি জোর করে চেপে ধরাতে তারা কথাটি আমার নিকট খোলাশা করে। কথাটি হলো,

মুচু চা খালাইয়োগো
গুদক চাখালেই তো গো
চাখাকে খোয়াক মোয়াক
হু আহা হু আহা
ও জ্বালা মচহ ইয়ংমা।
[স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা, বয়স ২০, জামমুড়া, লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা]

অর্থাৎ মরিচ খাইলে ঝাল লাগে
আলুর দম খাইলে স্বাদ লাগে
হুআ হুআ অ জ্বালা

মরিচের ঝাল লেগেছে।

[অনুবাদঃ স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা, জামমুড়া, লালমাই পাহাড়]

চান্দিনা উপজেলার ভাষা : চান্দিনা থানার ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান এই জেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য থানাগুলোর মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুজে পাওয়া যায়। যেমন, কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজিকরণের প্রবণতা রয়েছে। এ উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার, চৌদ্দগ্রাম ও লাকসাম উপজেলার আঞ্চলিক ভাষায় নোয়াখালী এলাকার ভাষার অনেকটাই সাযুজ্য রয়েছে। এই এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এর সভ্যতা বহু প্রাচীন। এই এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন সভ্যতার বাহক হিসেবে দেদীপ্যমান। এছাড়াও এ এলাকায় কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বসবাস করে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এ এলাকার অবদানও অনস্বীকার্য। প্রাচীন বিহার নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তার বাড়ি এই চান্দিনা উপজেলায় অবস্থিত।

স্বপ্না ত্রিপুরা, টিপরা বা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর তথ্য সরবরাহকারী

দেবিদ্বার উপজেলার লোকভাষা : দেবিদ্বার উপজেলার ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য উপজেলাসমূহ। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন– কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজিকরণের প্রবণতা রয়েছে। দেবিদ্বার উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকার ভাষার অনেকটা সাযুজ্য রয়েছে। মেঘনা-গোমতী নদীর গতিপ্রকৃতি এবং লালমাই পাহাড়ের

পাদদেশে দেবিদ্বার মানুষের আচার-আচারণ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

এই এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেবিদ্বার সভ্যতা বহুপ্রাচীন। এই এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাচীন সভ্যতার বাহক হিসেবে দেদীপ্যমান। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেবিদ্বারের অবদানও অনস্বীকার্য। জাতীয় কবি নজরুল, ওস্তাদ আয়েত আলী খান, ওস্তাদ আকবর আলী খান প্রমুখ ভুবন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের স্মৃতি বিজড়িত দেবিদ্বার।